সোভিয়েত
সায়েন্স ফিকশন



কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসির প্রতিবাদি ভাষ্যের ছয় উপন্যাস

সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশন

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

পক্ষিমিনার

সে-বছর গরমকালে তাইগার একটা বিরাট এলাকায় দাবানল শুরু হয়েছিল। আগুন নেভাতে গোটা একটা সেনাবাহিনী নামিয়ে দেয়া হয় ও-এলাকায়। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তীব্র ঝোড়ো হাওয়ায় ভর করে সে আগুন ক্রমশই ছড়িয়ে যেতে থাকে। শুধু বড়ো বড়ো নদীর ধারাগুলোই যা একটু বাধা দিতে পেরেছিল তাকে। তবে সে-ও আর কতটুকু।

সে দাবানলের তাড়া খেয়ে তাইগার সমস্ত জীবজন্তু সেখান থেকে পালানো শুরু করে। শুধু গাছ আর ঘাস, মাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বড়ো নিবিড়, তারা নিঃশব্দে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল সেই আগুনের কবলে পড়ে। তবে, মৃত্যুর আগে তারা অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা একটা করেছিল বৈকি। নিজেদের অজস্র বীজ তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল পলাতক পাখিদের ডানায়, পশুদের লোমের নিরাপদ আবরণে। আশা করেছিল, ওরা পালাতে পারলে তাদের বীজেরাও হয়তো নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারবে।

ঘন ঘন বিস্ফোরণে সে-সময় বারংবার কেঁপে উঠছিল মহারণ্য। বুলডোজারগুলো উন্মাদের মতো গর্জন তুলছিল তাদের জ্বলন্ত গভীরে। ঘন ধোঁয়া, আগুনের তীব্র হলকা, কোনো কিছুতেই তারা থামতে জানে না।

যুদ্ধক্ষেত্রটায় ইয়েগর ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিল না নিজেকে। প্রাণপণ লড়তে থাকা এই মানুষজন, মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকা অজস্র গাছ আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে জ্বলন্ত তাইগার বুক ছেড়ে পালাতে থাকা অসংখ্য জীবজন্তু, এই সবই তার কাছে একেবারে অচেনা ছবি।

নিতান্ত হঠাৎ করেই তার এই দাবানলের এলাকায় এসে হাজির হওয়া। আগুন নেভাবার কাজে সে আদৌ এখানে আসেনি। আসলে সে সময়টা তাইগার বুকে

দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো গ্রামগুলোতে সফর করছিল ইয়েগর। পশমের সুতো কাটবার নকশাকাটা তকলি, পুরনো কালের সামোভার, চির ধরা, কালচে মেরে যাওয়া ঠাকুরদেবতার ছবি গ্রামগঞ্জের নানান বাড়িতে অবহেলায় ছড়িয়ে থাকা এইসব জিনিসপত্রের সন্ধানে তার এ-মুল্লুকে আসা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কালের স্মৃতিজড়ানো এই জিনিসপত্রগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে একে একে। ওরই মধ্যে যতটুকু খুঁজেপেতে বের করে এনে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এই ছিল তার ইচ্ছে। এতে তাদের স্লাভদের সংস্ক...তির শেকড়টার একটা খোঁজ হয়তো মিলতে পারে এই তার আশা।

মাঝখান থেকে এই আগুনটা এসে তার কাজে ভালোরকম একটা বাধা তৈরি করে দিয়েছে। ফলে সে-মুহূর্তে তার অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, অন্তত যতদিন

না আগুনটাকে আটকানো যায়। নইলে দাবানলের ভেতর দিয়ে নদীর উজানের দিকে আরও এগোনোটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত।

এদিকে ছুটিও তখন ফুরিয়ে আসছে তার। এই অবস্থায় এমন একটা বাধা এসে পড়ায় মনে মনে খানিক মুষড়েই ছিল সে। আগুন নেভাতে আসা সেনাবাহিনীর একটা দল যে খুদে গ্রামটায় ঘাঁটি গেড়েছে সেই গ্রামটা তখন তারও ঠিকানা।

তবে এইখানটায় গত কয়েকদিন এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক কিছু জেনেছে ইয়েগর। বুঝতে পেরেছে অনেক কিছু। চোখের সামনে আগুনের গ্রাসে ধ্বংস হয়ে যেতে থাকা ওই বিপুল অরণ্য, জ্বলন্ত গাছগুলোর অতিকায় পত্রমুকুট থেকে ধেয়ে আসা তীব্র উত্তাপের হলকা, ফুটন্ত নদী, পুড়ে আংরা হয়ে যাওয়া জীবজন্তুদের শরীর, পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ভার্স্টের পর ভার্স্ট শ্মশানভূমি এই সবকিছুর সামনে, তার নিজের জীবনের দুঃখগুলোকে আর তত গুরুত্বপূর্ণ ঠেকছিল না তার। ডিভোর্স, ইনস্টিটিউটের চাকরিটা চলে যাওয়া, একেবারে এলোমেলো হয়ে ওঠা তার গোটা জীবনটা... নাহ, তাইগার দাবানলের তীব্র উত্তাপ, সেই সবকিছু তুচ্ছ যন্ত্রণাকে তার বুক থেকে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে এই ক’

দিনে।

হাত-পা গুটিয়ে একদিন বসে থাকতে থাকতে অবশেষে একদিন হাওয়ার ঝাঁপটা খানিক কমতে একরকম মরীয়া হয়েই ফের পথে বের হল ইয়েগর। যাবে সে তাইগার গভীরে দাঁড়ানো একটা পুরনো মঠের খোঁজে। সে মঠের সন্ধান তাকে যারা দিয়েছে তারা বলেছিল, জায়গাটা বহুযুগ হল পরিত্যক্ত। শুনে তার আশা হয়েছিল, কপাল ভালো থাকলে ওর ভেতর হয়তো কিছু কিছু অমন পুরনো জিনিসপত্র মিলেও যেতে পারে।

সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু সে নেয়নি। একটা কুড়ুল, একটা ছুরি, সিগারেট, দেশলাই আর একটা কম্পাস।

সেদিন সকালটা বেশ শান্তই ছিল। হাওয়ার বেগ কম। কাজেই ইয়েগর ধরেই নিয়েছিল, আগুন সেদিন বেশি জোর ছুটবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর ঘটে আরেক। রওনা হবার খানিক বাদে, একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই ভেজা মাটির একটা ঢাল বেয়ে ঝোঁপঝাড়ের কাঁটা বাঁচিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তার খেয়াল হল, বাতাসে পোড়া গন্ধ! এদিক ওদিক ফিরে চাইতে নজরে পড়ল বেশ খানিক দূরে ঝোঁপঝাড় থেকে হালকা ধোঁয়ার ফিতে উঠছে। সেই সঙ্গে কাঠকুটো পোড়বার পট পট আওয়াজ। তার মানে আগুন আর দূরে নেই।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইয়েগর। তারপর কান পেতে শব্দগুলো খানিক শুনে বুঝতে পারল, আগুন তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে না পাড়লে বিপদ। এদিক ওদিক তাকাতে ইয়েগর দেখে খানিক দূরে ঘন জঙ্গলের বেড়া ভেদ করে একদল এল্ক ছুটে বেরিয়েছে। জন্তুগুলো বের হয়ে এসে তাকে দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ফের ঝোঁপঝাড় ভেঙে জঙ্গলের আরেকটা দিকে চলে গেল। তার পায়ের নিচের ঝোঁপঝাড় বেয়ে সড়সড় শব্দ তুলে ছোটোখাটো জীবজন্তুর দল ছুটে পালাচ্ছিল। চারপাশে পাখিদের হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। ঝোঁপঝাড়গুলো মড়মড় করে দুলছে। ছুটন্ত জন্তুদের পায়ের চাপে ভেঙে যাচ্ছিল

ছড়িয়ে থাকা শুকনো ডালপালা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে ইয়েগর দ্রুত মনস্থির করে নিল। সামনে ছড়িয়ে থাকা চওড়া ঘাসজমিটা বেয়ে ছুটে পালাবার কোনো মানে নেই। বাঁচতে হলে কোনো উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠতে হবে। জমিটার অর্ধেকটা ছুটে পার হয়ে সে বাঁদিকে খাড়া আকাশমুখো একটা টিলা বাইতে শুরু করল। টিলাটার গায়ে ঘন জঙ্গল। পায়ের নিচে ঘাসের আস্তর পিছল হয়ে আছে। সেইসব পেরিয়ে কোনোমতে তার মাথার কাছে পৌঁছে পেছন ফিরে ইয়েগর দেখে আগুনও ততক্ষণে তার নাগাল ধরে ফেলেছে প্রায়। তার ঠিক পাশের টিলাটার মাথার গাছগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। সতর্ক চোখে সেদিকে তাকিয়ে দেখে ইয়েগর আন্দাজ করল, আর বড়োজোর মিনিট পনেরো। তার মধ্যেই সেখান থেকে আগুন এই টিলায় পৌঁছে যাবে এসে। এইবার প্রাণভয়ে দৌড়োনো শুরু করল ইয়েগর। তার পেছনে তীব্র উত্তাপে ফাটতে থাকা কাঠের শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই।

পিছল ঘাসের বুকে আছাড় খেতে খেতে কোনোমতে উত্রাইয়ের মাঝামাঝি অবধি এসে পৌঁছেছে যখন সে, ঠিক তখন একটা আশ্চর্য শব্দ কানে এল ইয়েগরের। গানের শব্দ!

উত্রাইটার একেবারে তলায় কেউ গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছে। শান্ত গলার স্বর। শব্দগুলো অচেনা। গায়ক যে-ই হোক সে একলা নয়। কারণ তার প্রত্যেকটা লাইন গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দল সুরে বেসুরে তার সঙ্গে ধুয়া ধরছিল। অনেকটা শ্মশানযাত্রার গানের মতো শোনায় জিনিসটা।

শুনে ইয়েগর ভাবল, বোধ হয় এলাকার লোকজন উত্রাইয়ের নিচের কোনো অদেখা সঁড়িপথ বেয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। আর, এত নিশ্চিন্তে গান গাইছে যখন, তখন বোধ হয় ওখানটা গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলে তত ভয়ের আর কিছু থাকবে না।

ততক্ষণে আরও খানিক নিচে নেমে এসেছে ইয়েগর। একলা গলার গানটার কথাগুলো এইবার আরও স্পষ্ট। তবে সেগুলোর মানে যে কী সে তার বোধগম্য

হচ্ছিল না। আবার তার একেকটা লাইন গাইবার পরেই একটা করে চাবুক আছড়াবার শব্দ উঠছিল। আর সেই সঙ্গেই বেড়ে উঠছিল সুরে বেসুরে ধুয়ার গর্জন।

এই ধুয়ার গর্জনটা খানিক অবাক করছিল ইয়েগরকে। এতে কোনো আলাদা আলাদা শব্দ নেই। একটানা একটা আওয়াজ কেবল। সে আওয়াজ তার অচেনা নয়।

এইবার ঢাল বেয়ে সরসর করে গড়িয়ে নেমে চলল ইয়েগর। খানিক নামতেই উঁচু ঘাসের জঙ্গলের ভেতর থেকে যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল তাতে খানিক অবাক হয়ে একটুক্ষণের জন্য থমকে গেল সে। এঁকে বেঁকে যাওয়া একটা সরু রাস্তা বেয়ে একটা বুড়োমানুষ হেঁটে চলেছে। হাতে তার একটা ছোটো চাবুক। আর তার পেছন পেছন দশ বারোটা নেকড়ের একটা দল হেঁটে আসছে। দলটার আচরণ একটু অদ্ভুত। লেজগুলো পায়ের ফাঁকে গুটিয়ে তারা লোকটার পিছু পিছু বেশ বাধ্য ছেলের মতো চলেছে, আর বুড়োর চাবুক শব্দ তুললেই একসঙ্গে সুরে বেসুরে একটানা হাঁক তুলছে। বুড়োর অবশ্য সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আপনমনে হাঁটতে হাঁটতেই সে তার গান গেয়ে যায়, আর একেকটা লাইন গাইবার পর চাবুকটা একবার করে আছড়ায়।

খানিক সে দেখে না পারতে ইয়েগর হাঁক দিয়ে বলল, “ও বুড়ো, তোমার পেছনে নেকড়ের দল ধাওয়া করেছে যে! পালাও, নয়তো জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে যে!”

শুনে বুড়ো ঘুরে একবার ইয়েগরের দিকে দেখল, তারপর কোনো জবাব না দিয়ে ফের গান গাইতে গাইতে চলল। নেকড়েরা ইয়েগরের দিকে ঘুরেও দেখল না। লোকটার পটলচেরা চোখ আর হলদেটে চামড়া দেখে ইয়েগর অনুমান করল সম্ভবত ইওয়েঙ্ক উপজাতির মানুষ হবে সে।

ওদিকে আগুন ততক্ষণে তার পেছন পেছন আরও খানিক এগিয়ে এসেছে। ইয়েগর অতএব আর দেরি করল না। বাকি পথটা তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে, শোভাযাত্রাটার শেষ নেকড়েটার খানিক দূর দিয়ে সে শুড়িপথটা পেরিয়ে একটা নালা ধরে ছুট দিল। কিন্তু আগুন ততক্ষণে গতি বাড়িয়েছে। ছুটতে ছুটতেই বাতাস

বেয়ে তার উত্তাপ এসে লাগছিল ইয়েগরের শরীরে। বেড়ে উঠছিল তার গর্জন। সে আন্দাজ করছিল, আর সম্ভবত দৌড়ে সে এই আগুনের কাছে পার পাবে না।

আর তারপর, টিলার চূড়ার গাছগুলোর মাথা হঠাৎ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। পেছন ফিরে ইয়েগর দেখল সেখান থেকে তরল ধাতুর মতো আগুনের একটা স্রোত চুড়া টপকে হুহু করে নেমে আসছে বাতাসের ভর করে। ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল তার। পাগলের মতো এলোমেলো ছুট দিল সে নালা ধরে। তীব্র ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল তার ফুসফুস।

ঠিক তখনই ঘন ধোঁয়ার ভেতর থেকে কে যেন মেয়েদের গলায় তার নাম ধরে ডেকে উঠল, "আমার পেছন পেছন এসো ইয়েগর। আরে ওদিকে নয় বোকাটা। ওদিকে নয়। একদম ঘাবড়াবে না."

বলতে বলতেই মেয়েদের গলাটা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। গলাটা তার জোরে নয় একেবারেই, অথচ কী আশ্চর্য পরিষ্কার। যেন সে তার ঠিক পেছনটাতে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে তার কানে! তাড়াতাড়ি পেছন ঘুরে দেখল ইয়েগর। সেখানে

পাহাড়ের গায়ের ফাটল বেয়ে একটা সরু ফিতের মতো জমি এগিয়ে গিয়েছে পুড়তে থাকা তাইগার গভীরে। যতদূর চোখ চলে, জমিটার চারপাশে যেন নরকের আগুন জ্বলে চলেছে দাউ দাউ করে। অথচ ওই সরু পথটাকে সে আগুন ছোঁয়নি। যেন কোনো অদৃশ্য দেয়াল তাকে ঘিরে আছে। দু' ধারে আগুনের সমুদ্রের ভেতরে ওই সরু জমিটুকুর বুকে সবুজের মেলা। তার ঝোঁপঝাড়ে মাকড়শারা জাল বুনেছে। শান্ত, স্নিগ্ধ হাওয়ার বুকে সে জাল ছবির মতো স্থির।

ইয়েগর সেই পথটার বুকে নেমে এল। এখানে গ্রীষ্মের সকালের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে। বড়ো বড়ো পদক্ষেপে সে হেঁটে চলেছিল রাস্তাটা ধরে। তার পেছন থেকে জেগে ওঠা আগুনের নিঃশ্বাসের শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তার ছেড়ে আসা এলাকার বাধা সরে গিয়ে নিঃশব্দে দাবানলকে জায়গা করে দিচ্ছে। পেছন ঘুরে না তাকিয়েও সে টের পাচ্ছিল বড়ো বড়ো জ্বলন্ত ডালপালা আছড়ে পড়ে মুছে দিচ্ছে

তার পেরিয়ে আসা পথের সব চিহ্ন। অথচ তার সামনের পথটুকুতে তেমনই গ্রীষ্মের শান্ত সকাল। সেখানে, তার থেকে খানিক দূরে হঠাৎ হঠাৎ কোনো পাইনগাছের আড়াল থেকে ভেসে ওঠে একচিলতে সুন্দর মুখ, কোনো আঙুরলতার ঝোঁপের ভেতর থেকে হঠাৎ করেই বের হয়ে এসে ইশারা করে কোনো নগ্ন হাত। কখনো-বা শান্ত হাসির একটা ঝলক ভেসে আসে তার সামনে থেকে। তবে খানিক দাঁড়িয়ে তাকে এমনভাবে পথে দেখিয়ে নিয়ে চলা মানুষটাকে খুঁজে দেখবার সাহস তখন ইয়েগরের নেই। পেছনে ধেয়ে আসা উত্তাপের হলকা তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল আগুন তার পিছু ছাড়েনি।

ভয়ে সময়ের জ্ঞান চলে গিয়েছিল ইয়েগরের। দু' পাশে আগুনের বেড়াজালের মধ্যে ক্রমাগত আছড়ে পড়তে থাকা গাছদের শব্দ শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরেই ছুটে চলেছে সে ওই নিরাপদ জমির ফালিটুকুর বুক বেয়ে। অবশেষে একসময় আগুনের শব্দ পিছিয়ে পড়ল অনেকটা দূরে। জমিটার দু' পাশের গাছপালাদের গায়ে পোড়ার দাগ তখনও চোখে পড়ে, কিন্তু তাতে আগুনের স্পর্শ নেই আর। এইবার আস্তে আস্তে গতি কমাল ইয়েগর। নিরাপদ জমির ফালিটা এসে প্রকাণ্ড এক সিডারগাছের গুঁড়ির সামনে শেষ হয়েছে। এখানে আগুন নেই। কেবল পোড়া অরণ্যের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে সামনে।

পেছনে তাকিয়ে ইয়েগর দেখল, বহুদূরে অরণ্যের বুকে তখনও আগুনের লেলিহান জিভ উঁকি দিচ্ছে ইতিউতি। এতটা পথ দৌড়ে এসে বড়ো ক্লান্ত ঠেকছিল তার এবারে। অরণ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একলা এই সিডারটা বেঁচে রইল কীভাবে, সে নিয়ে ভাববার মতো অবস্থা তার নয় তখন। গাছটার গোড়ায় একটুকরো ঘাসজমির বুকে বসে তার গুঁড়িতে গা এলিয়ে দিল সে।

হঠাৎ মাথার অনেক ওপরে গাছটার শরীর থেকে খড়মড় করে শব্দ উঠল একটা। একরাশ কাঠিকুটো ঝরে পড়ল তার মাথায়। টুপটাপ করে ঝরে পড়া দু-একটা সিডারের মোচা মাটিতে জমে থাকা ছাইয়ের গাদায় ডুবে গেল। আর তারপর মাথার ওপর থেকে ফের ভেসে এল খিলখিল হাসির শব্দটা।

"কে গো তুমি?" জিজ্ঞাসা করে যেই না ইয়েগর মাথাটা ওপরদিকে ঘোরানো, সঙ্গে সঙ্গে হাসির শব্দটা বদলে হয়ে গেল কাঠবিড়ালির ডাক আর তারপর ফের তা পালটে গেল নীলকণ্ঠ পাখির ডাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের সামনে চেহারা বদলে যাচ্ছিল সিডারগাছটার। তার পাতাগুলো দেখতে দেখতে পুড়ে কালো ধুলোর মতো ঝরে পড়ল, তার বিরাট গুঁড়িতে, সটান কাণ্ডে, রিক্ত ডালগুলোর গায়ে আগুনে পোড়া কালো রঙ ধরল। দেখতে দেখতে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আর দশটা পোড়া গাছের পটভূমিতে মিশে গেল তার চেহারাটা।

এইবার তার মাথার ওপর থেকে ভেসে এল একটা পেঁচার ডাক। কোনো অদৃশ্য ডানা ঝটপট করে উঠল বাতাসে। আর তারপর একটা শান্ত, মিঠে গলা যেন বহুদূর থেকে তার নাম ধরে ডাক দিয়ে উঠল, "উঠে পড়ো ইয়েগর। রওনা হও। পথ লম্বা। জীবন ছোটো। নদীর দিকে এগিয়ে যাও।"

সন্ধের মুখমুখ ইয়েগর শেষমেশ দাবানল-বিধ্বস্ত এলাকাটার একটা প্রান্তে এসে পৌঁছোল। একটা সরু নদী পাক খেয়ে এগিয়ে গিয়েছে এখানে। তার একপাশে পোড়া অরণ্য। অন্যপাশে ঘন সবুজ সতেজ তাইগা। এত ধ্বংস, মৃত্যু আর পোড়া ছাই দেখবার পর সেই শান্ত, জীবন্ত অরণ্যের দিকে চোখ রেখে কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল ইয়েগরের। একটুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নদীর জলে ঝাঁপ দিল ইয়েগর। তারপর পিঁপড়ে আর সুগন্ধী পাতা-লতার টুকরো মেশা সেই জল প্রাণ ভরে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার জলে স্নান করল সে।

স্নানের শেষে ময়লা শার্টটা তার জলে ধুয়ে নিয়ে নদীর অন্য পাড়ে উঠে এল ইয়েগর। এইখানে সবুজ ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে নদীর উলটো পাড়ের দিকে চোখ ফেরাল সে। কেমন যেন ভিনগ্রহের দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল তার ও-জায়গাটাকে। আদিগন্ত ছাই দিয়ে ঢাকা। তার বুকে ইতিউতি অজস্র পোড়া গাছের কঙ্কাল আকাশের দিকে নগ্ন হাতগুলো মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গের কম্পাসটার কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল। জিনিসটার দিকে একনজর দেখে সেটাকে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল ইয়েগর। ও দিয়ে আর তার কাজ হবে না

কোনো। এইবার গাছের গায়ে গজানো সোনালি ‘লিচেন’ দের দেখে দিক ঠিক করে নিয়ে উত্তরমুখো রওনা দিল সে। জঙ্গলে পথ হারাবার ভয় তার ছিল না। এদিকে আসবার আগে এই এলাকার একটা ম্যাপ দেখেছিল ইয়েগর। তাতে যে নদীটা দেখা গিয়েছিল, সম্ভবত সেই

নদীটা পার হয়েই সে এইখানে এসে উঠেছে। ম্যাপে ওর কাছাকাছি একট গ্রামও দেখিয়েছিল। কাছাকাছিই সেটা হবে হয়তো কোথাও।

তবে হাঁটা শুরু করবার পর অনেক খুঁজেও মানুষের পায়ে চলা কোনো পথের চিহ্ন খুঁজে পেল না ইয়েগর। চারপাশে শুধু নাম-না-জানা একধরনের লম্বা লম্বা ঘাস, ঝোঁপঝাড়, শ্যাওলা আর লিচেনের দল ভিড় করে আছে। ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছোটো ছোটো জলের কুণ্ডিতে পা ভিজে ওঠে তার। সারা গায়ে পোকামাকড়ের হুল ফোটে।

আর সবচাইতে বড়ো সমস্যা যেটা এইবার আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছিল, সেটা হল খিদে। চলতে চলতেই পাইনের ছাল ছিঁড়ে নিয়ে খানিক চিবিয়ে নিচ্ছিল সে। ওর শাঁস ভারি মিঠে লাগে খেতে। কখনো-বা পুরুষ্টু লতা ছিঁড়ে নিয়ে তার রস খেয়ে নেয়া খানিক। ভেজা জমিতে গজিয়ে ওঠা লিলির গোড়া খুঁড়ে তার কন্দও খেয়ে দেখল সে দু-একবার। এ-গাছগুলো তাইগা এলাকা থেকে হারিয়েই গিয়েছে প্রায়। তবে খেতে কন্দগুলো মোটেই সুবিধের নয়। কেমন কাদা কাদা, বিস্বাদ।

এইসব টুকিটাকি খাবারে তার খিদেটা কমবার বদলে বেড়েই উঠছিল ক্রমশ। বড়ো দুর্বল ঠেকছে। মাঝে মাঝে খানিক বসে জিরিয়ে নিয়েও সে দুর্বলতা কাটতে চায় না।

তারপর রাত এল। অরণ্যের নিস্তব্ধতার বুকে তার প্রথম একলা রাত। ছোট্ট একট আগুন জ্বালল ইয়েগর। তাতে ছ’টা দেশলাই কাঠি নষ্ট হল। বাকি রইল মোটে দশখানা। গায়ের ছেঁড়াখোঁড়া আধপোড়া পোশাকে শীত মানে না। শীত কাটাতে আগুনের কাছ ঘেঁষে শুতে গিয়ে মুখটা তার তাতে পুড়ে যাবার দাখিল আর ওদিকে পিঠের দিকটা তখন জমে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়। না পারতে শেষমেশ উঠে গিয়ে

একটা ছোটো রুপোলি ফারের গাছ কেটে তার ডালপাতা দিয়ে একটা গদিমতো বানিয়ে তাইতে শুয়ে বাকি ডালপাতাগুলো গায়ের ওপর মুড়ি দিয়ে নিল সে। পাছে আগুন লেগে যায় তাই বিছানাটা সাবধানে আগুন থেকে খানিক দূরে সরিয়ে বানিয়েছে ইয়েগর। সেখানে শুয়ে শুয়ে হাজারো চিন্তা তার মাথায় ভিড় করে আসছিল। খানিক বাদে একটু তন্দ্রামতন আসতে সে স্বপ্নে তার ফেলে আসা শহরটাকে দেখল। অনেকদিন হল সে-শহর ছেড়ে এসেছে সে। সেখানকার ভাঙা জীবনটার সঙ্গে অনেকদিন কোনো যোগাযোগ আর নেই তার। কিন্তু তবুও শহরটাকে আর একবার দেখবার বড়ো ইচ্ছে হচ্ছিল তার। স্বপ্নে সে তার মসণ কালো পথ বেয়ে হেঁটে যায়। হালকা, পরিষ্কার বাতাস এসে তার মুখে চোখে লাগে। পথের দু'ধারে নিকেলের আস্তর লাগানো গাছগুলো থেকে বড়ো বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের পাতা দোলে। অনেকটা পাতাল রেলের টিকিটের মতো গড়ন সেই পাতাদের। উলটোদিক থেকে পথ বেয়ে তার দিকে কেউ একজন হেঁটে আসছে। সে মানুষ, না অন্যকিছু তা বোঝা যায় না। দূরে কেউ একটা গান গাইছিল চিৎকার করে।

গলাটা শুনে স্বপ্নের ভেতরেই একটু স্বস্তি হচ্ছিল তার। অন্তত একটা জীবন্ত মানুষের গলা তো পাওয়া যাচ্ছে! আবার তারই পাশাপাশি একটা ব্যাখ্যাহীন ভয়ও জাগিয়ে তুলছিল সেই গলাটা। যেন কোনো অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে। সেই ভয়টাই অবশেষে ঘুম ভাঙিয়ে দিল তার। একটা দমচাপা আশঙ্কার অনুভূতি হচ্ছিল সারা শরীর জুড়ে। চোখ খুলে সে দেখল আগুনটা কখন যেন নিভু নিভু হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে সে আগুনে বেশ কয়েক টুকরো কাঠ ছুঁড়ে দিল, আর তার পরেই শব্দটা কানে এল তার। মানুষের গলা!

আস্তে, খুব আস্তে পট পট শব্দ করে জ্বলতে থাকা আগুনটার কাছ থেকে খানিক দূরে সরে গেল ইয়েগর। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করে রইল। শব্দটা কান্নার। দূরে কোথাও কেউ একজন কাঁদছে। মেয়েদের গলা। ভারি মিষ্টি। কিছু

বলতে বলতে বিলাপ করে চলেছে গলাটা। কথাগুলো ইয়েগর বুঝতে পারছিল না। অর্থহীন কিছু শব্দ। কাঁদছে? না গান গাইছে? শব্দটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ইয়েগর এইবার একটা হাঁক দিল। শব্দটা হালকা একটা প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যেতে না যেতে অন্য গলাটা যেন তার জবাবে তার আওয়াজটা বাড়িয়ে তুলল খানিক। ইয়েগর এইবার উঠে গিয়ে আগুনটা ভালো করে নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই হাঁটা লাগাল শব্দটাকে লক্ষ করে। মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়িয়ে একটা করে হাঁক দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গেই তার জবাব আসে মেয়েটার কান্না কিংবা গানের শব্দে। তার কথাগুলো বোঝা যায় না সে ঠিক, কিন্তু গলাটা যে মানুষের তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

চলতে চলতেই পথে একটা টিলা পড়ল। বেশ উঁচু। তার গায়ের ঘাস শিশির পড়ে পিছল হয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে কোনোক্রমে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে তার মাথায় উঠে এসে থমকে যেতে হল ইয়েগরকে। উধাও হয়েছে গলার শব্দটা। খানিক অপেক্ষা করে কান পেতে শুনে-টুনে নিয়ে এইবার ইয়েগর বেশ কয়েকবার হাঁক দিয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় কী? কেউ জবাব দিল না। ইয়েগর তখন কী আর করে, রাগ দেখিয়ে খানিক থুতু যে ছুড়বে অন্ধকারে তারও জো নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। তখন সে চুপচাপ বসে অন্ধকারের মধ্যে তাইগার গভীর রাতের গান শুনতে লাগল। তাইগা গান গায়। তার বুক জুড়ে থাকা বুকে হাঁটা, বাতাসে ভাসা অসংখ্য রাতচরা প্রাণীর ঠোঁটে, বুকে, ডানায় সেই সুর জাগে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কোনো গলার সঙ্গেও মানুষের গলার মিল নেই কোনো।

খানিক সেই শুনে-টুনে বিরক্ত হয় ইয়েগর ফের একটা আগুন জ্বালাল। বাকি রাতটুকু যদি এইখানেই খানিক ঘুমিয়ে নেয়া যায়! আর ঠিক তখনই ফিরে এল গলাটা। এইবার একেবারে কাছে। এত কাছে যে হঠাৎ সে গলাটা পেয়ে খানিক চমকে উঠেছিল ইয়েগর। চমকাবার আরেকটা কারণ, এইবার গলাটা কী বলছে তা সে বুঝতে পারছে পরিষ্কার। অদেখা মেয়েটার মিষ্টি চঞ্চল গলা আসলে সুর করে তার নাম ধরেই ডাকছে, “ইয়ে-গ র, ইয়ে-গ-র, এদিকে এসো...”

ডাকটা শুনে ইয়েগর আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। বড়ো খিদে পেয়েছে তার। শরীর আর বইছে না। জনপ্রাণীহীন এই তাইগার অরণ্যে গভীর রাতে একটা মেয়ের গলায় তার নাম ধরে ডাক... সেটা যতই সন্দেহজনক হোক, কিন্তু মানুষেরই গলা

তো! ডাকটাকে লক্ষ্য করে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে টিলার ঢাল ধরে তার উলটোদিকে নেমে চলল সে।

খানিক বাদে তার একেবারে তলায় নেমে এসে একটা সরু নালার বুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল ইয়েগর। এদিক ওদিক অন্ধকারে ঘুরে দেখে নিয়ে মুখের দু’ পাশে হাতদুটো জড়ো করে নিয়ে প্রাণপণে হাঁক দিয়ে উঠল, “কোথায় তুমি-ই-ই...”

জবাবে নালা দিয়ে বলয়ে চলা জলের ছলছল শব্দ ভেসে এল কেবল। কেউ উত্তর দিল না। ক্লান্ত শরীরটা টানতে টানতে জল ভেঙে নালাটার পাড়ে উঠে এল ইয়েগর। তারপর ছুটন্ত জলে মুখ ডুবিয়ে আকণ্ঠ জল খেয়ে ফের একবার হাঁক দিতে গেল...

“ও ইয়েগর..”

গলাটা এইবার তার ঠিক পেছনে। চমকে উঠে একটা পাক খেয়ে পেছন দিকে ঘুরতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না ইয়েগর। কাদামাটির বুকে আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তেই তার কানে এল চাপা একটা হাসির শব্দ। যেন কেউ মুখে হাত দিয়ে হেসে উঠেছে তার দুর্দশা দেখে।

“হাসছ কেন তুমি?” অন্ধকারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল ইয়েগর, “তুমি কে? বনের আগুন থেকে তুমিই কি আমাকে পথ দেখিয়ে বের করে এনেছ? তাহলে এখন এমন লুকিয়ে আছ কেন?”

“ও ইয়েগর..” মিষ্টি গলাটা ফের একবার ডেকে উঠল তার নাম ধরে, আর তারপরেই খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে বলল, “এই তো আমি। এইখানে। আমার কাছে এস...”

ভারি কোমল হয়ে উঠেছে গলাটা। প্রায় ফিসফিস করা সেই ডাকে কামনার

আবছা আভাস।

রাগ হচ্ছিল ইয়েগরের। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। এ কেমন রসিকতা এই মেয়ের? খানিক বাদে সে বলল, "আমায় নিয়ে খেলা করছ তুমি? মজা করছ?

করো। যত খুশি মজা করো। আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। কোথাও যাব না।"

এই বলে নালার ধারের ভেজা মাটির ওপরেই বসে পড়ল ইয়েগর। মাটি ভেজা বলে আর তখন তার কোনো চিন্তা নেই, কারণ নালার জলে নেমে তার আগেই একেবারে ভিজে গিয়েছে সে। তাছাড়া ভূতপ্রেত এইসবে ইয়েগর ভয় পায় না কখনও। মানুষকে তো নয়ই।

"এ মা। এখানে বসে পড়লে কেন?" এইবার মেয়েটার ফিসফিসে গলাটা তার একেবারে কাছে ঘেঁষে এসেছে। ইয়েগরের গায়ে তার নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগছিল। সে নিঃশ্বাসে উষ্ণতা নেই। যেন নদীর বুক থেকে উঠে আসা হাওয়া। এইবার আর ঘুরে দেখবার চেষ্টা করল না ইয়েগর। তার বদলে ডানহাতটা দিয়ে পেছন দিকে আচমকা ধাক্কা দিল একটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুলতুলে নরম, পিচ্ছিল কিছু একটা তার আঙুলগুলোকে ছুঁয়ে সরে গেল নাগালের বাইরে।

"এইখানটায় এসো না! আমি তোমার জন্য কখন থেকে অপেক্ষা করছি তা জানো?" ফের একবার ফিসফিস করে উঠল না-দেখা মেয়েটার গলা। একটু হাসির শব্দও উঠল বুঝি সেই সঙ্গে। সেই চাঁদডোবা রাত, বাতাসের ভেজা ছোঁয়া, নদীর ছলছল, আর না দেখা মেয়েটা ইয়েগরের মনে কোনো একটা স্মৃতি জাগাচ্ছিল। কোথাও পড়েছে? নাকি দেখেছে সে এর আগে? কে জানে! কিন্তু সে স্মৃতিতে কোনো ভয়ের ছোঁয়া ছিল না। একটা মেয়েই তো! ওতে ভয় পাবার কী আছে? কিন্তু তবুও সবকিছুকে ছাপিয়ে একটা অজানা, আসন্ন বিপদের অনুভূতিও তার পিছু ছাড়ছিল না সেই মুহূর্তে। কাজেই এইবার ইয়েগর উঠে দাঁড়াল। মুখোমুখি হয়ে দেখা যাক একবার। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার সামনের বাতাসের আবছা সাদামতো কিছু

একটা মৃদু ঝলসে উঠেই ফের গলে মিশে গেল অন্ধকার বাতাসে।

"বার বার এভাবে লুকিয়ে পড়ছ কেন তুমি?" ইয়েগরের গলায় এইবার সামান্য হলেও একটা চ্যালেঞ্জের সুর উঠে এসেছে। হাতে ধরা কুড়ুলটার ফলায় আঙুল বুলিয়ে নিচ্ছিল সে। "যতবারই কাছাকাছি আসছি, ফের লুকিয়ে পড়ছ তুমি। সামনে এসে আলাপ করো না!"

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কিছু একটা এসে তার বুকে সজোরে ধাক্কা মারল একটা। ছিটকে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল ইয়েগর। একটা ব্যথার ঝলক ছড়িয়ে গেল তার সারা শরীর জুড়ে। হাত থেকে কুড়ুলটা ছিটকে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা চামড়ার ফিতে দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধা ছিল বলে বেশি দূর যেতে পারেনি।

"আমার ইয়েগর," মেয়েটার গলাটা এইবার একেবারে তার কানের কাছে এগিয়ে এসেছে, "আমার প্রিয়তম, আমার ভালোবাসার ইয়েগর..." একটা ঠাণ্ডা হাত এইবার তার মুখটাকে ছুঁল এসে।

"এই যা! যা তুই এখান থেকে।" চিৎকার করে উঠে ছিটকে দূরে সরে গেল ইয়েগর, "কে তুই আমি জানি না। কিন্তু আমার সঙ্গে..."

বলতে বলতেই কাঁপা কাঁপা হাতে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সামনে তুলে ধরল সে। কিন্তু তার হলদেটে কাঁপা কাঁপা আলোয় নদীর ধারে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বুনো ঘাসের দল মাথা নাড়ছিল শুধু।

কাঠিটা নিভে আসছিল দ্রুত। পোড়া কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকারের মধ্যেই চারপাশ হাতড়ে কাঠিকুটো জড়ো করতে শুরু করল ইয়েগর। আগুন জ্বালতে হবে একটা। অন্ধকারের মধ্যে তখন ফের তার কাছে ঘেঁষে এসেছে সেই না-দেখা মেয়ে। ঠাণ্ডা হাত দিয়ে তার বুকে, পিঠে, হাত-পায়ে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল সে। কাজ করতে করতেই ইয়েগর বার বার মাছি তাড়াবার মতো করে ছোঁয়াটাকে সরিয়ে দিতে চায়, তবুও বারবারই সে ফিরে আসে তাকে ঘিরে। সেই করতে করতেই গাছগাছালির ডাল ভেঙে, ঘাস উপড়ে জড়ো করে তাতে আগুন লাগাল ইয়েগর। কয়েক মিনিটের

মধ্যেই বাতাসে লাফ দিয়ে উঠল আগুনের শিখা। চারপাশের অন্ধকার দূরে সরে গেল খানিক। সেই আগুনটার একেবারে ধার ঘেঁষে বসে ইয়েগর ভাবছিল, ফের কখন নতুন উৎপাত শুরু হয়।

তা সে উৎপাত শুরু হতে দেরি হল না বিশেষ। হঠাৎ হিসহিস শব্দ করে, চারপাশে ফুলকি ছড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠেই নিভে গেল আগুনটা। ঠিক যেন কেউ সেটাকে চেপে ধরে নিভিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের ভেতরে খিলখিল করে হেসে উঠল গলাটা। যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে সে। আওয়াজটা আসছিল তার ডানদিক থেকে। ইয়ের চট করে সেদিকে ঘুরে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে হাসিটা তার বাঁদিকে সরে গেল। তারপর সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে, মাথার ওপর থেকে বারবার সেই গা জ্বালানো হাসির আওয়াজ। অথচ কোনো পায়ের শব্দ নেই, ডানা ঝাঁপটাবার আওয়াজ নেই কোথাও। শেষমেশ তিতিবিরক্ত হয়ে ইয়েগর যেই বলেছে, “পেত্নী, তোকে একবার ধরতে পারলে আমি...” কথাটা শেষ হবার আগেই মাথার ওপর থেকে গলাটা বলে উঠল, “বজ্জাত কোথাকার! কী করবি তুই আমার?” আর সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা, ওজনদার কিছু একটা এসে ইয়েগরের পিঠে লাফ দিয়ে পড়ল। দুটো শক্তপোক্ত হাত পেছন থেকে তার বুকে জড়িয়ে ধরেছে। সেই সঙ্গে তার কানে গা জ্বালানো গলাটা কানের কাছে বলে চলেছে, “সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, আমার কাছে আয়... কাছে আয়...”

গায়ের জোরের ভারি গর্ব ছিল ইয়েগরের এতকাল। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল মেয়েটার গায়ের জোর তার চাইতে অনেক বেশি। যতই শরীর আঁকিয়ে বাঁকিয়ে চেষ্টা করে ইয়েগর, কিন্তু সেই বাঁধন সে আর ছাড়াতে পারে না। শেষমেশ নিরুপায় হয়ে হঠাৎ সামনে দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা পা পেছনে বাঁকিয়ে একটা সপাট লাথি ছুড়ল সে। পা টা গিয়ে লাগল

তলতলে প্লাস্টিসিনের মতো নরম কিছু একটা জিনিসের গায়ে। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে চিত হয়ে পড়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই হাঁটুদুটো বুকের কাছে গুটিয়ে তুলে হাতে ছুরিটা ধরে তৈরি হয়ে গেল ইয়েগর। এ কিছু করতে এলে লাথি

আর ছুরি দুই-ই চালিয়ে দেয়া যাবে একসঙ্গে। কাজটা অবশ্য কঠিন। একে তো ঘুটঘুঁটে অন্ধকার, তায় মেয়েটার গায়ে অসুরের মতো জোর আর মাথায় বেজায় চালাকি বুদ্ধি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল তাকে চোখে দেখা যায় না।

অত কসরত করে ইয়েগর তখন হাঁফাচ্ছে, অথচ মেয়েটার মধ্যে বোঝা যাচ্ছিল ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই। ফের একইরকম শান্ত গলায় সে বলে উঠল, "আহা, কী হল ইয়েগর? আমার আদর ভালো লাগছে না বুঝি? আমায় বুঝি তুমি ভালোবাসো না? একটিবার আমায় জড়িয়ে ধরে দেখো, আমার যে খুব শীত করছে! উ-হুঁ-হুঁ..."

বলতে বলতেই হঠাৎ দুটো বরফ ঠাণ্ডা হাত এসে তার শার্টের কলারটা ছিঁড়ে ফেলে তার বুকে আঙুলগুলো বুলিয়ে নিল একবার।

"শয়তান, তুই.." বলতে বলতে ইয়েগর ছুরিটা সটান চালিয়ে দিল সামনের দিকে। কিন্তু কোথায় কী? খানিক হাওয়া কেটে ঘুরে এল ছুরিটা। বরফ-ঠাণ্ডা হাতদুটো ততক্ষণে ফের তার সারা গায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদে তরল নাইট্রোজেনের মতো ঠাণ্ডা দুটো পুষ্ট ঠোঁট এসে চেপে বসল তার গালে।

হাসছিল মেয়েটার গলাটা। শান্ত, একেবারে শান্ত গলার হাসি। এইবার ইয়েগরের বুকে ভয় ঢুকল একটু। এ তাকে নিয়ে খেলছে। এ খেলা কখন শেষ হবে? যখন এ সর্বশক্তি নিয়ে হামলাটা করবে তখন?

"কী চাও তুমি আমার কাছে?" হাঁফাতে হাঁফাতে কোনোমতে বলে উঠল ইয়েগর, "আমি তোমার কোন ক্ষতিটা করেছি?"

"কিচ্ছু চাই না। শুধু তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দিও না গো। আমায় একটুখানি জড়িয়ে ধরো! ধরো না!"

"ঠিক আছে। কাল সকাল হোক। সূর্য উঠুক। তখন..."

"উঁহু। রাতে... এক্ষুনি!"

"পারব না। কিছুতেই না। তুমি খুব ঠাণ্ডা। একটু আগুন জ্বালাই আগে। তারপর তুমি যা বলবে..."

"না, সোনা। আগুন জ্বাললে হবে না যে।" বলতে বলতেই যেন একটা গোটা

বরফের চাঙড় এসে লাফ দিয়ে পড়ে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরল ইয়েগরকে।

ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল ইয়েগরের গোটা শরীর। তার ওপর চেপে বসা ভারটার গায়ে মাছ আর জলজ ঘাসের মেটে গন্ধ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে আসতেই শরীরের শেষ শক্তি বিন্দুটা অবধি একত্র করে একবার হাতে ধরে ছুরিটাকে সে গেঁথে দিল নমনীয় শরীরটার

পিঠে। কিন্তু ছুরিটা কোনো কিছুতে বাধা না পেয়ে সটান তার বেল্টের বকলসটায় ঠেকে ঠক করে শব্দ তুলল একটা। না পারতে ইয়েগর তখন দু’ হাতে প্রাণপণে রবারের স্তূপের মতো জিনিসটাকে চেপে ধরছিল, যদি ওইভাবে ধরে সেটাকে ছিঁড়ে আনা যায় বুকের ওপর থেকে।

“জোরে... আরও জোরে জড়িয়ে ধরো সোনা!” কানের কাছে মেয়েটার গলাটা ফিসফিস করে চলছিল তার, “আহু, কত ওম তোমার গায়ে!”

সরু সরু বরফগলা জলের ধারা একরাশ চুলের মতোই ছড়িয়ে পড়ছিল ইয়েগরের গালে মুখে। মুখের ওপর ঝরে পরা অজস্র চুমুর দিকে খেয়াল না করে ইয়েগর তখন শরীরটাকে দু’হাতে প্রাণপণে চেপে ধরবার জন্য কসরত করে যাচ্ছে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও আলিঙনটাকে একটুও হালকা করতে পারছিল না সে।

খানিক বাদে ইয়েগর খেয়াল করল, তার শরীরটা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, আর মেয়েটার শরীরটা খানিক গরম হয়ে উঠছে যেন। হাতদুটো তার অবশ হয়ে গেছে ততক্ষণ।

“আমায় মেরে ফেলবি তুই। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন? কী দোষ করেছি আমি?”

“আমায় একটুখানি ওম দাও, আমি চলে যাব।” বলে উঠল মেয়েটা। আর সেই সঙ্গে ফের তার ঠোঁটদুটো নেমে এল ইয়েগরের ঠোঁটে। এবার সেই চুমুতে সামান্য উষ্ণতা ছিল।

ততক্ষণে ইয়েগরের গোটা শরীরটা একেবারে অসাড় হয়ে এসেছে। নিঃশ্বাসটুকুও নিতে পারছিল না সে আর। তার মনে হচ্ছিল যেন বুকে একটা

জগদ্দল পাথর নিয়ে সে কোনো বরফগলা নদীর জলের তলায় ডুবে রয়েছে। পাথরটা তার শরীরের সমস্ত উষ্ণতাটুকুকে শুষে খেয়ে তার গোটা শরীরটাকে গলিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে নদীর স্রোতে। তার গোটা অস্তিত্বটাকে রেণু রেণু করে মিশিয়ে দিয়ে চলেছে হিমশীতল একটা স্রোতের ধারায়।

মৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরি করে নিল ইয়েগর। তার গলা দিয়ে তখন কেবল সামান্য একটা ঘরঘর শব্দ বের হয়ে আসছিল।

ঠিক তখনই নদীর অন্য পাড়ে একটা শিঙা বেজে উঠল। কোনোমতে চোখ খুলে ইয়েগর দেখে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভোরের আলো ফুটছে আকাশে। এইবার সেই আলোয় বুকের ওপর উপুড় হয়ে থাকা মেয়েটার মুখটা দেখতে পেল সে। যেন ঘন কুয়াশায় গড়া একটা অপূর্ব সুন্দর মুখ। আধো অন্ধকারের মধ্যে একদলা ফসফরাসের মতো আভা ছড়াচ্ছিল তা থেকে। তার স্বচ্ছ দুটো চোখ শান্তভাবে তাকিয়ে ছিল ইয়েগরের মুখের দিকে। একটা শেষ চেষ্টায় ইয়েগর হঠাৎ মাথাটা উঁচিয়ে মেয়েটার কপালে একটা

তো মেরে তার গালে দু' পাটি দাঁত বসিয়ে দিল। কিন্তু কুয়াশায় গড়া সেই উষ্ণ মাংসকে ভেদ করে দাঁতগুলো একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খেল এসে।

ফের একবার ভেসে এল শিঙার সুরেলা আওয়াজ। এইবার আরও জোরে। আলো বেড়ে উঠছিল। আকাশ আর নদীর আবছা আলোর মধ্যে গাছদের অন্ধকার চেহারাগুলো নজরে আসছে এইবার। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোও দেখা যাচ্ছে একটু একটু। একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে এলিয়ে পড়ল ইয়েগর। শরীরের শেষ শক্তি-বিন্দুটিও উধাও হয়ে গেছে তার। সারা শরীর জুড়ে অবশিষ্ট আছে কেবল সুতীব্র ঠাণ্ডার একটা অনুভূতি। মেয়েটাকে এখন আর ততটা ভারী ঠেকছিল না ইয়েগরের। মুখটাও এখন অনেকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এইবার হঠাৎ দুটো কোমল হাত ইয়েগরের বুকে একটু বুলিয়ে দিল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইয়েগর টের পেল, একটুখানি শক্তি যেন ফিরে এসেছে তার গায়ে।

এইবার তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। তখনও খানিক ঝাপসা শরীরটা তার

ছিপছিপে, সতেজ। লম্বা চুলের গোছা স্রোতের মতো নেমে এসেছে সেই শরীরকে ঘিরে। তার চোখদুটো গভীর, উদাস। উঠে বসতে চেষ্টা করল ইয়েগর। কিন্তু পারল না। তার আদেশ মানছিল না তার শরীর। একটা গভীর শৈত্য তার গভীরে ছেয়ে রয়েছে তখন। তার রক্তমাংসে বরফের স্তূপ জমে উঠেছে যেন বা। চূড়ান্ত ক্লান্তিতে নিজেকে ভারহীন ঠেকছিল তার। যেন তার গোটা শরীরটাই হারিয়ে গেছে সে-মেয়ের হিমশীতল আদরে।

"তুমি আমায় তোমার উষ্ণতার অর্ঘ্যে পুজো করেছ ইয়েগর।" মেয়েটা কথা বলে। উঠল এইবার, "কাল রাতে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে গলে মিশে এক হয়ে গেছ তুমি। এইবার তুমি আমার... তুমি আমাদেরই একজন।" বলতে বলতে মেয়েটা তাকে ছেড়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে ঘোলা জলে শরীরটা মিশে গেল তার। কিন্তু তাতে সামান্যতম বদল এল না নদীর স্রোতে। সেই দেখতে দেখতে কখন যে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে ইয়েগর জানে না।

ঘুম ভেঙে ইয়েগর দেখে বেলা দুপুর হয়েছে। সূর্যটা মাথার ঠিক ওপরে। তার হালকা ওম গায়ে মেখে নিতে নিতে মাটিতে শুয়ে শুয়েই গতরাত্রের ঘটনাগুলো একটা দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে আসছিল তার স্মৃতিতে। আস্তে আস্তে একটা হাত মুখে বুলিয়ে দেখল সে একবার। আর তারপরেই খেয়াল করল, কেমন যেন শুকনো কোঁচকানো চেহারা হাতটার। যেন তা অন্য কারও হাত! ভয় পেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিল ইয়েগর। কিন্তু তার দুর্বল শরীর তখনো তার হুকুম মানতে তৈরি নয়। হাতটা ততক্ষণে তার মুখ ছেড়ে বুক হয়ে পায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছে তারপর তার শরীরকে ছেড়ে গেছে। একটু অবাক হয়েই সেটার দিকে দেখছিল ইয়েগর। ওটা আদৌ তার হাত নয়! সেই নেকড়েওয়ালা ইওয়েঙ্ক বুড়ো যেন কোত্থেকে এসে তার পাশে উদয় হয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার শরীরে!

পটলচেরা দুটো উদাসীন চোখ তার হলদেটে মুখ থেকে তাকিয়ে ছিল ইয়েগরের দিকে। ইয়েগরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে তার ঠোঁটদুটো কামড়াল একবার।

“ওহো, তুমি তবে সেই নেকড়েওয়ালা বুড়ো!” ইয়েগর দুর্বল গলায় বলে উঠল এবার, “আমায় একটু জল দেবে? খুব তেষ্টা পেয়েছে।”

জবাবে বুড়ো উঠে গিয়ে খানিক দূরে বসে তার চাবুকটার রশি ঠিকঠাক করতে শুরু করে দিল।

“তুমি রাশিয়ান বোঝো?” এইবার সেদিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠল ইয়েগর, “আমায় একটু জল এনে দাও! জল... শুনতে পাচ্ছ?” বলতে বলতে ইয়েগর নদীর দিকে কোনোক্রমে মুখটা ঘুরিয়ে মুখের কাছে হাতদুটো জড়ো করে জল খাবার ভঙ্গি করে দেখাল কয়েকবার।

“নড়াচড়া কোরো না।” এইবার খানিক নাকি সুরে বুড়ো কথা বলে উঠল, “মাভকা তো দেখছি তোমার শরীরের সব ওম চুষে খেয়ে ছিবড়ে করে দিয়ে গেছে একেবারে। এমনিতেই আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না তুমি। ও আর জল খেয়েই বা কী, না খেয়েই বা কী?

“ঠিক আছে। মরি তো মরব। এখন একটু জল তো দাও মুখে! তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল যে!”

“উঁহু। সে হবে না।”

“ও বুড়ো, নদীটা তো তোমার পাশেই। একটু জল...”

“আহা! ‘নদী তো তোমার পাশেই “ ভেঙিয়ে উঠল বুড়ো, “আমি কি দেখতে পাই নাকি? জল খেয়ে আর কী হবে শুনি? এক্ষুনি তো মরবে।”

“উফ! তোমার কোন পাকা ধানে মইটা দিয়েছি আমি বলো তো! একটু জল চাইছি তাও...”

“ধুস! একটা মড়া আবার কোন পাকা ধানে মই দেবে আমার?”

“দেখো, মরবার আগে মড়া মড়া বলে ডাকবে না বলে দিচ্ছি!” এইবার রেগে উঠছিল ইয়েগর।

বুড়ো সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপচাপ তার চাবুকটার মেরামতি সেরে উঠে। দাঁড়িয়ে টুকটুক করে রওনা দিল। খানিক বাদেই তার গানের শব্দ উঠল

পাহাড়ের গায়ে। আর সেই সঙ্গে ধুয়া ধরল তার নেকড়েদের ডাক।

রাগে শরীরে নতুন করে শক্তি ফিরে আসছিল ইয়েগরের। কোনোক্রমে কাত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সে নদীটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর জলে মুখ ডুবিয়ে প্রাণভরে জল খেয়ে অবশ শরীরটাকে কষ্টেসৃষ্টে টানটান করে মেলে দিল সূর্যের আলোয়। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল তার। খানিক বাদে শরীরে একটু বল হতে উঠে দাঁড়াল সে। খানিক দূরে পুনর্নবার একটা বড়সড় ঝোঁপ দেখে টলতে টলতে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তার ডাঁটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে বেশ খানিক রস চুষে খেল। তারপর গায়ের শার্টটা খুলে মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রোদের মধ্যে।

বিকেল পড়ে আসছিল। সূর্য আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছিল পশ্চিম আকাশের গায়ে। সেদিকে চোখ ধরে রেখে ইয়েগর ঠিক করল, যেভাবে হোক বেঁচে তাকে থাকতেই হবে। আর সেটা করতে হলে তাকে এই জায়গাটা ছেড়ে কাছাকাছি কোনো লোকালয়ের খোঁজে বের করতে হবে। ঠিক তখনই পেছনে নদীর ভেতর থেকে একটা ছপাৎ করে শব্দ উঠতে ইয়েগর চমকে সেদিকে ঘুরে তাকাল। দেখে, জলের ভেতর থেকে বড়সড় একটা মাছ ঘাই মেরে লাফিয়ে উঠে পাড়ে এসে পড়েছে। নুড়িপাথরগুলোকে ছিটকে দিতে দিতে ধড়ফড় করছিল মাছটা। সেদিকে চোখ রেখে ইয়েগর একটা লাফ দিল। দুর্বল শরীর নিয়ে লাফটা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতে যে পারবে না এইটুকু সে আন্দাজ করেছিল। সেটা হিসেব করেই সে এমনভাবে লাফটা মেরেছিল যাতে আছড়ে গিয়ে সে মাছটার ওপরেই পড়ে। মাছটা একটা বড়ো মাপের ট্রাউট। গায়ে বেজায় শক্তি। তার ওপরে পড়ে বেশ অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেপে ধরে থাকতে অবশেষে তার ছটফটানি থামল।

নদীটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ইয়েগর। "হুম। তার মানে কাল রাত্তিরের ফুর্তির দাম মেটাচ্ছ তুমি, তাই না? ভালো। তবে ভেবো না এত সহজে তোমায় ছেড়ে দেব। আমি। বেঁচে থাকলে এইখানে আমি ফের ঘুরে আসব এই বলে যাচ্ছি।"

দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলে একবার দেখে নিল ইয়েগর। মাত্র আটটা কাঠি বেঁচে আছে। আর। ভিজে গিয়ে মাথাগুলো জুড়ে গেছে সেগুলোর। এর এককেটা কাঠি জ্বালানো মানে তার বেঁচে থাকবার আশা খানিকটা করে কমে যাওয়া। যত্ন করে কাঠিগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেগুলোকে পড়ন্ত রোদে শুকোতে দিল ইয়েগর। তারপর সেগুলোকে হাতের তালুতে ঘষে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে বেশ খানিক শুকনো করে নিয়ে ফের বাক্সটায় ঢুকিয়ে রেখে মাছটাকে কাঁচাই খেয়ে নিয়ে ফের গিয়ে উঠল গতরাত্রের সেই টিলাটার মাথায়। সেখান থেকে সাবধানে চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল সে একবার। কোথাও দাবানলের ধোঁয়া টোঁয়া নজরে পড়ে কি না। কিন্তু নাহ! চারদিক সবুজে সবুজ হয়ে আছে। আগুনের চিহ্নও নেই কোনোদিকে।

খানিক বাদে সূর্যের দিকে নজর ফেলে দিক ঠিক করে নিল সে। তারপর জুতোদুটো পায়ে গলিয়ে পকেটে দেশলাই বাক্সটা ভরে ছুরিটা কোমরে বেঁধে নিয়ে টিলাটার মাথায় নুড়িপাথরের একটা ঢিবি বানাল। পরে কখনো এইখানটা ফিরে এলে জায়গাটাকে ওই ঢিবি দেখে চিনে নেয়া যাবে। কাজটা শেষ করে পায়ের তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে চোখ ফেলে ইয়েগর হাঁক দিল, "মাভকা, মাথাটা তুলে একবার দেখ হে! আমি চললাম গো সুন্দরী।"

নদী কোনো জবাব দিল না। তার ঢেউগুলো একই ছন্দে বয়ে চলল শুধু। কেবল অনেক দূরে শিঙার শব্দটা একটা মধুর সুর তুলে তার সপ্তকে চড়ে একেবারে হঠাৎ করেই থেমে গেল।

পরদিন জঙ্গল বেয়ে বেশ খানিক ঘোরাঘুরি করে ইয়েগর নিশ্চিত হল, সে একেবারে হারিয়েই গেছে। কেউ যে তার খোঁজে জঙ্গলে লোক পাঠাবে না একথা তার জানা ছিল, কিন্তু তবুও সেদিন সকালে হঠাৎ দূর থেকে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ পেয়ে খানিক আশা হয়েছিল তার। কিন্তু খানিক বাদেই সে শব্দ মিলিয়ে গেল। আর ফিরে এল না।

আসলে দাবানলের এলাকা ছেড়ে সেই না-দেখা মেয়েটার পিছু পিছু ইয়েগর সেই এক রাত্রে প্রায় একশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছিল। কেমন করে তা সম্ভব

সেসব ইয়েগরের জানবার কথা নয়। হেলিকপ্টারের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর ফের সে জঙ্গল বেয়ে চলা শুরু করল। এ জায়গাটায় হাজারো গাছ উপড়ে পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। তাদের ডালপালা আর শেকড় এড়িয়ে পথ চলা দায়। তবুও ওরই মধ্যে এগোতে এগোতেই, গত দুটো দিনের ঘটনাগুলো নিয়ে মনের ভেতর নাড়াচাড়া করছিল সে। আগুনের মধ্যে দিয়ে ওই আশ্চর্য জাদু রাস্তাটা... তারপর তাকে ভুলিয়ে এনে মাভকার রাতভর ঠাণ্ডা আদর... এদের কোনোটারই কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিল না সে। পাহাড়ে ইয়েতি আছে, মহাকাশে ইউএফও, লক নেস-এর গভীরে প্লেসিওসরাস, এই আজগুবিদের কথা মেনে নিতে তার বিশেষ সমস্যা নেই। কারণ এরা তার রোজকার জীবনে সামনে এসে দাঁড়ায় না।

কিন্তু মাভকা এবারে তাকে একটা কঠিন সমস্যার সামনে এনে ফেলে দিয়েছে। গোটা একটা রাত তার সঙ্গে কাটাবার পরেও গেঁয়ো গালগল্পের জলপরি যে সত্যি সত্যি থাকতে পারে একথা কিছুতেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না সে। তাকে ঘিরে অচেতন প্রকৃতি নিজেকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে, আর তার মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়েগর, একমাত্র চেতনাওয়ালা জীব, দুনিয়ার মালিক। এই তো সে শিখে এসেছে চিরটা কাল! হ্যাঁ, আজ হয়তো সে খানিক বিপদে আছে, কিন্তু তাই বলে সেই মালিকানায়।

আর কোনো ভাগীদার আছে সেকথা মেনে নেয়া দূরস্থান, ভাবাও তার কাছে কঠিন।

নামহীন নদীটা, একইরকম নামহীন একটা অরণ্যের বুক বেয়ে বয়ে যাচ্ছিল। নির্জন দুপুরবেলা ঝোঁপঝাড়গুলোর ভেতর থেকে গবলিনরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। নদীর বুকে ঘূর্ণিগুলোর মধ্যে জলপরিরা দুপুরের খাওয়া শেষ করছিল। একজন জলদানব নদীর গভীরে বসে জং ধরা একটা হারপুন দিয়ে দাঁত খুঁটছিল। পুরনো বিশাল গাছদের গায়ে নখে ধার দিচ্ছিল অজানা, উদ্ভট সব জন্তুরা। জঙ্গলের গভীরে কোনো এক জায়গায় কফিনের মধ্যে শুয়ে ছিল বাবা ইয়াগা। পেটে গেঁথে রাখা অ্যাসপেন কাঠের টুকরোটাকে খুলে ফেলবার জন্য শরীরটায় মোচড়

দিচ্ছিল সে। আরেক জায়গায় নেকড়ে-মানুষরা, একটা খোঁটার মাথায় গেঁথে দেয়া একটা ছুরির ওপর দিয়ে লাফ মেরে নেকড়ের রূপ ধরে

মাটি ছুঁচ্ছিল এক এক করে। একটা পুরনো গাছের খোঁদলের ভেতর বসে জুজুবুড়ো তার প্যাঁচার মতো চোখদুটো পিটপিট করে যাচ্ছিল। জঙ্গলের মাঝখানটায় একটা পায়ে চলা পথের ওপর একজন বাস্তুপরি বসে ছিল, কোনো মানুষ সে রাস্তায় গেলে যদি তার সঙ্গ ধরতে পারে সেই আশায়। একজায়গায় স্লাভ পিশাচ বেলবগ ভালুকের মাংস চিবোচ্ছিল পরম আনন্দে। তার মুখটা মরা মশার রক্তে লাল হয়ে আছে।

আর তাদের সেই জমজমাট বসতির মাঝখানে একজন একেবারে সাধারণ সাদাসিধে মানুষ দাঁড়িয়ে একা একা একটা পাইনগাছের গায়ে কোপের পর কোপ বসাচ্ছিল। মরতে বসা গাছটাকে ঘিরে বেশ কিছুদূর অবধি কাঠের টুকরো ছিটকে যাচ্ছিল। অনেক দূর থেকে নেকড়ের একটা দল কাঠের গায়ে ধাতুর কামড়ের সেই শব্দগুলো শুনে কান খাড়া করে উঠছিল। মানুষ জন্তুটার সঙ্গে খুব একটা ভাব-ভালোবাসা তাদের নেই।

গাছটা ইয়েগরই কাটছিল। তার কারণ ছিল একটা। আসলে নদীটার দিকে চোখ ফেললে একটু ভয় ভয় ঠেকলেও ওর কাছছাড়া হবার কোনো মতলব ছিল না তার। জঙ্গলের ভেতর এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোর চাইতে নদীর স্রোত ধরে এগোনো অনেক সহজ। কাজেই সে মতলব করেছিল, একটা ছোটো ভেলা বানিয়ে নদীর বুক বেয়েই এগোবে এবারে।

নদীর কাছাকাছি পাহাড়ের একটা ঢালের গায়ে জুতসই ক টা পাইনগাছ বেছে নিয়ে প্রথমে কুড়ুলটায় ভালো করে ধার দিল সে। তারপর গাছ কাটা শুরু করে দিল। তবে খিদে আর ক্লান্তিতে মাঝেমধ্যেই কাজ ছেড়ে বসে হাঁফাচ্ছিল ইয়েগর। দু -একবার তো মাথা ঘুরে উঠে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

বনের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে গত কয়েকদিনে ইয়েগরের একটা উন্নতি

হয়েছিল। কানটা তার সবসময় খাড়া থাকত। গাছ কাটার ফাঁকে একবার হাঁফ ছাড়তে বসেছে, তা শোনে পেছনে কেউ যেন খুব পা টিপে টিপে হেঁটে আসছে। আওয়াজটা পেতেই তৈরি হয়ে গেল ইয়েগর। উঠে দাঁড়িয়ে কুড়ুলের ডাঁটি বাগিয়ে ধরে একটা পাইনের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে। অমনি পায়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়ে একটা খচমচ শব্দ উঠল পেছনে। সেদিকে ঘুরে ইয়েগর দেখে এ সেই নেকড়েওয়ালা ইওয়েঙ্ক বুড়ো। একটা ছোটো টিবির মাথায় হাঁটুদুটো পেটে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। রাগ রাগ চোখে সে অর্ধেক কাটা গাছটার দিকে দেখছিল।

"হুম। তা আছ কেমন?" ইয়েগরই প্রথম কথা বলল। তারপর কুড়ুলটা তুলে ধরে দেখিয়ে ফের বলল, "বেঁচে আছি গো বুড়ো। মরিনি। তা তোমার নেকড়ের পাল কোথায় গেল?"

"তুমি গাছটাকে খুন করছ কেন?

"তাতে তোমার কী হে? আমার কাঠের দরকার তাই গাছ কেটে তার বন্দোবস্ত করছি। সে নিয়ে মাথাব্যথা করবার তুমি কে?"

"আমি দিওবা-গুও।" বুড়ো জবাব দিল, "দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমায় চেনে, আর তুমি আমায় চেনো না? আমায় দেখে আর দশজনের মতো ভয়ডরের বালাইও তো দেখছি না!

"ধুত্তোরি তোর ভয়! চুলোয় যা বজ্জাত।" বলে ফের মুখ ঘুরিয়ে গাছের গায়ে কোপ মারল সে।

"উফ! উফ! লাগে যে! আমায় মারছ কেন?"

"এখনই হয়েছে কী?" গাছ কাটতে কাটতেই জবাব দিল ইয়েগর, "এখন তো কেবল একটা গাছ কাটছি। এবার যখন সত্যি সত্যি ঠ্যাঙে এসে কোপ বসাব তখন টের পাবে মার কাকে বলে।"

বলতে বলতেই দ্বিগুণ উৎসাহে কুড়ুল চালাল ইয়েগর। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে গেল বুড়োর আর্তনাদের বহর। ব্যথায় যেন ছটফট করছে সে, "উফ! উফ!

কেন আমার জঙ্গলটাকে এভাবে মারছ তুমি? কী ক্ষতি করেছে ও তোমার?”

“ক্ষতি করবে কোন দুঃখে? আরে আমায় তো প্রাণটা বাঁচাতে হবে, নাকি? বোঝ না নাকি কিছু?”

“আরে বাঁচবে যদি তো প্রাণভরে যত খুশি বাঁচো না! কে মানা করছে?” বুড়ো শান্ত গলায় জবাব দিল, “নদীর ধারে প্রাণটা যখন যায়নি তখন যদ্দিন খুশি বেঁচে নাও। বেঁচে থাকা তো দারুণ জিনিস!”

“আরে জানি জানি। ওসব আর তোমায় বলতে হবে না।” বলতে বলতেই ফের গাছের গায়ে কুড়ুল চালাল ইয়েগর। “ওইসব বুমার্কা জ্ঞানবাণী আমায় আর শুনিও না তো!”

“তুমি বেজায় বদ লোক দেখছি!” বুড়ো দেখা গেল এইবার খানিক রেগে উঠছে, “সবাই, সবকিছু বেঁচে থাকতে চায়, আর তুমি গাছটাকে চোখের সামনে মেরে ফেলছ? ওতে করে আমাকেও তুমি মেরে ফেলছ যে!

“হা হা। নদীর ধারে কী হয়েছিল মনে আছে? একটা ফোঁটা জল চেয়ে মরছিলাম। কী করেছিলে তখন, অ্যাঁ? দয়া করেছিলে আমায়? তেষ্টায় আমার প্রাণটা যখন যাচ্ছিল তখন তো দিব্যি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে। আর এখন এসেছে গাছের প্রাণ বাঁচানোর ওকালতি করতে? সোজা কথা বলছি, মানে মানে এখান থেকে বিদেয় হও। আমি আমার কাজ করি।”

“আহা, কী আশ্চর্য! তোমায় দয়া করতে যাব কেন? তুমি তো মানুষ! দুনিয়াজোড়া। কত মানুষ আছে বলো তো! আর আমি? আমি হলাম একদম একলা।”

“মানুষ দু-একটা কমলে অসুবিধে কী? অনেক আছে তো। তাছাড়া তোমরা নিজেরাও তো নিজেদের কত লোকজনকে মেরে ফেলো। তাহলেই বলল, একটা মানুষ কমবেশি হলে কী যায় আসে?

“কিন্তু আমার কথা আলাদা। আমি পৃথিবীতে একলা। একদম একলা। আমি হেন দুটি দিওবা নেই দুনিয়ায়। জঙ্গলে আগুন লাগলে আমার ব্যথা লাগে। একটা

গাছ কাটলে, একটা জংলি জানোয়ারের প্রাণ গেলে আমার ব্যথা লাগে।”

“দেখো, বাজে কথা বেশি বোলো না।” ইয়েগর ঝাঁঝিয়ে উঠল এবার, “খালি খালি মানুষের দোষ দিচ্ছ যে বড়ো? জঙ্গলে জন্তুরা বুঝি কেউ কাউকে খুন-টুন করে না? তাদের অত দরদ দেখাবার তুমি কে হে?”

“বললাম তো, আমি দিওবা-নগুও।”

“ভালো। এবার তোমার নেকড়েদের নিয়ে বিদেয় হও। আমায় জ্বালিও না।” বলতে বলতেই ইয়েগর গাছটার গায়ে ফের কুড়ুলের ফলা বিঁধিয়ে দিল।

বুড়ো বিষমুখে মাথা নাড়ল একবার, “এই যে তাইগা, নেকড়ে, আমি, মাভকা... আমাদের সবার মা হল মেন্তন্যামি, মানে ধরিত্রী। আমাদের সবারই তাই একটাই আত্মা। এই যে তুমি গাছটায় কুড়ুল মারছ, তাতে গোটা জঙ্গলটার ব্যথা লাগছে। আমার ব্যথা লাগছে। টের পাও না তুমি? অবশ্য পাবেই বা কী করে? মানুষ তো আর মেন্তন্যামির সন্তান নও! সে হল পাতালরানি সিরাদা-ন্যামির ছেলেপুলে। তাই তোমাদের কলজেগুলো এত ঠাণ্ডা। দয়ামায়া, বুদ্ধি কিছুই নেই।”

“পাগল-ছাগলের কথায় আমি পাত্তা দিই না।” কুড়ুল চালাতে চালাতেই ইয়েগর বলল, “তুমি তোমার ওসব গালগপ্পো অন্য জায়গায় গিয়ে শুনিও।”

শুনে বুড়ো হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখল ইয়েগরের দিকে। তারপর বলল, “মাভকার সঙ্গে একটা গোটা রাত কাটাবার পরেও এসব পাগল-ছাগলের কথা বলে মনে হচ্ছে বুঝি? কেন যে ‘ইচ্ছেধারী’ টা শিঙে খুঁকে ওকে আটকাতে গেল! মেরে ফেললেই ভালো হত।”

“দিওবা, এখনও বলছি, বিদেয় হও।” বলতে বলতে কুড়ুলটা নামিয়ে ধরল ইয়েগর, “আমায় জ্বালিও না বলে দিচ্ছি।”

“জ্বালাব না মানে? এই বনটাই তো আমার শরীর! তুমি তাকে কেটেকুটে একশা করছ, তাতে আমার আত্মায় ব্যথা লাগছে, আর আমি বলব না?”

“আত্মা মানে? কার আত্মার কথা বলছ?” ইয়েগর এইবার দাঁতে দাঁতে ঘষছিল, “তোমার আত্মা তো তোমার ওই হাড়হাভাতেমার্কা শরীরটায় কোনোমতে খাবি

খাচ্ছে।”

“সে তো তোমাদের দোষে!” বুড়োও গলা চড়াল, “জঙ্গলে আগুন দিয়ে, গাছ কেটে, জীবজন্তুদের মেরে, নদীতে বিষ দিয়ে তাণ্ডব করছ যুগ যুগ ধরে। সেইজন্যই তো আমার শরীরের এই হাল হয়েছে।”

“হয়েছে তো হয়েছে। তাতে আমার কী?” বলতে বলতে ইয়েগর পাইনগাছটার গায়ে ফের একবার কুড়ুলের কোপ মারল।

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথায় ঝাঁকিয়ে উঠল বুড়ো, “তুমি লোকটা বড্ড খারাপ হে! এইবার আমি রেগে যাচ্ছি। আগে তোমায় দিয়ে পাইনগাছটার চোট সারাই করাব। তারপর নেকড়ের পালের হাতে তুলে দেব তোমায়। জানো তো নেকড়েরা মানুষ পেলে কী করে?”

“আরে যা যা পাগল বুড়ো!” ইয়েগর কুড়ুল চালাতে চালাতে জবাব দিল। “ভালো কথায় বলছি, গায়ের শার্টটা ছিঁড়ে সরু সরু ফালি বানিয়ে গাছটার কাটা জায়গাটা ব্যান্ডেজ করে দাও।”

“দুঃখিত মহারাজ। ফার্স্ট এইড বক্স সঙ্গে আনিনি।” কুড়ুল চালাতে চালাতে কথাটা বলতেই ইয়েগর টের পেল কানের কাছে একটা মৌমাছি গুনগুনিয়ে উঠছে। এক হাতে একটা চাপড় মেরে মৌমাছিটাকে ভাগিয়ে দিল সে। কিন্তু তার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল বিরাট একটা মৌমাছির ঝাঁক ডেকে এনেছে সেটা। ইয়েগরের মাথা ঘিরে একটুকরো মেঘের মতোই ঘুরতে ঘুরতে গোঁ গোঁ ডাক ছাড়ছিল ঝাঁকটা।

“এখনো বলো, আমার গাছটার চোট সারিয়ে দেবে?” মৌমাছির ডাকের মধ্যে দিয়ে বুড়োর গলাটা শুনে দাঁতে দাঁত চেপে ইয়েগর বলল, “কক্ষনো না।”

সঙ্গে সঙ্গেই মৌমাছির ঝাঁকটা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে। তাদের হাত এড়িয়ে পালানো কঠিন। শত চেষ্টাতেও তাদের একজনেরও নাগাল পাওয়া যায় না। চোখের পলকে ইয়েগরের চোখদুটো হুল খেয়ে ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে সে ধুলোর একটা ঝড় তুলে ঢালটা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে নদীর

জলে ঝাঁপ দিল।

জলটা কনকনে ঠাণ্ডা। সেখানে ডুব দিয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। ওদিকে মাথা তোলাও মুশকিল। কারণ, মাথার ওপর মৌমাছির ঝাঁক অপেক্ষায় রয়েছে। মাথা ভাসালেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা দল বেঁধে। তারপর একটু বাদে জলের তলায় কেউ তার পায়ে একটা জোরদার কামড় দিল। তারপর ফের একটা কামড়। দু-নম্বরটা অনেকটা করাতের টানের মতো পা-টাকে যেন চিরে দিয়ে গেল তার। জিনিসটা যে ঠিক কী, সেটার কোনো আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল না। জলের নিচে অদৃশ্য থেকে সেটা ইয়েগরকে ঘিরে

ঘোরে আর একেকবার শরীরের একেক জায়গায় করাতের মতো দাঁত দিয়ে হামলা চালায়।

পারতে শেষমেশ ইয়েগর জল ছেড়ে ডাঙায় ছুটে এসে বালি খুঁড়ে তার নিচে লুকোবার চেষ্টায় ছিল, ঠিক তখনই বালির তলা থেকে কিছু একটা উঠে এসে তার পেটে একটা মোক্ষম কামড় দিল। তারপর তো সেটা কিচ কিচ করে ডাক ছাড়ে আর তার পেটে, পিঠে, থাইতে কামড় লাগায়।

নাস্তানাবুদ হতে হতেই সে শোনে বুড়ো হাসি হাসি গলায় বলছে, “গাছটার চোট সারাবি এবার? নাকি আরও কিছুক্ষণ...”

“কসাইগুলোকে হটাও আগে আমার কাছ থেকে!” বলে আর্তনাদ করে উঠল ইয়েগর।

সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণকারীরা উধাও। ভেজা মাটিতে মুখ গুঁজে খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল ইয়েগর। তারপর খানিক দম নিয়ে উঠে টলতে টলতে রওনা হল। সারা শরীর দাঁত আর হুলের ঘায়ে ফুলে ফুলে উঠেছে তার। কোনোমতে ফের ঢাল বেয়ে উঠে অর্ধেক কাটা গাছটার গোড়ায় গিয়ে দাঁত চেপে সেখানটায় বসে পড়ল সে।

“হতচ্ছাড়া বজ্জাত বুড়ো!” বলতে বলতে ফুলে ওঠা ঠোঁট দুটো কোনোরকমে ফাঁক করে একদলা থুতু ছুড়ল সে সামনের মাটিতে।

"জামাটা ফালি ফালি করে ভেঁড়ো।" দিওবা শান্ত গলায় বলল, "পাইনগাছটার চোট সারাও প্রথমে। তারপর নদীটাকে ধুতে হবে।"

"নদী ধুতে হবে... মানে? পাগল হলে নাকি? নদী কি ধোয়া যায় নাকি?"

"মানুষ জলে বিষ দিয়ে নদীর মাছ সব মারতে পারে, আর তাকে ধুয়ে সাফ করতে পারে না? ওসব জানি না। নাও, এখন আগে গাছটার বন্দোবস্ত করো।"

"পাগল বুড়ো কোথাকার।" বলতে বলতে লজ্জায় অধোবদন হয়ে ইয়েগর গায়ের শার্টটা খুলে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফেলল। জামাটা পুরনো। সুতো পচে এসেছে। সামান্য টান দিতেই এবড়োখেবড়ো হয়ে ছিঁড়ে গেল সেটা। মৌমাছির কামড়ে ফুলে ওঠা চোখ দুটোকে কোনোক্রমে সামান্য ফাঁক করে ইয়েগর ফালিগুলো দিয়ে পাইনটার কাটা জায়গাটা বাঁধছিল। ক্ষত থেকে বের হয়ে আসা আঠালো ধুনোর রস তার হাতে এসে লাগছিল। ফালির পর ফালি বাঁধতে বাঁধতেই সজ্ঞানে এরকম একটা পাগলামি করতে বাধ্য হয়ে একটা তিক্ততা ছেয়ে ফেলছিল তাকে।

"তোমায় আমি দেখে নেব বুড়ো!" কাজটা করতে করতেই ভাঙা গলায় সে একবার চিৎকার করে উঠল।

"গাছটার চোট সারাও আগে।" বুড়ো শান্ত গলায় জবাব দিল, "যখন আমার যন্ত্রণা হচ্ছিল আমায় তুমি দয়া করোনি। এখন নিজের ওপরেই দয়া দেখাও খানিক। শরীরে জ্বালা হচ্ছে, তাই না? গাছটার জ্বালা কমাও, তাহলে নিজের জ্বালাও কমবে। ব্যথা দিলে ব্যথা পাবে। তোমাদের মানুষদের নিয়ে এই হল মুশকিল, সিধে কথা তোমরা বোঝে না। মারধোর না দিলে, প্রাণের ভয় না দেখালে তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না।" বলতে বলতেই মাথা নাড়াচ্ছিল বুড়ো।

খানিক বাদে পাইনের গায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে তার দুটো মাথা দিয়ে একটা সুন্দর বো বেঁধে দিল ইয়েগর। "হয়েছে? তোমার গাছের সেবাটা ভালো করে করেছি? নাকি..."

"হুম। চলোলা। এবার নদীটা ধোয়া শুরু করো। কী যে নোংরা হয়েছে!"

"সাবান-টাবান কিছু নেই সঙ্গে..." ইয়েগ গজগজ করে বলল। "দরকার নেই।

সাবান ছাড়াই ধোয়া যাবে।”

“কী করে ধুতে হবে সেটা তবে দেখিয়ে দাও। তুমি অর্ধেক ধোবে, আমি অর্ধেক ধোবো।”

দু’জন মিলে নদীর ধারে যেতে ইয়েগর ভয়ে ভয়ে বলল, “ফের তোমার মাছ লেলিয়ে দেবে না তো?”

“উঁহু। নাও, জলে ঝাঁপ দাও দেখি।”

“এই দিই।” বলে ইয়েগর খানিক দৌড়ে এসে সটান ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। তারপর প্রাণপণে ডুবসাঁতার দিয়ে নদীর উলটো পাড়ের দিকে রওনা দিল। ভয়ে তার গায়ে তখন অসুরের শক্তি। কিন্তু তাও নদীর স্রোত তাকে ভাটার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

শেষমেশ সে অন্য পাড়ে যেখানটায় গিয়ে উঠল, সেখান থেকে এদিকের পাইনগাছটা আর চোখেই পড়ে না। এখানটায় জমিটা খানিক নাবাল আর ঘাসে ঢাকা। ইয়েগর সাবধানে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। বুড়োকে কোথাও চোখে পড়ছে না।

তবুও সাবধানের মার নেই ভেবে সে খানিকক্ষণ সেই ঘাসে ডুবে চুপচাপ শুয়ে রইল।

খানিক বাদে দম ফিরে পেলে উঠে বসে গায়ের কাটাকুটিগুলো ভালো করে দেখল ইয়েগর। কোনোটাই মারাত্মক কিছু নয়, কিন্তু ওতে বিপদের ভয় আছে। সঙ্গে কোনো ব্যান্ডেজ বা ওষুধ নেই। সামান্য কোনো সমস্যা হলেও এই নির্জন তাইগায় তা থেকে প্রাণ যেতে পারে।

আস্তে আস্তে নদীর জলে নেমে সে ফের একবার ক্ষতগুলো ভালো করে ধুয়ে নিল। একটা কলাগাছ পেলে ওর পাতার রস লাগানো যেত, কিন্তু খুঁজেপেতে সে গাছের কোনো চিহ্ন মিলল না। তাইগায় ও-গাছ হয় না। বাইরে থেকেও কেউ কখনো সে গাছের বীজ

এখানে নিয়ে আসেনি। কারণ, বাইরের মানুষের পা কখনো পড়েনি তাইগার

এই একেবারেই কুমারী বনাঞ্চলে।

খানিকক্ষণ সেই ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি করে ইয়েগর পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে দেখল একবার। কাঠিগুলো নদীর জলে ভিজে ফুলে উঠেছে একেবারে। সেগুলোকে খানিক আঙুলে ধরে ঘুরিয়ে দেখে শেষে টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ইয়েগর। ও দিয়ে কাজ হবে না আর কোনো।

সেগুলোকে জলে ভেসে যেতে দেখতে দেখতে ইয়েগর নিজের মনেই বলছিল, 'দাবানলের তাড়া খেয়ে, নদীতে আধডোবা হয়ে, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে, মৌমাছি আর মাছের হামলা সয়ে তাও প্রাণে বেঁচে আছ হে! তার মানে সহজে তোমার প্রাণ যাবে না। চলো দেখা যাক!' এই বলে নদীর পাড়ের জলা এলাকাটার মধ্যে দিয়ে সে রওনা হল।

খানিক বাদে শুকনো একটুকরো জমিতে পৌঁছে সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া একটা পায়ে চলা পথের মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়াল ইয়েগর। তারপর কী ভেবে চার হাতপায়ে উবু হয়ে বসে পড়ে পথটার দিকে খানিক চোখ ফেলে তার মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। হারিয়ে যাবার পর থেকেই যে জিনিসটা দেখবার জন্য তার মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে, অবশেষে সে জিনিসের চিহ্ন দেখা গেছে ওই রাস্তাটার গায়ে মানুষের চিহ্ন। নরম মাটির বুকে একটা লম্বাটে, সরু দাগ। কেউ কোনো ভারী জিনিস টেনে নিয়ে গেছে এইখান দিয়ে।

দাগটা দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁক দিল ইয়েগর, "শুনছেন? কেউ কি আছেন?"

তার গলার আওয়াজটা চারপাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফের প্রতিধ্বনি হয়ে তার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আর ঠিক তখনই তার কেমন যেন মনে হল, সামনের মধুলতার ঝোঁপটার ঠিক পেছন থেকে কেউ তাকে দেখছে। হয়তো নিজের হাঁকডাকের প্রতিধ্বনির শব্দের জন্য ইয়েগর তার আসবার শব্দ পায়নি।

ঝোঁপটার দিকে ঘুরে কাউকে দেখতে পেল না ইয়েগর। খানিক অপেক্ষা জোরে সে হাঁক দিল, "আরে লুকিয়ে আছ কেন? বের হয়ে এসো না! ভয় কী? আমি মানুষ।

রাক্ষস টাক্ষস নই।"

"আগে কুড়ুলটা ফেলো।" ঝোঁপের আড়াল থেকে ভারি মিষ্টি একটা গলা কথা বলে উঠল তার জবাবে।

"এটা কি মাভকা নাকি?" বলতে বলতে ঘাবড়ে এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল ইয়েগর, "তাই যদি হয় তাহলে এক্ষুনি ভাগো এখান থেকে।"

ঝোঁপের ভেতর থেকে এইবার ভারি নরম, মিষ্টি একটা হাসির শব্দ ভেসে এল, "ধুৎ! আমি মাভকা হতে যাব কেন?"

হাসিটা শুনলে বেশ ভরসা জাগে। ইয়েগর হাতের কুড়ুলটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর বলল, "আমায় ভয় পাবার কিছু নেই। কোনোমতে প্রাণটুকু টিকে আছে। তোমার গ্রাম কি কাছাকাছি? কিছু খাবার এনে দিতে পারবে আমায়? খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি আমি।"

এইবার মধুলতার ঝোঁপটার পেছন থেকে মেয়েটা বেরিয়ে এল। ঠিক মেয়েও বলা যায় না। এইটুকুন একটা বাচ্চা। ভারি রোগা। ছবির মতো সুন্দর। গালে রাস্পবেরির রসের দাগ। গায়ে একটা লাল সারাফান, মাথায় সাদা রুমাল।

দেখে ইয়েগর একটু নিশ্চিন্ত হল। বলে, "এখানে কোত্থেকে এসে উদয় হলি তুই? আমি তো ভেবেছিলাম এ মুলুকে আর মানুষের দেখাই পাব না কোনোদিন।"

বলতে বলতেই খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল ইয়েগর। ফুলে ওঠা ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে হাসবার চেষ্টাও করল খানিক। তারপর বলল, "গোল গোল চোখ করে দেখছিস কী? আমার মুখচোখের অবস্থা দেখলে ভয় খাবারই কথা। তবে আমি বুনো ভূত-টুত কিছু নই। আমি ইয়েগর। তাইগার জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে কয়েকটা ভূতপেত্নীর খপ্পরে পড়েছিলাম। মজা দ্যাখ, তাও মরিনি আমি। আয়, আমার পাশে একটুখানি বোস। আমি একটু ঘুমুই। তারপর আমরা একসঙ্গে তোদের গ্রামে যাব, কেমন?

ছোট্ট মেয়েটা জবাব দিল না কোনো। শুধু মধুলতার ঝোঁপটার পাশে হাসি মুখে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে দেখে ইয়েগর বুঝতে পারছিল তাকে সে

একটুও ভয় পাচ্ছে না। বোধ হয় ওর বাড়ির বড়োরা কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে। এই কথাটা মনে হতেই মনটা ভারি শান্ত হয়ে গেল ইয়েগরের। গত কয়েকটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত লড়াই করতে করতে কেটেছে তার। প্রতিটা মুহূর্তে তার মনে হয়েছে এই হয়তো শেষ। অনিঃশেষ এই চাপা আতঙ্কের ভার হঠাৎ করেই তাকে ছেড়ে উধাও হল যেন। রয়ে গেল একটা বিরাট খালি ভাব আর সাংঘাতিক খিদে। পেটে সেই খিদের আঁচড়ানি সইতে সইতেই মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা আশ্চর্য আনন্দ হচ্ছিল তার। সুন্দর, শক্তিমান এই মানুষজাতির একজন সদস্য সে। আর সে একা নয়।

“আমায় কিছু খাবার এনে দিবি? আর সেই সঙ্গে তোর বাড়ির বড়দেরও একটু ডেকে আন না! আমি মোটে উঠতে পারছি না রে।”

মেয়েটা কোনো জবাব দিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে ঠোঁটদুটো কয়েকবার ছুঁচলো করল যেন এক্ষুনি সে শিস দিয়ে উঠবে। তারপর নিচু হয়ে তার শিরপা-র লম্বা ঝুলের পেছনের ঘাসের ভেতর থেকে রাস্পবেরির একটা ঝুড়ি বের করে এনে ইয়েগরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। ইয়েগর তার থেকে একমুঠো রাস্পবেরি তুলে নিয়ে সটান মুখে পুরে দিল।

আর তারপরেই তার খেয়াল হল, এখনও তো রাস্পবেরির পাকবার সময় হয়নি! এইখানটা আসতে আসতেই তো সে অনেকগুলো রাস্পবেরির ঝোঁপ দেখেছে। তাতে সবে গুটি ধরেছে এখন। কাঁচা। টক। সবুজ। কিন্তু মেয়েটার ঝুড়ির রাস্পবেরি তো একেবারে পাকা। আর কী সুগন্ধ তাতে! দেখলেই বোঝা যায় একেবারে সদ্য গাছ থেকে তোলা হয়েছে তাদের।

তবে সে-মুহূর্তে তার এমন সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল যে এইসব প্রশ্ন করে নিজেকে বা মেয়েটাকে বিব্রত করবার কোনো ইচ্ছেই হচ্ছিল না তার। খানিক বাদে মেয়েটার হাতে খালি ঝুড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে ইয়েগর জিজ্ঞাসা করল, “হ্যাঁ রে, তোর কাছে খানিক রুটি হবে?

মেয়েটা অমনি নিচু হয়ে পায়ের কাছে ঘাসের ভেতর থেকে একটা বড়সড়

রুটির টুকরো বের করে আনল। দেখে ইয়েগ একটু অবাক হল, কিন্তু সেই সঙ্গে রুটিটা মহা তৃপ্তি করে চেটেপুটে খেয়ে নিল।

"তা হ্যাঁ রে, ঘাসের ভেতর আর কী কী লুকোনো আছে রে তোর?"

মেয়েটা কাঁধ নাচিয়ে হাসল একটুখানি। হাসিটায় কোনো শিশুভাব ছিল না। একেবারে বড়োদের মতো ভঙ্গি তার। ব্যাপারটা ইয়েগরের নজর এড়াল না। তবে তাইগার গভীরে

এইসব কঠোর এলাকায় মানুষজন হয়তো একটু তাড়াতাড়িই বড়ো হয়ে যায়।

"আর কী চাই বলো তোমার?"

"এইবার আমি একটু ঘুমোতে চাই রে।" ইয়েগর জবাব দিল, "শরীরটা ভেঙে পড়ছে আমার একেবারে। আমি একটু ঘুমুই, আর তুই সেই ফাঁকে গিয়ে তোদের বড়োদের ডেকে নিয়ে আয় এখানে। পারলে একটু জামাকাপড়ও নিয়ে আসিস, বুঝলি? দেখতেই তো পাচ্ছিস গায়ে আমার একটা জামা ইস্তক নেই।"

শুনে মেয়েটা মাথা নেড়ে ঝোঁপঝাড়ের ভেতর মিলিয়ে গেল। ইয়েগর খেয়াল করল, তার পায়ের শব্দ উঠল না কোনো। তার পোশাক সামান্য খসখস শব্দও তুলল না ঝোঁপের গায়ে ঘষা লেগে। তার পায়ের নিচে একটা কাঠিকুটোর মচমচানিও শোনা গেল না।

ঘুমে চোখ জুড়ে আসবার আগে ইয়েগর শুধু সেই ঝোঁপগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "ফিরে আসিস কিন্তু। আমায় একেবারে ছেড়ে চলে যাস না। আমি তোর জন্য এইখানে বসে থাকব।" কথাগুলো বলতে বলতেই চোখ জড়িয়ে এল তার। মাথার নিচে কুডুলটাকে বালিশ বানিয়ে, তাকে ঘিরে আসা মশার ঝাঁকের গুনগুনানির তোয়াক্কা না করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ইয়েগর। যেন অতল সাগরের বুকে জেগে ওঠা অন্ধকার একটা ঘূর্ণি এসে টেনে নিয়ে গেল তাকে চেতনাহীন অন্ধকারের দেশে।

ইয়েগরের নতুন বাসা একটা গাছের ভেতর। উঁহু, কোনো গাছের খোঁদল বা

ডালের ওপর নয়। পুরো গাছটা জুড়েই তার বাস। তার শেকড় থেকে পাতা সবকিছু জুড়ে ছড়িয়ে থাকে ইয়েগরের শরীর। তার মধ্যে দিয়ে মাটি থেকে রস উঠে ছড়িয়ে যায় পাতায় পাতায়। প্রত্যেক বছর তার কাণ্ডে একটা করে বয়সের রিং যোগ হয়। বাতাসে ইয়েগরের শরীরটা মড়মড় শব্দ করে দোলে।

এই নতুন শরীরটা ইয়েগরকে একদম অবাক করেনি। উলটে ব্যাপারটাকে তার বেশ স্বাভাবিকই ঠেকে। স্বাভাবিক আর সুবিধেজনক। বিরাট একটা মাঠের মধ্যে বেড়ে উঠছে সে। তার শেকড় ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর গভীরে, মাটির আড়ালে জড়িয়ে যাচ্ছে আরও কত না গাছের শেকড়ের সঙ্গে।

বেশ একটা অন্ধকার, উষ্ণ আর আরামের অনুভূতি সবসময় জড়িয়ে থাকে তাকে। প্রত্যেক মুহূর্তে ইয়েগর তীব্রভাবে টের পায়, সে বেঁচে আছে। বেড়ে ওঠা, কেবল বেড়ে ওঠা। এছাড়া আর কিছু চাই না তার। একটাই শুধু ভাবনা আছে তার মনে। তা হল, কবে পাখিরা আসবে তার ডালে। সেখানে তারা বাসা বাঁধবে। অজানা বুলিতে কত না গান শোনাবে তাকে! তবে সে ভাবনায় কোনো অস্থিরতা ছিল না তার। সে তো জানে এমনটাই হবে। সেটাই নিয়ম। তাই সে শান্ত হয়ে পাখিদের আসবার অপেক্ষায় থাকে।

কেউ একজন তার শরীরের পাশটায় ছুঁল হঠাৎ এসে। সে তার একটা ডাল একটু নাড়িয়ে দিল। তারপর অলসভাবে ভাবল, বোধ হয় কোনো কাঠঠোকরা এসেছে তার ছাল থেকে পোকা খুঁটে নিতে। পোকাগুলো কিংবা ওই কাঠঠোকরাটা এই দুই-ই তার শরীরেরই অংশ বলেই মনে হয় তার।

কিন্তু নাহ, কাঠঠোকরা নয়। কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। "ইয়েগর..." নড়েচড়ে উঠে চোখ না খুলেই একটুখানি সাড়া দিল সে। "উঠে পড়ো হে ইয়েগর।" গলাটা আবার ডাক দিল তাকে।

"এরই মধ্যে ওঠবার সময় হয়ে গেল?" বলতে বলতে চোখ মেলে চেয়ে দেখল ইয়েগর। কোথায় গাছ? সে তো মানুষই আছে! একটা বড়সড় রাশিয়ান স্টোভের পাশে নরম চামড়ার বিছানায় শুয়ে আছে সে। ভুরু অবধি লাল টুপি দিয়ে ঢাকা

একটা দাড়িওয়ালা লোক ঝুঁকে পড়ে ডাকছিল তাকে। এইবার তার মনে পড়ল, নদীর ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। তার মানে তাকে এইখানে বয়ে এনে শোয়ানো হয়েছে। তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে। পশমের তৈরি ঢিলে একটা শার্ট আর প্যান্ট তার পরনে। দুটোই একেবারে নতুন। খানিক বাদে কী খেয়াল হতে গায়ে মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিল সে। কোথাও কাটাকুটির কোনো চিহ্ন নেই। কোথাও

কোনো ব্যথা নেই। জ্বালা নেই। মাথাও ঘুরছে না এতটুকু। ঘুমের মধ্যেই শরীর একেবারে সেরে গেছে তার।

খুশি খুশি মুখে লোকটার দিকে তাকিয়ে ইয়েগর বলল, "ধন্যবাদ।

"আরে দেখো কাণ্ড! এ আমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছে!" বলতে বলতেই তার মাথার ওপর থেকে একটা গলা ঝরঝরিয়ে হেসে উঠল।

ইয়েগর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটার পরনে বেশ পুরনো ধরনের একটা কোট। হয় সেটা চাষাভুষোদের ভারী পোশাক আর্মিক, কিংবা ঘরে বোনা জিপুনও হতে পারে। লোকটার মাথার লাল টুপিতে সাদা বর্ডার। তার দাড়ি লালচে। চাষিদের একটা সাদা শার্ট পরেছিল সে কোটের নিচে। তার কলার ডান কাঁধের ওপর ফিতে দিয়ে বাঁধা।

"ধন্যবাদ স্যার।" ইয়েগর হাতটা বাড়িয়ে রেখেই ফের একবার বলল। জবাবে লোকটা ভালোমানুষ মার্কা একটা হাসি দিল। তারপর হাত-টাত না মিলিয়ে জানালার পাশে গিয়ে একটা লম্বা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল।

মাথার ওপর থেকে গলাটা এইবার ফের কথা বলল, "দেখছ দেখছ, এ কেমন হাতটা বাড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে?"

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ইয়েগর। ঘরটার দেয়ালগুলো খরখরে। সরু জানালাগুলো অর্ধ স্বচ্ছ কিছু দিয়ে ঢাকা। সেখান দিয়ে বাইরেটা চোখে পড়ে না। ঘরের ভেতর একটা বড়ো টেবিল। দেয়ালের গা ধরে ধরে লম্বা লম্বা বেঞ্চ আর দরজার ঠিক পাশে পাথরের তৈরি একটা রাশিয়ান চুলো।

চুলোর ঠিক ওপরটায় একটা ছেলে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছিল। ঢালু ছাদের প্রায় কাছাকাছি উঠে বসেছে সে। ইয়েগরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে জিভ বের করে ভেঙিয়ে দিল তাকে।

ইয়ের তাকে জিজ্ঞাসা করল, "গ্রামটার নাম কী রে?"

শুনেই ছেলেটা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বার জোগাড়। ইয়েগরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বয়স্ক লোকটা অবশ্য হাসল না। বেশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, "এইখানে গ্রাম! মানে?"

অতএব ইয়েগর বুঝল, এখানে কোনো গ্রাম নেই। বাড়িটা নির্জন তাইগার অরণ্যের বুকে একলা দাঁড়িয়ে আছে। পুরনোকালে কিছু কিছু মানুষ এইভাবে পুরুষানুক্রমে গভীর জঙ্গলে নির্জনে বাস করতেন। এঁরাও সম্ভবত তেমন কোনো মানুষ হবেন। হয়তো কোনোদিন অন্য মানুষজনের বসতিতে পা-ও দেননি তাঁরা। আর সেজন্যই হয়তো পোশাকগুলো এঁদের এত পুরনো ধাঁচের। হয়তো সেজন্যই হাত মেলাবার প্রথাটাই এঁদের কাছে অজানা।

তবে সেসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে ইয়েগরের ছিল না। এঁরা তার জন্য যা করেছেন সেটা অমূল্য। এখন আরেকটা শেষ উপকার যদি এরা করেন...।

একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে ইয়েগর বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে। গ্রাম নয় না-ই থাকল, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে কোনো শহর-টহরে যাবার রাস্তা যদি একটু বলে দেন। আমি তবে আর একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা হয়ে যাব।"

"এখান থেকে বের হবার কোনো রাস্তাঘাট নেই।" বয়স্ক লোকটা গম্ভীরভাবে বলল। "তার মানে? আমায় কি আপনাদের সঙ্গেই থাকতে হবে?"

"থাকো না যদ্দিন খুশি। কে মানা করছে!" বলতে বলতে লোকটা জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ঝাপসা ঢাকনার ভেতর দিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

"আর, আমি এখানে থাকতে না চাইলে?"

"তাহলে চলে যাও! এত বড়ো তাইগাটায় জায়গার তো অভাব নেই কোনো!"

“সে তো ঠিকই।” ইয়েগর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, “কিন্তু মুশকিল হল, রাস্তাঘাট না জানলে চলে যাবটা কোথায়?”

শুনেই লোকটা হঠাৎ লাফ দিয় ইয়েগরের সামনে এগিয়ে এসে তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিড়বিড় করে বলে, “নিজে এসেছিস, আমরা ডাকিনি। যেথা খুশি যাবি, আমরা ডাকিনি...”

ইয়েগর ওর মধ্যে কেবল একটাই শব্দ খেয়াল করছিল, ‘...আমরা ডাকিনী... আমরা ডাকিনী...’

কথাগুলো বলতে বলতেই লোকটা সমস্ত ভদ্রটা-টদ্রতা ভুলে চার হাত-পায়ে উপুড় হয়ে পড়েছে মেঝের ওপর। তারপর মেঝে জুড়ে কিলবিল করে হামাগুড়ি দেয় আর চিৎকার করে,

“দাও হে কর, কোন নগর, কত হে ইনকাম? পাও হে সুখ আরেকটুক, আরও বেশি আরাম।”

জবাবে চুলোর মাথায় পা তুলে বসে থাকা ছেলেটা হেসে গড়িয়ে পড়বার জোগাড়। বয়স্ক লোকটা ছড়া কাটা থামিয়ে ইয়েগরের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, “কী হে, একটু আধটু ভয়-টয় পেলে নাকি?”

“আজ্ঞে না।” বলতে বলতে ইয়েগর চামড়া বিছানাটার ওপরে ফের একবার আসনপিড়ি হয়ে বসে পড়ে বলল, “পাগল সাজা হচ্ছে? আপনার মতলবটা কী ঠিক করে বলুন তো।”

লোকটা তার দিকে খানিক বিরক্ত চোখে তাকিয়ে দেখল এবার। তারপর বলল,

“তাহলে এইটে দেখলে বোধ হয় খানিক ভয় পেতে পারো। দেখো দেখি...”

বলতে বলতেই জানালা দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোটার সামনে সে এক্কেবারে খাড়া উঠে দাঁড়িয়েছে। আর তারপর ইয়েগরের চোখের সামনে কেমন যেন চেপটে যেতে লাগল মানুষটা। ইয়েগর ঘাবড়ে গিয়ে একটা লাফ দিয়ে চুলোটার কাছে সরে এল। তার সামনে লোকটা তখন বেঁকেচুরে তালগোল পাকিয়ে একটা মাংসের দলায় বদলে যাচ্ছে। তার বড়সড় মুণ্ডুটা ততক্ষণে তার বুকের ভেতরে ঢুকে গেছে।

পাগুলো গুটিয়ে এসে পাক খেয়ে খেয়ে দড়ির মতো জড়িয়ে গিয়ে একটামাত্র থামের মতো মোটা পায়ে বদলে গেছে। দেখতে দেখতে এক পায়ে দাঁড়ানো একটা মাংসের দলার বুক থেকে একটা দাঁতালো মুখ গজিয়ে উঠল। দাঁতের ফাঁকে একটা লম্বা বেগুনি রঙের জিভ লকলক করছিল।

ওদিকে চুলোর মাথায় বসে ছেলেটা হাসতে হাসতে প্রায় ফোঁপাচ্ছে ততক্ষণে। সেদিকে একনজর তাকিয়ে ইয়েগ দেখে, ছেলেটাও বদলে গেছে। উপস্থিত তাকে দেখতে একটা কালচে দলার মতো লাগছে। যেন একটা বড়সড় অ্যামিবা। মোচড় দিতে দিতে সেটা যে এরপর কোন চেহারা নিতে যাচ্ছে কে জানে।

ইয়েগরের মন চাইছিল একছুটে ঘরটা ছেড়ে পালিয়ে যায়। অনেক কষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করল সে। কুড়ুলটার অভাব টের পাচ্ছিল সে এখন। হাতের কাছে ওটা থাকলে....

খানিক বাদে দেখা গেল বয়স্ক লোকটা আস্তে আস্তে ফের মানুষের চেহারায় ফিরে আসছে। তবে এবারে সে অন্য মানুষ। রোগাভোগা একটা বুড়ো। এলোমেলো চুল, মুখে দাঁত নেই একটাও। পরনে লোমওয়ালা জন্তুর ছাল একখানা। একজায়গায় দাঁড়িয়ে টুকটুক করে লাফ দিচ্ছিল বুড়ো, যেন শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে-টাকিয়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। খানিক বাদে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ফোকলা মুখের হাসি চড়িয়ে সে বলল, "তা, ভয় কি লাগল একটু আধটু?"

"উঁহু। এক ফোঁটাও নয়। অনেক চেষ্টায় গলার কাঁপুনি আটকে কোনোমতে ঘরঘর করে বলল ইয়েগর, "শুধু বুঝতে পারলাম, তোমরা মানুষ নও। ঠিক আছে, যা উপকার আমার করেছ সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি চলি। আমার ছুরি আর কুড়ুলটা ফেরত দেবে কি? ওগুলো ছাড়া রাস্তায় একলা একলা... মানে বুঝতেই তো পারছ।"

তবে মুখে যতই সাহসী ভাব দেখাক, সেই মুহূর্তে ইয়েগরের মনটা এতটাই খারাপ হয়ে আছে যে পারলে সে মাটিতে উবু হয়ে বসে চিৎকার করে কাঁদে। যদি গোড়া থেকেই এরা মানুষ মানুষ ভাব না দেখাত তাহলে হয়তো এতটা দুঃখ তার

হত না। কিন্তু এরা মানুষ সেজে তার কাছে এসেছে, তাকে খাইয়েছে, বিশ্রাম দিয়েছে, আদর করে তার গায়ের ব্যথা সারিয়েছে। কিন্তু তারপর যখন সে টের পেয়েছে এরা আদৌ মানুষ নয়, আর মানুষের দুনিয়ায় ফেরবার রাস্তাও এরা তাকে দেখিয়ে দেবে না, তখন একাকিত্বের অনুভূতিটা ফের দ্বিগুণ শক্তিতে ফিরে এসেছে তার মধ্যে। সীমাহীন তাইগার গভীরে সে একা। এ তাইগা মানুষের নিয়তি, তার জীবন, মৃত্যু, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য কোনো কিছুর ধার ধারে না।

"আমি এবারে রওনা দেব।" বলতে বলতে এইবার ঘরটার দরজার দিকে এগিয়ে গেল ইয়েগর।

"একটুখানি দাঁড়াও ইয়েগর।" হঠাৎ পেছন থেকে একটা চেনা গলা এসে কানে ধরা দিতে থেমে গেল সে। হাসি মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, চুলোর ওপর বসে থাকা ছেলেটা এইবারে বনের মধ্যের সেই ছোট্ট, ঝলমলে মেয়েটার রূপ ধরেছে। তেমনই সুন্দর তার পোশাক। চুলে তেমনই একটা লাল রিবন বাঁধা।

"সব চোখে ধুলো দেয়া সাফাইয়ের খেলা।" এই বলে নিজেকেই যেন বা সান্ত্বনা দিতে দিতে ইয়েগর ঘরটা ছেড়ে রওনা হয়ে গেল।

তাইগায় সন্ধে নামছিল। ভ্যাপসা রোদে শুকিয়ে ওঠা শুকনো ঘাস আর ফুলের তীব্র সুবাস ভাসছিল বাতাসে। আকাশে ধূসর মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টি আসবে। বাড়িটার উঁচু বারান্দা ছেড়ে নেমে এসে ইয়েগর চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিল। জায়গাটা একেবারে অচেনা। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছগাছালি, অতিকায় সব পাইনগাছ, তাদের গায়ে সবুজে সাদায় মেশা লিচেন আর মসের বাহার, লম্বা লম্বা ফার্নের ফাঁকে ফাঁকে বিরাট বড়ো বড়ো পাথরের ড্যালা... যতদূর চোখ চলে এই একই দৃশ্য। কোনো পায়ে চলা রাস্তা, কোনো ক্যাম্প ফায়ারের জায়গা, কোনো চাকার দাগ, এমনকি একটুকরো সমান জমিও দেখা যায় না কোথাও। আর এই সবকিছুর মধ্যে লম্বা লম্বা ফার্নগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পাথরের ড্যালাগুলোর মতো কিংবা অতিকায় পাইনগাছগুলোর মতোই যেন বা, নিজে থেকে গজিয়ে উঠেছে ঘরটা। মানুষের বাসার একটা প্যারডির মতো দেখায় সেটাকে এই বিজন তাইগার

বুকে। যেন কোনো অজানা রসিকতায় এই মাটির বুক থেকে আর পাঁচটা জীবন্ত জিনিসের মতোই গজিয়ে উঠেছে সেও।

ইয়েগর তার পরনের শার্টটার কলারের সুতো দুটো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে হাঁটা দিল এবার। কোনদিকে যাচ্ছে সে নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই কোনো সে মুহূর্তে। থেকে লাভও নেই। সবটাই তো সমান অচেনা!

"ই-য়ে-গ-র..." মেয়েটার ডাক ভেসে এল পেছন থেকে, "কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

জবাবে পেছন ঘুরে মেয়েটার দিকে ফিরে প্রাণভরে খানিক গালাগাল দিল ইয়েগর। একাকিত্ব, তিক্ততা আর হতাশা মিলে তখন তার ভেতরে একটা বিষের সমুদ্র পাক খেয়ে উঠছে। সে বিষ, গালাগাল আর অভিশাপ হয়ে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। তাইগা, তার সূর্য, আকাশ, তার বুকে আশ্রয় করে থাকা হাজারো অ-মানুষ শত্রু প্রকৃতির একচ্ছত্র মালিক মানুষের প্রতিভূ ইয়েগরকে নিয়ে যারা খেলা করবার সাহস পায়, তাদের সবার উদ্দেশ্যে সে ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার অভিশাপ আর গালাগালের স্রোত। যা পারে করে

নিক ওরা। নেকড়ে লেলিয়ে দেবে? গভীর রাতে স্যাঁতসেঁতে, শীতল মাভকার মৃত্যু চুমু? প্রাণে মেরে ফেলবে তাকে? মারুক। কিন্তু শেষ দম অবধি সে মানুষ থাকবে। ওদের বশ মানবে না। মানুষ রাজার জাত। তাইগার এই অলুক্ষুণে অ-মানুষের দল তাকে মেরে ফেললেও মানুষকে হারাতে এরা পারবে না। যেমন পারে না স্বয়ং প্রকৃতি। মানুষের প্রাণ নিলেও শেষমেশ সেই মানুষের কাছেই বশ মানতে হয় তাকে।

অবশেষে একসময় তার চিৎকার থেমে এল। বুকের ভেতরে একটা ফাঁকা অনুভূতি নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ইয়েগর। তারপর হঠাৎ কাঠকুটো যা হাতের কাছে মেলে তাই তুলে নিয়ে সে ছুঁড়তে শুরু করল বাড়িটাকে লক্ষ্য করে।

গোটা সময়টা ধরে সেই ছোট্ট মেয়েটা বাড়িটার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ছাতলা ধরা রেলিংয়ে ঝুঁকে মুখটা গম্ভীর করে সে তাকিয়ে ছিল ইয়েগরের দিকে। ইয়েগরের ছুঁড়ে দেয়া কাঠকুটোর টুকরোগুলো উড়ে তার

কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ উলটোদিকে ঘুরে শিসের মতো শব্দ করে ধেয়ে আসছিল ইয়েগরের দিকে। প্রথমে কয়েকটা ছোটোখাটো ধাক্কা খেয়ে ইয়েগরের সম্বিৎ খানিক ফিরেছিল। আর শেষমেশ মাঝারি আকারের একটুকরো কাঠ এসে তার বুকে ধাক্কা দিতে কোনোমতে টাল সামলাল ইয়েগর। তারপর যুদ্ধবিগ্রহের ভাবনা ছেড়ে কাঠকুটোর একটা স্কুপের ওপর বসে খানিক বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে টানতে টানতে রওনা দিল। বুকের ভেতরটা তার তখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

"ধুস! আমি ভাবলাম কোথায় আমাদের খোকন নেকড়ে ধরতে যাবে,"

একটা বয়স্ক গলা কোথা থেকে যেন বিড়বিড় করে উঠল, "তা না! ফ্যাকাশে-মুখোটার মাথায় দেখছি ঘিলু বলে বস্তু নেই কোনো।"

ইয়েগরের জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না কোনো। এখন তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য একটা ছক বানাতে হবে ফের। একেবারে কেচে গণ্ডুষ করে শুরু করতে হবে নতুন করে। যে-কোনো রাস্তায় প্রাণটা ধরে রেখে সভ্য জগতে ফিরতে হবে তাকে, তা সে এই তাইগার অপদেবতার দল যতই তার পেছনে লাগুক।

অবশ্য বেচারাদের আর দোষ কী? মানুষের ওপর তাদের রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। শক্তি, জ্ঞান, যুদ্ধ সব ব্যাপারেই মানুষ তাদের থেকে অনেক এগিয়ে। গোটা পৃথিবীটাই প্রায় এখন তার বশ। আর এই বেচারারা...

হ্যাঁ। ইয়েগর এদের দেখিয়ে দেবে, মানুষ হবার আসল অর্থ কী। দেখিয়ে দেবে, হার সে মানতে জানে না। দেখিয়ে দেবে, এদের সবার চাইতে সে সেরা।

এই শেষের কথাটা মনে আসতেই গত কয়েকদিন এদের হাতে নাকাল হবার ছবিগুলো চোখে ভেসে উঠতে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল ইয়েগরের। এমনকি খানিক আগে ওই ঘরটা থেকে ওভাবে পালিয়ে আসা... নাহ!

আস্তে আস্তে ফের ঘরটার দিকে ফিরে এল ইয়েগর। মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "আমার কুড়ুলটা ফেরত দে। ছুরিটাও দিবি। আর,

একটা দেশলাই। খানিক খাবারও নিয়ে আয় পুঁটুলি বেঁধে। যা।"

মেয়েটা কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ওর চোখের তারার রঙ হালকা। তাকে ঘিরে ঘন রঙের বর্ডার। ভারি সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে। দুধের মতো সাদা তার গায়ের রঙ। তাতে রোদপোড়ার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

"এত সুন্দর দেখতে তুই, অথচ মানুষ নোস। তুই... তোরা ঠিক কী রে? কোনো নাম আছে তোদের?"

"তোমার যে নামে ইচ্ছে হয় সেই নামেই ডাকো না আমাকে!" মেয়েটা হেসে জবাব দিল, "আমার কাছে সব সমান।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তোকে মাশা বলে ডাকি? আমাদের মানুষদের মধ্যে একটা গল্প আছে মাশাকে নিয়ে। সে হল গিয়ে পরিদের মেয়ে। জঙ্গলের মধ্যে ভালুকদের নিয়ে থাকে।"

আধা কল্পনার অপদেবতাদের দুনিয়া্তার পরি, পিশাচ, জুজু, বাস্তুপরি, বেলবগ, দানো, হাকিনী, ডাকিনীএদের ব্যাপারে কিছু কিছু পড়াশোনা ছিল ইয়েগরের। তবে সে মুহূর্তে হাজার চেষ্টা করেও তার কোনো কিছুই মনে করতে পারছিল না সে। শুধু একটা পুরনো প্রবাদ বারবার মাথায় ঘুরে আসছিল তার, 'অপদেবতারা মানুষের কাছে মানুষের রূপ ধরে আসে।'

এরাও সম্ভবত ঠিক সেটাই করছে। রাশিয়ান রূপকথার মাশা, ঠাকুরদা ভূত, দুষ্টু ভূতের খোকা এমন সব চেহারা ধরে হাজির হচ্ছে ইয়েগরের সামনে। সব সাজানো। সব নকল। চোখের ভুল।

"আচ্ছা, তোমার আরেক নাম কি ইচ্ছেধারী? যেমন খুশি রূপ নিতে পারা। অপদেবতা?" ইয়েগর আন্দাজে ঢিল ছুড়ল একটা।

"কেউ কেউ আমায় ও-নামটা ধরেও ডাকে বটে," মেয়েটা জবাব দিল, "কিন্তু নামে কিছু যায় আসে না।"

"হুম। দিওবা বলে কাউকে চেন নাকি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। দিওবাকে কে না চেনে? ও তো এইখানকার চিরকেলে বাসিন্দা। আমরা সবাই ওর পরে এখানে এসে জুটেছি।"

এইসব কথাবার্তা চলতে চলতেই ঘরের ভেতর থেকে এক ছোকরা বের হয়ে এল হঠাৎ। পরনে কালো স্যুট, পেটেন্ট লেদারের জুতো, ফুলছাপ শার্ট, বো টাই আর গোল সানগ্লাস।

"বেশ মানিয়েছে না? কী বলো ইয়েগর!" বলতে বলতে নিজের জ্যাকেটের তলার দিকটা ধরে টনছিল সে, "এই রূপটা দেখলে আর ভয়-টয় লাগছে না, তাই না?" বলতে বলতেই দুটো চোখ একসঙ্গে একবার টিপে দিয়ে সে কী হাসি তার!

"ধুৎ! কীসের এখন আর তখন! তোমায় দেখে ভয়ডর আমার কখনোই লাগেনি, সে তুমি ভালোই জানো। মানুষ না হলেও চেহারায় তো মানুষেরই মতো প্রায়। ভয়টা পাব কীসে?"

"অ্যাঁ! কী বললি? এত বড় সাহস?" লোকটা হঠাৎ চোখ গোল গোল করে বলে উঠল, "মানুষের সঙ্গে আমাদের তুলনা কোরো না। একদম নয়! পৃথিবীতে আমরা তোমাদের চাইতে কত পুরনো সে আন্দাজ কিছু আছে তোমার?"

"ও। তা তাহলে তোমাদের সংখ্যা এত কম কেন? অপদেবতার গোটা জাতটা ঝাড়ে মূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, নাকি?"

"সেকথা তো আমরা তোমাদের জিজ্ঞেস করব ইয়েগর। তোমরা হলে গিয়ে মানুষ। পাতালদেবীর ছেলেপুলে সব। বন কেটে বসত বানাও। বিষ দিয়ে নদী মারো। যা কিছু জ্যান্ত সবকিছুকেই ধুয়েমুছে দিতে চাও।

"ওতে তোমাদের কোন লাভ হচ্ছে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা তো পৃথিবীর সন্তান। আকাশ-বাতাস, নদী, পাহাড়, গাছ সবকিছুর সঙ্গে আমাদের প্রাণটাও বাঁধা যে। ওরা মরছে তাই আমরাও মরে মরে শেষ হয়ে যাচ্ছি। কিছু বুঝলে?"

"উঁহু, ইয়েগর বলে উঠল, "কি বুঝিনি। তাছাড়া যদি মরেও শেষ হও, তাতে কার কোন ক্ষতি? কোন কাজটায় লাগো তোমরা দুনিয়ার? প্রকৃতির আত্মা! হাহ!

দিব্যি আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, ইচ্ছেমতো পাখি, মাকড়শা, ফারগাছ যা খুশি হয়ে যাচ্ছ। খাসা। কোনো ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, দিব্যি গাছের মতো জীবন। হাজার বছর ধরে কোনো বদল নেই।

"এহেন অকর্মার একটা দল উড়ে-পুড়ে গেলে তাতে কার কোনো ক্ষতিটা হবে? না হে ইচ্ছেধারী, দুনিয়ায় কারও কোনো কাজে আসবে না তোমরা। মানুষ সে তুলনায় ঠিকঠাক রাস্তা ধরেছে। দুনিয়াটাকে পালটে ফেলে নিজের হাতে গড়ি আমরা। রাস্তাটা কঠিন, মাঝেমধ্যে তাতে খানিক ভুলও হয়, তবে সে তো হবেই! তাহলেই বলো! তোমরা হাজার বছর ধরে কেবল ফুর্তিই করে গেলে। আর আমরা কষ্ট করে, হাজারো পরিশ্রম করে পৃথিবীটাকে পালটে ফেলে নতুন করে গড়ছি, কে তবে পৃথিবীর আসল আত্মা? আমরা, না এই তোমরা, যারা কেবল ফুর্তি করবার জন্যই বেঁচে আছ? এইটে আগে ভালো করে বুঝে নাও, তারপর আমাকে বোঝাতে এসো, বুঝলে? অনেক হয়েছে। এবার আমি যাই।"

মানুষটা এতক্ষণ চুপচাপ তার কথাগুলো শুনছিল। কথা শেষ করে ইয়েগর থামতে সে মাথা নেড়ে শান্ত গলায় বলল, "আমাদের ছেড়ে পালানো তোমার হবে না ইয়েগর।" বলতে বলতেই লোকটার চারপাশে একটা কুয়াশার আবরণ গড়ে উঠছিল। তার মধ্যে দেখতে দেখতে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল তার শরীরটা।

ইয়েগর তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। লোকটা ফের কোন রূপ নেবে সেসব দেখবার আগ্রহ তার ছিল না আর। কিন্তু কুয়াশাটার মধ্যে থেকে খানিক বাদে একঝাঁক প্রজাপতি বের হয়ে এল। দল বেঁধে উড়তে উড়তে তারা গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে একসময় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

"তোদের পাখিতে খাক।" এই বলে নিচের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ইয়েগর মাশাকে বলল, "তা তুমিই বা আর বাকি রইলে কেন? শুরু করে দাও। গিরগিটি, আরশোলা, বাবা ইয়াগা, ভালুক, এল্ক যা হোক কিছু একটা রূপ ধরে ফেলল। চাইকি শিঙওয়ালা শয়তানও সাজতে পারো। মানুষের শরীর তোমাকে মানায় না।"

"তাহলে এইটা? এইটা মানায়?" বলতে বলতেই মাশা বাতাসে ভেসে উঠে

কয়েক সেকেন্ড থরথর করে কেঁপে একটা চোখ ঝলসানো রঙের পাখি হয়ে গেল। শুধু তার মাথাটা মানুষের মতো।

"হ্যাঁ। এইটা মানায়। এইটে তো অ্যালকোনস্ট-এর শিরিন পাখি। আমি বইতে পড়েছি। তা এসো হে। শিরিন পাখি যা করে সেই কাজটাই করো। গান ধরো একখানা। তবে যা-ই করো ভয় আমায় তোমরা দেখাতে পারবে না, এই বলে রাখলাম।"

"গান শুনতে চাও? তাহলে শোনো।" বলে বাতাসে ভেসে থাকা শিরিন মিঠে গলায় গান ধরল। সে গানের কোনো কথা নেই। কেবলই সুর। ইয়েগরের চোখের সামনে গোটা তাইগার প্রান্তর যেন সেই সুরের মূর্ঘনায় বদলে যাচ্ছিল। আর সে নিজে গলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছিল সুরটার সঙ্গে। তারপর সেই সুরের সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে পড়তে

পড়তেই তাইগার প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অজস্র গাছের প্রতিটি পাতা, তাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, ছোটোবড়ো প্রতিটি প্রাণীর অস্তিত্বে মিশে যাচ্ছিল তার অস্তিত্ব।

শিরিনের প্রত্যেকটা গান, প্রত্যেকটা অনুভূতি তার কাছে নতুন। অচেনা এবং অপ্রতিরোধ্য। তাকে বাধা দেবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না ইয়েগরের। সমস্ত চেতনা দিয়ে সেই সুর শুনতে শুনতে সে টের পাচ্ছিল, সে আর ইয়েগর নামের একটা আলাদা অস্তিত্ব নয়। তার চেতনা গলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ তাইগার সঙ্গে।

অন্ধকারের ভেতর কেউ একটা হাঁটছিল। মেঝের কাঠের পাটাতনগুলোতে কাঁচকোঁচ শব্দ উঠছিল। কেউ যেন ফিসফিস করে কিছু বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আশপাশ দিয়ে খালি পায়ে চলবার আওয়াজ। মাঝে মাঝে নরম নরম হাত এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ইয়েগরকে। ভারী হয়ে থাকা চোখে পাতাদুটো অনেক কষ্টে খুলল ইয়েগর। জায়গাটা তার চেনা। নিনার সঙ্গে ডিভোর্সের আগে এই অ্যাপার্টমেন্টটাতেই থাকত তারা।

এখন রাত। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো উঁকি মারছে। চারপাশে কোনো শব্দ নেই কোথাও।

"নিনা! এই শুনছ?" হঠাৎ ডাক দিয়ে উঠল ইয়েগর। বলতেই খাটের মাথার কাছে থেকে কেউ একজন ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর। চাঁদের আলোয় ইয়েগর দেখছিল, লোকটার গায়ের রঙ ফ্যাকাশে। কেমন যেন ঝাপসামতো চেহারা। গালে না-কাটা দাড়ি। চোখের পল্লবগুলো পপলারের আঁশের মতো জড়ানো। বার বার চোখ পিটপিট করতে করতে লোকটা ফোঁপাচ্ছিল আর দাঁত কড়মড় করছিল ইয়েগরের ওপর ঝুঁকে থেকে।

দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়েগর ঘাবড়ে গিয়ে ছিটকে গেল দেয়ালটার দিকে। তারপর সেখানে ঠেস দিয়ে বসে হাতদুটো মুঠো পাকিয়ে সে বলল, "কে রে?"

জবাবে ঝাপসা মতন লোকটা বেশ মিষ্টি একটা গলায় বলে, "আজ্ঞে ভয় পাবেন না। আমি একজন সামান্য বাস্তুপরি। এই বাড়িতেই আমার বাস। এই শহরে আমিই শেষ বাস্তুপরি। কোনোমতে এখনও টিকে আছি। আমি বড়ো একা। তাই একজন মানুষের সন্ধানে ছিলাম। বড়ো কষ্টে আপনার নাগাল পেয়েছি। এখন যদি দয়া করে একটু রুটি আর জল দেন... বড়ো খিদে পেয়েছে আমার।"

"বাস্তুপরি! হুম। তার মানে অপদেবতা। তোমায় আমি খেতে দেব! তোমার জাতের লোকজন আমায় কম জ্বালিয়েছে অ্যাদ্দিন ধরে? এখন এমনকি শহরেও তাড়া করে এসেছে, অ্যাঁ? যাক গে। নিনা কোথায়?"

"কেউ নেই... কেউ নেই..." বলতে বলতে ফের একটু কেঁদে নিল বাস্তপরিটা। তারপর হাতের তেলোয় নাকটা মুছে নিয়ে কান্নাভরা গলাতেই খুকখুকিয়ে একটু হেসে বলে, "বোধ হয় সবাই মরে গেছে। একা তুমি টিকে আছ। ও ইয়েগর, আমায় অন্তত একটুকরো রুটি দাও। নিদেন একটা পেস্ট্রি। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে আমার।"

তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইয়েগর। ঘরটার মধ্যে পায়চারি করতে করতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল সে। একদম

একইরকম রয়েছে। ঘরটা। চেয়ারের পেছনে তার জামাকাপড়গুলো তেমনই ঝোলানো আছে। শুধু তার ওপর ধুলো জমেছে একরাশ। রেফ্রিজারেটরটা খুলে দেখা গেল তার মধ্যে ছাতা ধরে আছে। স্বাভাবিক। ইলেকট্রিসিটি কানেকশন নেই বোধ হয় অনেকদিন। বেসিনের কলগুলোয় জং ধরেছে। গোটা ফ্ল্যাটটাই ধুলোয় ঢাকা একেবারে।

ঘরের ভেতরের দিক থেকে এইবার তার জানালার দিকে নজর গেল ইয়েগরের। সেদিকে চোখ পড়তে শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল তার। ঘন অন্ধকারে একটাও আলো জ্বলছে না কোথাও। পথে গাড়িঘোড়ার শব্দ নেই কোনো। বাইরে চাঁদের আলোয় সার সার বাড়ি ভূতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের কোনো জানালাতেই আলোর চিহ্ন নেই। কোনো ছায়ার নড়াচড়া নেই।

ঘাবড়ে গিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এল ইয়েগর। তারপর চিৎকার করতে করতে ছুট দিল রাস্তা ধরে। কিন্তু তার গলার শব্দ ফাঁকা বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল কেবল। কেউ তার উত্তর দিল না। রাস্তাটা একসময় গিয়ে একটা হাইওয়েতে মিশল। হাইওয়েটা বহুদূরের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেছে। ইয়েগর সেই হাইওয়ে ধরে ভূতের মতো হেঁটে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটছিল তাকে ঘিরে। একসময় সূর্য উঠল। দোয়েলরা শিস দিতে শুরু করল। পায়ের কাছে গঙ্গাফড়িংদের শব্দ উঠছিল। একসময় হাইওয়ে শেষ হয়ে একটা ছোটো নদী সামনে পড়ল। ইয়েগর হেঁটে হেঁটে নদীটা পার হয়ে গেল। একটা ছোটো মাছ জলের ভেতর তার পায়ে কামড়েও দিল একটুখানি। একটা তীব্র একাকিত্ব ঘিরে ফেলছিল ইয়েগরকে। এতটা একা কখনও অনুভব করেনি সে।

তারপর হঠাৎ মানুষের গলা কানে এল তার। শব্দটাকে লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে ইয়েগর একটা বিরাট ক্ষেতের কাছে এসে পৌঁছোল। সেখানে অনেক মানুষজন। ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথাবার্তা বলছে। ভিড়টার মধ্যে থেকে হঠাৎ নিনা বের হয়ে তার কাছে এগিয়ে এল। তারপর তার কাঁধে হাতদুটো জড়িয়ে চোখে চোখ রাখল সে। ইয়েগর সব ভুলে নিনার শরীরটাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল দু’ হাতে।

তার চোখে তখন জল এসেছে।

"বেঁচে আছ তুমি! মানুষজন সবাই বেঁচে আছে! আহ!"

নিনা হাসল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো দুলিয়ে দিল একবার। তারপর বলল, "আমরা মানুষজন নই। সবাই ইচ্ছাধারী। কেউ কেউ পরি। শুধু তুমিই একলা মানুষ রয়ে গেছ পৃথিবীতে।"

মুখে কথা ফুটছিল না ইয়েগরের। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে কান্নার ধাক্কায় শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার। নিনা তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তারপর একসময় সে তার কানে কানে বলল, "তুমি চাইলে আমি একটা

আপেলগাছ হয়ে যেতে পারি। কিংবা ধরো একটা পাখি! একটা মাছ!"

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে মানা করছিল ইয়েগর। গলায় স্বর ফুটছিল না তার। তাই দেখে নিনার মুখে একটু হাসি ফুটল বুঝি। মাথা ঝাঁকিয়ে, মুখে মিষ্টি হাসিটি মেখে। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর পা থেকে শেকড় বের করে, সারা শরীরে পাতার সাজ পরে দেখতে দেখতে একটা আপেলগাছ হয়ে গেল। তখন ইয়েগরও টের পাচ্ছিল, তার পা থেকে বের হয়ে আসা শেকড়রা মাটির গভীর থেকে গভীরতর অঞ্চলে ঢুকে যাচ্ছে। মাটির গভীরে ছড়িয়ে থাকা পাথরদের ফাঁকে ফাঁকে পথ খুঁজে নেমে যাচ্ছে জলের সন্ধানে।

তারপর তার হাতগুলো নিজে নিজেই আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠল। সেখান থেকে বের হয়ে এল কত না ডাল, পাতার বাহার। হঠাৎ সে টের পেল সে এক রূপবান। পপলার। হঠাৎ অকারণ আনন্দের একটা ঝলক ছুটে গেল তারা সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। আর ঠিক তখনই সে শুনতে পেল কে যেন বলছে, "কেঁদো না ইয়েগর। ঘুমের মধ্যে কাঁদছ কেন তুমি? গালদুটো ভিজে গেছে যে তোমার একেবারে!"

চোখ খুলে ইয়েগর দেখল মাশা তার মুখের ওপর উপুড় হয়ে আছে। ঠাণ্ডা আঙুলগুলো দিয়ে বড়ো আদরে তার গালদুটো মুছিয়ে দিচ্ছিল সে। নিজেকে এত

ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছিল ইয়েগরের যে মেয়েটার ওপরে খেঁকিয়ে ওঠবারও আর ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। চুপচাপ শুয়ে আকাশের দিকে চোখ রেখে সে কাঁদছিল। তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতেই মাশা ফের একবার রূপ বদলে নিল। আর সে সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। এখন এ পূর্ণ যুবতী। তার মাথায় লম্বা চুলের মোটা বিনুনি। নড়াচড়া করলেই তার বুকের ওপর একটা হার ঝমঝম শব্দ তুলছিল। একটা বিস্তীর্ণ ঘাসজমির বুকে শুয়ে ছিল ইয়েগর। তাকে ঘিরে লম্বা লম্বা ডেইজির ঝাড়। সেখানে মৌমাছির গুনগুন। আকাশে মেঘ ছিল না এক ফোঁটা। বাতাসের মধুর গন্ধ ছিল।

"চোখ খুলে দেখো দেখি ইয়েগর।" মাশা বলে উঠল হঠাৎ, "আমাদের সঙ্গে থাকাটা কি সত্যিই খুব খারাপ? নাও, ওঠো। চোখ মোছো শিগগির।"

"উঁহু। দাঁড়াও।" ঘরের সেই অন্য ইচ্ছাধারীর গলাটা বেজে উঠল তার পাশ থেকে, "শুধু একটা কথা বলো আমায় ইয়েগর। আমাদের জঙ্গলে তুমি এলে কেন? তোমাদের

ওই কুচ্ছিত শহর-বাজারে কি প্রাণ ভরছিল না তোমার? আমরা কখনো তোমাদের ওখানে জ্বালাতে যাই?

ইয়েগর তর্ক করতে চাইছিল না। তাছাড়া ঘুরে যে একবার দেখবে এবারে সে কোন রূপ ধরে হাজির হয়েছে সেই ইচ্ছেটুকুও তার হচ্ছিল না তখন। তবে কান্নাটা তার থেমে গেছে ততক্ষণে। সূর্যের আলোয় তার ভেজা গাল শুকিয়ে উঠতে এইবার সে কথা বলল, "তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ কী? আমরা কেউ কাউকে হাজার চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। যেভাবে খুশি সেভাবে থাকো তোমরা এই জঙ্গলে। শুধু দয়া করে আমায় আমার সভ্য দুনিয়ায় ফিরে যাবার রাস্তাটুকু দেখিয়ে দাও, তাহলেই হবে। এর বেশি তো কিছু চাইছি না আমি তোমাদের কাছে।"

"আরে, কে বলল আমরা তোমায় আটকে রেখেছি? যখন ইচ্ছে বিদেয় হও না এখান থেকে?" হঠাৎ ডেইজির ঝোঁপের ভেতর লুকিয়ে থাকা অন্য একটা গলা ভেসে এল, "কিন্তু তোমরা আমাদের যত উৎপাত করেছ, তার পরেও তোমার

জাতের একজনকে দয়া করব কিংবা তোমার ইচ্ছেপূরণ করব সেটা তুমি ভাবলে কী করে?"

"মানুষ তোমাদের যত উৎপাত করেছে সেই সবকিছুর জন্য একা আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?" বলতে বলতে ফের একবার রেগে উঠছিল ইয়েগর, "ঠিক আছে। যা ইচ্ছে করো তোমরা আমায় নিয়ে। আর আমি..."

"এই দ্যাখো! তোমায় নিয়ে আবার করবটা কী? কোন কাজটায় লাগবে তুমি আমাদের, অ্যাঁ? আর শোনো, যদি তোমাকেই দোষ দিতাম তাহলে অ্যাদ্দিনে তুড়ি মেরে তোমাকে সার বানিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতাম, বুঝলে?"

"আহা, তোমাদের কত দয়া!" টিটকিরির সুরে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ইয়েগর উঠে দাঁড়াল।

"আচ্ছা, একটা চুক্তিতে আসা যায় না?" মাশা বলে উঠল হঠাৎ।

"চুক্তি? কীসের চুক্তি? কী চাও তোমরা আমার কাছে? তাইগার সম্পূর্ণ অধিকার তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে?"

"তোমাদের এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে মজার, বুঝলে ইয়েগর!" কথাগুলো বলতে বলতে ডেইজির ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছেধারীটি এইবার সামনে বের হয়ে এল। চেহারায় সে ডেইজির একটা ডাঁটার চাইতেও বেঁটে। বেরিয়ে এসেই চটপট খড়কুটো দিয়ে ছোট্ট একটা আসন বুনে নিয়ে তার ওপর আসনপিড়ি হয়ে আরাম করে বসল সে। "সবসময় তোমরা গোটা প্রকৃতিটাকে তোমাদের জমিদারি বলে ধরে নাও। পৃথিবীর সবকিছুর মালিক কেবল তোমরাই, তাই না? সবকিছুকেই তোমাদের মতো হতে হবে? বন থেকে ভালুক ধরে নিয়ে যাও, তারপর সেটাকে মানুষের প্যান্ট-জামা পরিয়ে, টুপি পরিয়ে সাইকেল চাপতে বলো। তোমাদের গল্পগাথায় রাজ্যের জন্তুজানোয়ারকে দিয়ে

বোকা, পাজি, পাগল মানুষজনের মতো ব্যবহার করাও। কেন জানো? সমস্ত জানোয়ার যদি মানুষের নকল করে তাহলে তোমরা খুশি হও। মানুষের মতো, কিন্তু মানুষের চাইতে বোকা। এটা বেশ মজার, তাই না? মজার, কিন্তু ভেবে দেখো

তো, আর সব জীবজন্তুর জন্য সেটা কতটা অপমানের।

“শোনো হে ইচ্ছেধারী অপদেবতা।” ইয়েগর জবাব দিল, “অপমান নয়। এ হল বরং তার উলটো। কেন আমরা এসব করি সেটা কখনো আমাদের দিক থেকে ভেবে দেখেছ? মানুষ কতটা একা বলল তো! গোটা পৃথিবীর আর কেউ আমাদের ভাষা বোঝে না। নিজেদের মধ্যে ছাড়া আর কারও সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি না আমরা। এমন একলা একলা থাকতে কার ভালো লাগে বলো দেখি! তাই আমরা জন্তুদের মানুষের পোশাক পরাই। আমাদের গল্পগাথায় তাদের মানুষের ভাষা উপহার দিয়ে কল্পনায় তাদের সঙ্গে কথা বলি। আর তোমরা? কখনও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছ? একলা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ কখনো? হাত বাড়িয়ে দিয়েছ? ভয় দেখানো ছাড়া আর কী করেছ তোমরা আমাদের বলো তো! সাধে আমরা যুগে যুগে তোমাদের অপদেবতা বলে ডেকে এসেছি? চিরকাল তাই বলে ডাকবও। সে ছাড়াও দুনিয়ার কোন উপকারটা তোমরা করেছ অ্যাদ্দিনে?”

“আর তোমরা? তোমরা মানুষরাই বা কোন উপকারটা করেছ? উলটে তো...”

“হ্যাঁ। মানছি, পৃথিবীর অনেক ক্ষতি আমরা করেছি। কিন্তু ভালোও তো কম করিনি। আর তোমরা? দেখলাম তো এই ক’ দিন ধরে। ভালোমন্দ কোনটা করেছ তোমরা পৃথিবীর? কোনোটাই না। শুধু স্বার্থপরের মতন নিজেদের নিয়ে নিজেদের আনন্দেই আছ।”

কথাটা শুনে বেঁটে ইচ্ছেধারী তার আসন ছেড়ে ছোট্ট একটা লাফ মেরে মাটিতে নেমে এল। তারপর হাত মুঠো করে পায়চারি করতে করতে বলে, “ভুল। ভুল। তোমরা যাকে ভালোমন্দ, আলো-কালো বলে ভাগ করো, আমরা একই সঙ্গে তার সবকিছু। আমরাই বাঘ, আর আমরাই হরিণ, গোলাপও আমরা, তার মধ্যে মাকড়শাটাও আমরাই। সব মিলিয়ে, সমস্ত প্রাণ-অপ্রাণ মিলিয়ে আমরা একটাই অস্তিত্ব।

“আর তোমরা, কেবল একলা তোমরা। আমাদের এই মিলিত অস্তিত্বের বাইরে একলা একলা দাঁড়িয়ে আছ। তোমাদের দেখবার চোখ আলাদা। মাপবার মাপকাঠি

আলাদা। তোমাদের ওই ভালোমন্দের নকল মাপকাঠিতে যতই প্রকৃতিকে ভাগ করে দেখতে চাও, লাভ হবে না ইয়েগর। প্রকৃতি এক। অখণ্ড। তার মধ্যে শুভ বা অশুভ বলে আলাদা কোনো ভাগ চলে না। আর আমরা, সেই অখণ্ডতার সঙ্গে মিশে থাকা একটাই অস্তিত্ব।"

"আমাদের সঙ্গে থেকে যাও ইয়েগর।" এইবার মাশা বলে উঠল, "চাইলে ঠিক আমাদের মতোই হয়ে যেতে পারো তুমি। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, তার সঙ্গে এক হয়ে..."

"তোমাদের সঙ্গে থেকে যাব?" ইয়েগর ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, "কেন? একে অন্যের কোন কাজটায় আসব আমরা? না হে। অনেক ধন্যবাদ। সকাল থেকে রাত্তির অবধি একদিন শুয়োপোকা হয়ে পাতা চিবোনো, আবার একদিন পাখি হয়ে গাছে গাছে লাফঝাঁপ... গাছ, ভালুক, কাঠঠোকরা... আজ্ঞে না। এর একটাও হবার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই। দুঃখিত। ইচ্ছেধারী, শয়তান, পরি, নেকড়ে, খরগোশ, কিছু হবার লোভ নেই আমার। মানুষ হয়েই দিব্যি ভালো আছি আমি। পৃথিবীর সেরা জীব মানুষ হয়েই থাকতে চাই।"

"অন্তত একবার পরখ করে তো দেখো ইয়েগর!" মাশা মিনতি করে বলল, "যদি ভালো লেগে যায়!"

"নাহ। আমার মোটেই ভালো লাগবে না। তোমাদের কাছ থেকে এহেন কোনো উপকারের কোনো দরকার নেই আমার।" বলতে বলতে সে হাতের কুড়ুলটাকে একবার ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল। বাতাসে ভেসে উঠল ধারালো কুড়ুল। তার ইস্পাতের ফলায় ঝলক দিয়ে উঠল রোদ। তারপর ফের সেটাকে গর্বিত হাতে লুফে নিল ইয়েগর।

মাশা চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল তার দিকে। একটু বাদে মাথা নেড়ে সে বলল, "আজ রাতে ইয়েগর, আজ রাতে তুমি সবকিছু দেখবে। আজ রাতে তুমি আমাদের সবটা বুঝতে পারবে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে, বুঝলে?" বামন ইচ্ছেধারী মাথা নাড়ল। "আজ রাতে

সবকিছু দেখবার পর হয়তো তোমার মতামত খানিক বদলাবে। দেরি কোরো না। তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত হে। আমাদের বনভোজন এর আগে কোনো মানুষের দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। তাদের চোখে সেসব ধাই দেবে না! তবে হ্যাঁ, তুমি দেখতে পাবে। কেন জানো? কারণ যতই তুমি নিজেকে মানুষ ভাবো, এই মুহূর্তে তুমি অর্ধেকেরও কম মানুষ। আজ রাতে এই নিয়ে একটু খাটাখাটুনি করে আমরা তোমার বাকিটুকুকেও আমাদের দিকে টেনে নিয়ে আসব খন।"

"যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমরা আমার কিচ্ছু বদলাতে পারবে না।" ইয়েগর জবাব দিল, "যতদিন বাঁচব, মানুষ হয়েই বাঁচব আমি। তোমরা দেখে নিও।"

"আজ রাতে!" জবাবে ফের একবার কথাটা বলতে বলতেই গুটিয়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছিল মাশা, "আজ রাতে..." ফিসফিস করে বলতে বলতেই বাদামি লোমভরা একটা চামড়ায় ঢেকে যাচ্ছিল তার শরীর।

"আজ রাতে..." শেষবারের মতো বাতাসে কথাটা ভাসিয়ে দিয়ে একটা বুনো ছাগল হয়ে গেল মাশা। তারপর ইয়েগরের সামনে দাঁড়িয়ে, ভেজা চোখের ঠাণ্ডা চাউনি তার সারা শরীরে একবার বুলিয়ে দিয়ে সে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

ওদিকে বামন ইচ্ছেধারী ততক্ষণে দু-জোড়া স্বচ্ছ ডানা বাড়িয়ে দিয়েছে শরীরের দু ধারে। ভনভন করে ডাক ছাড়ছিল তার ডানারা। তারপর পাক খেতে খেতে বাতাসে ভেসে যেতে যেতেই সে বলে গেল, "উঁহু... কখন যে রাত আসবে..."

তারপর তারা দু'জন আকাশ আর মাটি বেয়ে চলতে চলতে কাছাকাছি দাঁড়ানো একটা ঝোঁপের সঙ্গে মিশে গেল। আর তাদের কোনো নির্দিষ্ট চেহারা রইল না। তাইগা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অজস্র শরীর, অজস্র অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থেকে তারা তখন অজস্র রূপ নিয়েছে। তারাই অরণ্য, তারাই নদী, তারাই সমস্ত পাখি, সমস্ত জীব, তারাই সম্পূর্ণ প্রকৃতি। তাদের শরীরকে আলাদা করে একটামাত্র চেহারায় বন্দি করা যায় না। চেতনায় তাদের ছবিকে একটামাত্র চেতনার ছবি হিসেবে আলাদা করে ধরা যায় না।

মানুষের সময় যে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের বাঁধা গতের ধারায় কাটে, সেই লাইন -বন্দি কাল-স্রোতের সব অর্থ হারিয়ে গেছে ইয়েগরের চেতনা থেকে। ঘণ্টা-মিনিটের হিসেবের বাইরে, অতীত-ভবিষ্যতের বিভাজনহীন এক সন্তত সময়স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্রমাগত মৃত্যু ও উত্থানের মধ্যে এই অরণ্যের ক্রমাগত আনাগোনার অনন্ত চক্রের সমষ্টি সেই নিরবচ্ছিন্ন, বহুমাত্রিক সময়স্রোত।

ইয়েগরের নিজের চেতনার অন্দরেও তখন কিছু একটা জিনিস অনবরত মরে চলেছিল। আর তার জায়গায় সপ্রাণ হয়ে মাথা জাগাচ্ছিল অন্য একটা চেতনা। সেই অনাগত চেতনা ধীরে ধীরে তার গভীরে বেড়ে উঠে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার অসন্তত খণ্ডিত অস্তিত্বকে। তাকে নিবিড়ভাবে, পাকাপাকি মিশিয়ে দিচ্ছিল, মাটি, ঘাস, নদী ও আকাশের অস্তিত্বের সঙ্গে। এতদিন তার কাছে অপরিচিত থেকে যাওয়ায় বিশ্বের সম্পূর্ণ চেতনাকে এইবার নিজের চেতনা বলে চিনে নিচ্ছিল ইয়েগর। তবে এতকাল যে খণ্ডিত চেতনা নিজেকে ইয়েগর বলে পরিচয় দিত সে আর এই ইয়েগর পুরোপুরি এক নয়। একজন শহরবাসী হিসেবে, বেলবগ, ইচ্ছাধারী, পরি, জলপরি এমন অজস্র অপদেবতা আর উপদেবতাদের কথা সে শুনেছে। কিন্তু কখনো তাদের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেনি। তার কাছে এরা ছিল কেবলই দূর অতীতের মানুষজনের কল্পনার ফসল। রূপকথার চরিত্র বলেই তাদের মেনে চলেছে সে চিরকাল।

অথচ এইবার বাস্তব দুনিয়ায় তাদের দেখা পেয়েছে সে। জানতে পেরেছে, স্লাভদের দুনিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের বসবাস। একসময় মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি বসত করত তারা। কিন্তু তারপর মানুষ যখন পৃথিবীর রাজা হয়ে উঠল, সেদিন থেকেই আস্তে আস্তে মানুষের দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গেল তারা। গলে মিশে হারিয়ে গেল

রাশিয়ার অরণ্যে, মাটিতে, নদীর স্রোতে। এইবার সে স্লাভদের আসল প্রকৃতির স্পর্শ পেয়েছে এই নির্জন তাইগার বুকে। তার নিজের জাতটা, প্রকৃতির থেকে

ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অনেক আগে, যে ভূমিতে একদিন জন্ম নিয়েছিল, আজ সেই ভূমি ও প্রকৃতির গভীরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। এই কি তবে তার শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা? নিজের অচেনা মাতৃভূমির বুকে ফিরে আসা? যে মাতৃভূমিতে জলপরিরা মাছদের দেখভাল করে। বৃক্ষদেবতারা গাছের মধ্যে বসবাস করে আজও। যে দেশে অরণ্যের আত্মা নিজেকে কিশোরীর রূপে বদলে দেয়। সে কিশোরী ক্লান্ত পথহারা মানুষের মুখে খাবার জুগিয়ে যায় গভীর অরণ্যে। যে কিশোরীর শরীর ঝরনার বহতা জলের সুগন্ধ ছড়ায়।

এই সর্বব্যাপী চেতনার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে... কেমন লাগবে? একলা বিচ্ছিন্ন মানুষ হয়ে বাঁচাকে শেষ করে দিয়ে... কিংবা ঠিক তার উলটো, প্রকৃতির সঙ্গে যে যোগসূত্রগুলো মানুষ ভেঙে ফেলেছে স্বেচ্ছায়, সেই যোগসূত্রগুলোকে ফের ফিরিয়ে এনে, মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে বেঁচে ছিল, যখন মানুষের দেহ শত-লক্ষ পশুপাখির চেতনার মিলিত আবাস ছিল, যখন মানুষের আত্মা সমস্ত জীবিত অস্তিত্বের সঙ্গে একইভাবে সংলগ্ন ছিল, সেই সময়কার মতো ফের একবার একটা বিরাট চেতনার অংশ হয়ে বেঁচে থাকতে... কেমন লাগবে?

ইয়েগর জানে না, তেমনটা হলে 'তার' কী হবে। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

তেমনটা হলেও, তার ভেতরে 'সে' বেঁচে থাকবেই।

এমনটাই ভাবতে ভাবতে সে বনের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে গোটা অরণ্য। একটা পাখিও ডাকছে না। কোনো গাছের একটা পাতাও নড়ছে না বাতাসে। শুধু তার পায়ের নীচে শুকনো ডালপালার ভেঙে যাবার শব্দ, আর ঘাসবনের সড়সড়।

এখানে রাস্তা নেই কোনো। যেদিকে দু-চোখ যায় চলতে থাকলেই হল, কারণ ইয়েগর জানত, দিনের শেষে যে-কোনো পথই তাকে ঠিক সেই সান্ধ্য আসরে পৌঁছে দেবে।

সন্ধের মুখ মুখ ইয়েগর এসে পৌঁছোল একটা বড়সড় খাদের সামনে। খাদটার ভেতরে কোমর সমান উঁচু ফার্নের জঙ্গল। খাদ পেরিয়ে ওপাড়ে গিয়ে ওঠবার মতলবে ছিল ইয়েগর। কিন্তু তার ভেতরে গিয়ে নেমে বেশ একটু মুশকিলে পড়ে গেল সে। একে তো কোমর সমান শিশিরভেজা জঙ্গল ভেঙে চলা। তায় আবার একটু বাদেই সূর্য ডুবে গিয়ে সন্ধে নেমে এল একেবারে ঝপ করে।

ফার্নের জঙ্গল তবুও ফুরোয় না। খাদটা যেন ক্রমেই আকারে বেড়ে উঠছে।

ফার্নগুলোও লম্বা হতে হতে তার মাথা ছাড়িয়ে উঠছে। জায়গায় জায়গায় তারা এতই ঘন যে কুড়ুল চালিয়ে তাদের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে এগোতে হচ্ছিল ইয়েগরকে। খানিক বাদে এমন অবস্থা হল যে, অন্ধকারে ফার্নের জঙ্গল ভেঙে কোনদিকে কতদূর

যাচ্ছে সেসব একেবারে গুলিয়ে গেল ইয়েগরের। শেষমেশ না পারতে ওই জঙ্গলের মধ্যেই খানিক জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে সেইখানটায় জুড়ে বসল সে।

ততক্ষণে আকাশে সরু একফালি চাঁদ উঠেছে। তার আবছা আলোয় ফার্নের পাতার ছায়ায় লুকিয়ে বসেছিল ইয়েগর। মাটি থেকে উঠে আসা গরম ভাপ তাকে ঘিরে আচ্ছন্নতার জাল বুনে তুলছিল ক্রমশ। একটা আশ্চর্য তন্দ্রা... স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যেকার দেয়াল ঘুচে যায় যে তন্দ্রায়...।

.এমনি করে কতক্ষণ যে কেটে গেছে তা ইয়েগরের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দূরে একটা শিঙার শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল সে। চাঁদ ততক্ষণে আরও খানিক উঁচুতে উঠে এসেছে। খানিক দূরে কারা যেন আগুন জ্বেলেছে। ফার্নের পাতাগুলো, তাদের রসালো কাণ্ড সেই আগুনের হলকায় তিরতির করে কাঁপছিল।

শিঙেটা এইবার ফের একবার বেজে উঠল। আর তার পেছন পেছন ভেসে এল আরও বড়ো একটা শিঙের শব্দ আর সেই সঙ্গে ঢোলের আওয়াজ। শব্দটা শুরু হতেই ফার্নের পাতাগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে নড়াচড়া শুরু করল ইয়েগরের চারদিকে। তাদের তলার দিকগুলো থেকে ছোটো ছোটো কুঁড়ি গজিয়ে উঠে টুপটাপ করে খসে পড়ছিল মাটির ওপর। মাটিতে পড়েই কুঁড়িগুলো আশ্চর্য নীল রঙের ফুল

হয়ে ফুটে উঠছিল। এমন ফুল ইয়েগর কখনো দেখেনি।

ডানার শব্দ, পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ মিলে ততক্ষণে অন্ধকার সেই জায়গাটা গমগম করে উঠেছে। ইয়েগর ফের শুয়ে পড়ল। উঁকি মেরে দেখবার কোনো কৌতূহল হচ্ছিল না তার। তার চাইতে যতক্ষণ এদের নজর এড়িয়ে থাকা যায়।

তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সেই নীল ফুলগুলো থেকে ভারি মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছিল। নাকে সেই গন্ধ যেতে মাথা ঝিমঝিম করছিল ইয়েগরের।

হঠাৎ ফার্নের জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা কোঁকড়া-চুলো বেড়ালের মুখ বেরিয়ে এল। ইয়েগরের দিকে সবুজ চোখের একটা ঝলক দিয়ে সেটা ফের সেটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। আড়াল থেকে বেড়াল মার্কা গলায় কেউ বলে উঠল, “ইয়েগরকে পাওয়া গেছে।”

“অ্যাঁ? শুয়ে শুয়ে মধু খাচ্ছে নাকি?” জবাবে খরখরে একটা গলা বলে উঠল।

“উঁহু!” বেড়াল গলা জবাব দিল। আর তারপর ফুলো ফুলো নোমওয়ালা একটা কালো বেড়াল ফার্নের জঙ্গল থেকে এক লাফে বের হয়ে এসে ইয়েগরের পেটের ওপর উঠে বসল। বেড়ালটার দাঁতগুলো বেশ বড়ো বড়ো। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তাদের ছুঁচলো মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল।

“তুমি কে? “কুর্দিশ।” এই বলে বেড়ালটা তার লম্বা জিভ বের করে ইয়েগরের গালটা

চেটে দিল। তার মুখে ফুলের মধুর গন্ধ ছিল।

“আরে মধু খাচ্ছ না কেন? কী-ই-ই-ই যে ভালো খেতে!” বুড়িদের মতো খরখরে গলায় কথাগুলো বলতে বলতেই এবার ফার্নের ঝোঁপ থেকে অন্ধকার একটা ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে দেখতে একটা বিরাট মাকড়শার মতো ঠেকে।

“ও আবার কে?”

“ও হল ডাকিনী কিকিমোরা। বেশ ভয় ভয় লাগে না দেখলে?” বলতে বলতেই

কুর্দিশ তার ধারালো দাঁত দিয়ে একটা নীল ফুল কুচ করে ছিঁড়ে মুখে পুরে নিয়ে মহানন্দে দু-বার মিউ মিউ করে ডেকে নিল।

কনুইতে ভর দিয়ে এইবার মাথাটা একটু তুলল ইয়েগর। "আহা, দারুণ! কই হে কিকিমোরা। সামনে এসো। ভালো করে দেখি একবার তোমায়!" বলতে বলতে ছায়াটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কপালের ওপর একটা বোম্বাই চড় পড়ল তার। "কিকিমোরার সঙ্গে বেশি ঠিসি-ঠাট্টা কোরো না, বুঝলে?" কুর্দিশ ফুলটা চুষতে চুষতে বলে উঠল, "কেউ বেশি চালাকি দেখাতে গেলেই ওর হাতে থাবড়া খায়। তার চাইতে একটা জিনিস বলি। সুড়সুড়ি খাবে? কিকিমোরা চমৎকার সুড়সুড়ি দেয় কিন্তু।"

সামনে এসে দাঁড়ানো ছায়াটার দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে মাথা নাড়ল ইয়েগর। "নাহ, থাক। উপস্থিত সুড়সুড়ি না খেলেও চলবে।"

"তোমার যেমন ইচ্ছে। তাহলে চলো এবার আমার সঙ্গে। সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হোক।" বলতে বলতেই কুর্দিশ আরেকটা ফুল মুখে ফেলে তার মধুটা চুষে নিয়ে ছিবড়েটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

ইয়ের খানিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। আগুনটার দিকে যাবার কোনো ইচ্ছে তার হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় কী? একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল ইয়েগর। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা দিল আগুনটাকে লক্ষ্য করে। সেখান থেকে হাসির শব্দ, চ্যাঁচামেচি, শিঙার আওয়াজ, ঢোলের বাদ্য তখন ক্রমশই বেড়ে উঠছিল। তার পায়ে পায়ে ছুটতে ছুটতে কুর্দিশ তখন বলে যাচ্ছে, "শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার দিন ফার্নের ফুল ধরে। তখন আমরা সবাই এইখানটা এসে হাজির হই। কিছু আছে এখানকার লোকজন, আর কিকিমোরাদের মতো বাইরে থেকে আসা কয়েকজন... মানে এখন অবধি যারা টিকে।

আছে আর কী। এইবার তাদের সবার সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে তোমার।"

"যত ফালতু কথা।" ইয়েগর মাথা নাড়ল, "ফার্নে আবার ফুল ফোটে নাকি?

এরা তো স্পের ছড়িয়ে...”

“হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ঠিক।” কুর্দিশ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। “একদম ফালতু।” বলতে বলতেই আরও একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চুষতে চুষতে সে বলে, “কিন্তু বেজায় সোয়দের

ফালতু! সে যাই হোক, এখানে এলাকার যত ইচ্ছেধারী, বনপরি, জলপরি, দৈত্য, ডাকিনী, বৃক্ষদেবতা সব্বার সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে দেখো। সে ছাড়া স্ট্রাইবগ, বেলবগ, শেরনোবগ, পখভিস্ট, লাডো, রাজ্যের ইম্প, সব এসে ঠাঁই নিয়েছে তাইগায়। এমনকি পেরুন অবধি আছে।”

“আর মাভকা?”

“আছে তো! পলুদনিৎসা, পুকুরের পাঁক-পিশাচ, খামারের ভূত, এমন আরও অনেকেই আছে। আসলে মধুর নেশা বড়ো জব্বর নেশা হে। যে, যে কাজেই থাক না কেন, আজকের রাতে এই ফার্ন বনে হাজিরা দিতে কেউ ভোলে না। এমনকি মেন্তন্যামি, দ্যালি-ন্যামি, কেন্তন্যামি সব এসে হাজির হয়।”

“এককথায় দুনিয়ার সব অপদেবতার মেলা, তাই তো?” কুড়ুলের কোপে ফার্ন কেটে রাস্তা বানাতে বানাতে ইয়েগর বলল, “আজ তার মানে তাইগার বুকে ডাকিনী মহা সম্মেলন। মরুক গে যাক। আমি তোমাদের ভয় খাই নাকি?”

“আহা, ভয় খাবার কথা উঠছে কেন?” কুড়ুলের ঘায়ে ছিটকে পড়া ফার্নের পাতাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে মুখে লুফতে লুফতেই কুর্দিশ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, “তুমি তো এখন আমাদের একজন হয়েই গেছ।”

“হুম। আসলে ফুল ফোঁটা ফার্নের গল্প আমাদের দুনিয়ায় বেশ চালু। লোকজন তাইগার বুকে বহুকাল ধরে ও-জিনিস খুঁজছে, কিন্তু কখনো ওর নাগাল পায়নি। তা আজ তোমরা যখন আমায় এখানে নিয়েই এসেছ, সেই থেকেই মালুম, তোমরা ধরে নিয়েছ আমি আর মানুষ নেই।” বলতে বলতেই মুচকি হাসল ইয়েগর। “কিন্তু ব্যাপার হল, আসলে আমি এখনও মানুষই আছি।”

“মানুষ! হি হি! বটে!” বলতে বলতে কুর্দিশ হঠাৎ হাউমাউ করে ডাক ছেড়ে

এক লাফে ইয়েগরের কাঁধে উঠে বসে তার ঘাড়ের কাছে নখ বিঁধিয়ে দিয়েছে। "কোথায় হে! মানুষের নামগন্ধও তো আর দেখছি না তোমার গায়ে।"

"অ। তা সে তুমি যা খুশি ভাবতে থাকো না! কে মানা করেছে? শুধু ঘাড়ে নখ-টখ কি বেঁধালেই নয়? ফার্নের মধু খাচ্ছিলে দিব্যি, তাই করো না!"

কুর্দিশ সঙ্গে সঙ্গে তার কানের কাছে মুখটা এনে গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "একটা ইয়েগর, শুধু একটা ফুল একটু চুষে দেখো! কী যে ভা-আ-আ-আ-লো..."।

কথাগুলো বলতে বলতেই হঠাৎ ইয়েগরের সামনে থেকে ফার্নের জঙ্গল সরে গিয়ে সেখানে একটা মাঠ দেখা দিয়েছিল। সেখানে তখন একটা গনগনে আগুন জ্বলেছে। তা থেকে বাতাস বেয়ে নীল নীল ধোঁয়া আর ফুলকির ঝার উঠে যাচ্ছে শোঁ শোঁ শব্দ করে। আর তার চারপাশে শয়ে শয়ে নানান চেহারার ফুর্তিবাজ জীব এসে জড়ো হয়েছে। তাদের গলায় ফার্নের ফুল ফোঁটা পাতার রঙিন মালা। সবাই মিলে তারা মাঠ কাঁপিয়ে

হল্লা জুড়েছে সেখানে। নাচ, গান, শিঙে আর বাঁশির বাদ্য, ঘনঘন মিহি, মোটা গলার চিৎকার, লাফালাফি, মাঠ জুড়ে ছুটোছুটি, কখনও বা আগুনের ওপরে লাফ দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া...

আলোয় ভরা এলাকাটার ঠিক বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ইয়েগর। "আর এগোচ্ছি আমি। এখান থেকে সব দিব্যি দেখা যাচ্ছে। তুমি যাও। আমি এখানেই রইলাম।"

"ইয়েগ-অ-অ-র!" হঠাৎ একটা চেনা গলা ডাক দিয়ে উঠল তার নাম ধরে। গলাটা ইয়েগরের চেনা। মাভকা!

মাভকা ততক্ষণে ভিড় ছেড়ে তার দিকে দিব্যি ভেসে আসছে। তার ছিপছিপে শরীরে পোশাক নেই কোনো। রুপোলী একটা জলের ধারার মতোই তার চলন। চলতে চলতে জলের মতোই ইচ্ছেমতো আকার বদলায় সে। জলের মতোই হিংস্র। জলের মতোই প্রাণদায়ী।

"কেমন আছ তুমি?" বলতে বলতেই হাতের কুড়ুলটা মাভকার দিকে উঁচিয়ে

ধরল ইয়েগর, “আরেকবার আদর করবার মতলবে আছ নাকি হে জলপরি?”

মাভকা কুড়ুলটার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে তার একেবারে কাছে এগিয়ে এল। ভেজা, ভ্যাপসা আর ঠাণ্ডা একটা হাওয়া যেন পোশাকের মতো ঘিরে ছিল তার শরীরকে। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক চোখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঠাণ্ডা নীলচে একটা হাসি ছড়িয়ে সে বলল, “আমার জন্য মনখারাপ করছিলে নাকি নাগর?”

“মনখারাপ মানে? মরতেই বসেছিলাম যে!” কথাগুলো বলে ইয়েগর কুর্দিশের দিকে ফিরে বলে, “এই মাভকাটাকে যদি আমার কাছ থেকে ভাগাতে পারো তাহলে যা চাইবে তাই দেব তোমায়।”

বেড়ালটা ভারি চিন্তাশীল একটা ভাব করে বলে, “মাভকাকে কেউ ভাগাতে পারে না। হে! আরে, জল ছাড়া কেউ বাঁচে নাকি? তবে ঘাবড়াবার কারণ নেই। আজ রাতে মাভকা তোমায় ছোঁবে না।”

“ধুত্তোরি তোর জল! চুলোয় যা আপদ কোথাকার!” বলতে বলতে ইয়েগর মাঠটার একেবারে উলটোদিকে গিয়ে দাঁড়াল।

মাভকা কিন্তু এবার আর তার পেছন পেছন এল না। তার বদলে হঠাৎ একটা গলিত আয়নার মতো সে বয়ে গেল ফার্নের জঙ্গলটার দিকে।

ততক্ষণে ইয়েগরের নজরে পড়েছে, আগুনের পাশ থেকে নাচতে নাচতে অন্য একটা দল তার দিকে এগিয়ে আসছে। খানিক বাদেই দলটা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তার হাত ধরে আগুনটার একদম পাশে ডেকে নিয়ে এল। তাদের একেকজনের মুখ একেকরকম। ছোটো, বড়ো, বিচ্ছিরি, সুন্দর, লম্বা, বেঁটে, ফোলা, চ্যাপটা, শুড়ওয়ালা, শিঙওয়ালা, গন্নাকাটা, মোটকা ঠোঁট সবরকমই আছে। ইয়েগরকে ঘিরে ধরে তারা তাকে ভয় দেখাবার মতলবে মুখচোখ ঘুরিয়ে নানান ভঙ্গি করে, আর সেই করতে গিয়ে হেসে হেসে খুন হয় সব।

কিন্তু ইয়েগর পালাল না। এদের কেউ খুব কাছাকাছি চলে এলে কেবল সে তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াটা এড়িয়ে যাচ্ছিল। কুর্দিশ অবশ্য তার সঙ্গ ছাড়েনি। তার

পিঠে লটকে থেকেই কানের কছে ফিসফিসিয়ে যাচ্ছিল সে, "এগুলো সব নানান জাতের পরি। এদের মধ্যে ইচ্ছেধারী আছে একটা। চিনতে পারছ?"

যেই না কুর্দিশের একথা বলা, অমনি ভিড়টার থেকে চেনা টুপি আর গগলস পরা একটা মুখ বের হয়ে এল।

"আছ কেমন হে দোস্ত?" হাঁক দিয়ে উঠল মুখটা, "আহা, কী সুন্দর রাত গো! নাচো হে ইয়েগর। একটু নাচো। মনটা খানিক হালকা হয়ে ভেসে উঠুক। সেই থেকে শুধুমুদু দুর্ভাবনা করে করে মনটাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ। এবারে একটু আদরও দাও! নাকি? চলো চলো। মধু খাও একটু। আহা মধু। বড়ো ভালো..."

"তোমাদের মধুর নিকুচি করেছে!" ইচ্ছেধারীর দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠল ইয়েগর, "আমায় একদম ওসব খাবার জন্য জোর করবে না বলে দিচ্ছি।"

"হা হা হা... জোর করবই।" বলে পরির দলে হেসে উঠল। তারপর বলে, "চল তোকে পেরুনের কাছে নিয়ে যাব। সিধে করে ছেড়ে দেবে তোকে। এহ্! বলে নাকি মধু খাবে না! চল!"

বলতে বলতে ইয়েগরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ঠেলে উঁতিয়ে আগুনটার একেবারে সামনে ধরে নিয়ে চলল।

কুর্দিশ কিন্তু তখনও ইয়েগরকে ছাড়েনি। লোমে ঢাকা সামনের থাবা দুটো দিয়ে প্রাণপণে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে ঝুলছিল সে। তবে ইয়েগর বা তার শত্রু কাদের সাহায্য করছে সে সেইটে বোঝা যাচ্ছিল না ভালো করে। ঝুলতে ঝুলতেই ইয়েগরের কানে কানে সে বলছিল, "বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না ইয়েগর। বুঝতেই পারছ তাতে লাভ নেই। কাজেই রোমে গেলে... ওই যা বলে-টলে আর কী! সবই তো জানো!"

পরির দল আগুনের পাশে দাঁড় করানো একটা মূর্তির সামনে ইয়েগরকে টানতে টানতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। মূর্তিটা বিরাট বড়ো। তার মাথাটা রূপোর তৈরি। তার লম্বা দাড়িতে সোনালি আভা। দুটো লোহার পায়ের ওপর তার কাঠের শরীরটা শক্তপোক্তভাবে আটকানো। লোহার পা-দুটোয় জং ধরা।

তার ডানহাতে একটা লম্বা, গিটওয়ালা লাঠি।

ইয়েগরকে তার সামনে ধরে রেখে পরিদের গোটা দলটা মিহিতে মোটায়, সুরে, বেসুরে মহা হট্টগোল শুরু করে দিল। বলে, "পেরুন! হে পেরুন! ইয়েগরকে সুবুদ্ধি দাও

বাবা। ওর মাথাভর্তি ভুষিতে একটু বুদ্ধির আগুন জ্বালিয়ে দাও মহারাজ। এ আমাদের মধু খেতে চায় না! কী মহাপাপের কথা, ভাবো দেখি একবার!"

শুনেই মূর্তিটা হঠাৎ গা মোচড় দিয়ে উঠল। তার কাঠের শরীরটা ভেতর থেকে চাপ খেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে যেন। তার সোনালি দাড়ি ঝুমঝুম শব্দ করে দুলছিল। খানিক বাদে সেসব আওয়াজ-টাওয়াজ থামিয়ে পেরুনের মুখটা তার রুপোলী ভুরু উঁচিয়ে গভীর নীল দুটো চোখ মেলে ইয়েগরের দিকে তাকাল। তারপর হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে গম্ভীর গলায় বলে, "মধু খা বলছি ইয়েগর!"

"কভি নেহি।" ইয়েগর বুক ঠুকে জবাব দিল, "ও-জিনিস আমি খাবোই না। আমি তোমাদের মতো ভূত-পেত্নী নাকি? আমি ইয়েগর। মানুষ। আমি মানুষ হয়েই থাকতে চাই।"

"মানুষ তুই আগে ছিলি। এইবার পরি হবি। তাতে ভালোমন্দ হলটা কী? বাঁচতে চাইলে, খা বলছি!"

"আগে মরি, তারপর খাইও।" তিতকুটে গলায় টিটকিরি দিয়ে উঠল ইয়েগর, "কিন্তু জ্যান্ত থাকতে তুমি আমায় ওসব খাওয়াতে পারবে না এই বলে দিলাম।"

শুনে পেরুনের লোহার ঠ্যাং-দুটো মাটির ওপর দুপুদুপিয়ে উঠল। তার হাতের লাঠিটা ইয়েগরের চোখের সামনে প্রথমে হলদে, তারপর একেবারে চোখ ঝলসানো সাদা রঙ ধরল। এইবার লাঠিটাকে পেরুন মাটিতে ঠুকতেই চোখ ঝলসানো সাদা আগুনের ফুলঝুরি ছড়িয়ে গেল তার থেকে। পরির দল সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করতে করতে ইয়েগরকে সেইখানে ছেড়ে হাওয়া। আগুনের পাশে তখন ইয়েগর আর পেরুন মুখোমুখি। অবশ্য কুর্দিশ ইয়েগরের সঙ্গেই ছিল। তবে তা না থাকবার মতোই। ইয়েগরের কাঁধে বসে সে তখন অত হট্টগোলের ভেতরেও দিব্যি একটা

ঘুম দিয়েছে।

হঠাৎ পেরুন কাঁচকোঁচ, মড়মড় শব্দটব্দ করে কোনোমতে নিচের দিকে ঝুঁকে ইয়েগরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বেশ নরম গলায় বলে, "ব্যাপারখান কী হে দাদুভাই? এমন আচরণ তো উচিত কাজ নয়। তোমরা স্লাভরা তো চিরটা কাল আমায় বেশ শ্রদ্ধাভক্তিই করতে। কিন্তু ইদানীং দেখছি আমায় নিয়ে ঠিসি-ঠাট্টা, রঙ্গরসই চলছে বেশি। কেন হে? একই মাটি থেকে আমাদের জন্ম, সে কি তোমরা ভুলে গেলে নাকি?"

ততক্ষণে ঠাণ্ডা পড়ে গেছে বেশ। অবশ হয়ে আসা হাতদুটো ঘষতে ঘষতে ইয়েগর জবাব দিল, "আজ্ঞে না। তেমন কিছু তো মনে করতে পারছি না! না হে পেরুন। তোমায় আমি জানিই না। তবে হ্যাঁ, আমি তোমার নাতি-টাতি কিছু নই, সেটা অবশ্য জানি।"

"অ। পণ্ডিত হয়েছ! বাপঠাকুদার ভগবান ছেড়ে ওই দাড়িওয়ালা কোঁকড়া-চুলো ভগবানটার পুজো করতে শিখেছ? আরে শোন, পুরনো কালে তোর বাপঠাকুরদা নিজেদের পেরুন আর ডাঝবগ-এর নাতি মনে করত। আর এখন? নিজেদের শেকড়

খুঁজতে তুই ইদানীং পুব-পশ্চিম-ঈশেন-নৈঋত তোলপাড় চালাচ্ছিস বলে খবর পাই। খোঁজ না! কিন্তু কোথাও পাবি না এই বলে দিলাম। কেন জানিস? তোদের শেকড় পোঁতা আছে এইখানে। এই রাশিয়ার তাইগার বুকে।"

এই বলে পেরুন ফের একবার তার সফেদ ঝলক দেয়া ডাণ্ডাটা মাটিতে ঠুকল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ওজোনের গন্ধ ছড়িয়ে একরাশ ফুলকি উড়ে গেল তার থেকে।

"একই রক্ত বইছে আমাদের গায়ে।" ভারি নরম গলায় প্রায় ফিসফিস করে পেরুন বলছিল, "মধুটা খেয়ে দেখ, তোর জন্মভূমির বুকের মধু রে দাদুভাই। তাহলেই নিজের হারিয়ে যাওয়া আসল ঠিকানার খোঁজ পাবি।"

বলতে বলতেই পেরুন একটা শিং-এর পাত্র ভর্তি টলটলে নীল, সুগন্ধী মধু ইয়েগরের মুখের সামনে এনে ধরল।

"ওরে ব্যাটা ভিতু," পেরুনের গলায় গুরুজনের সোহাগভরা বকুনির আভাস ছিল, "মধু খেয়ে তুই পরি হয়ে যাবি বলে ভয় পাচ্ছিস? ওসব বাজে কথা। এ-মধু তোর আত্মার সব কালিঝুলি ধুয়ে নেবে রে। তোর অতীতের সঙ্গে, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের সঙ্গে, এই রাশিয়ার মাটির সঙ্গে মিলিয়ে এক করে দেবে তোকে। আয়... নে..."।

"আ-আমি খাব না!" বলতে বলতেই কাঁপা কাঁপা হাতে শিংটা তুলে নিল ইয়েগর। তারপর সেটা ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়েও ফের একবার থমকে গিয়ে বলে, "মাটির সঙ্গে এক হয় তো মরে গেলে। আমার মধ্যে যে মানুষটা আছে তাকে তুমি মারতে চাও? তুমি..."

"বোকা কোথাকার। এইটে খাবার পর তুই সত্যিকার মানুষ হবি রে। যার কোনো অতীত নেই, পূর্বপুরুষের কোনো স্মৃতি নেই, সে হল শেকড় ছাড়া গাছের মতো। দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি পাবে কোথায় সে? খা দাদুভাই!"

ইয়েগর শিংটা তার ঠোঁটে তুলে ধরল। তার ভেতরে ঘন নীল মধুর মধ্যে বুড়বুড়ি কাটছিল। একটা মাদক সুগন্ধ তার থেকে উঠে এসে ছেয়ে যাচ্ছিল তার নাকে। কয়েক মুহূর্ত সেই ঘ্রাণ নিয়ে সে পেরুনের দিকে ফিরে তাকাল। চোখের দৃশটি বদলে গেছে তখন ইয়েগরের। পেরুনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তাই হোক। তোমার ওপর ভরসা রাখলাম আমি। আমার পূর্বপুরুষরা তোমায় ভক্তি করেছেন। আমিও তোমায় আমার শ্রদ্ধা দিলাম। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক পিতামহ।"

জ্বালা ধরানো তীব্র সুগন্ধী মধু, শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে তার গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছিল।

"খা রে ব্যাটা। চেটেপুটে সবটুকু খেয়ে নে।" তাকে ঘিরে থাকা ইচ্ছেধারী, বনপরি, জলপরি, দৈত্য, ডাকিনী, বৃক্ষ ুদেবতার দল তার হাত ধরে হুল্লোড় তুলছিল।

শিংটা নামিয়ে রাখতে তার কাঁধে বসে কুর্দিশ আদুরে গরগরানি ছাড়ল একটা,

“বাস রে! তোমাকে রাজি করাতে তো কালঘাম ছোটবার জোগাড় হয়েছিল সবার।” বলতে বলতেই গরম, খরখরে জিভে ইয়েগরের গালটা একবার চেটে দিল সে। “দেখলে তো! মরোনি। কিচ্ছু হয়নি। বোকা ছেলে কোথাকার। এত ভয় পাচ্ছিলে কেন তবে?”

তখন সেই অধিদেবতার দল নাচতে নাচতে হল্লা করতে করতে টেনে নিয়ে চলেছিল ইয়েগরকে। মধুটা খাবার পর তার ভেতরে যে বদলটা আসা শুরু হয়েছে তখন সেইটাকে দু-দণ্ড সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে টের পাবার ফুরসত তাকে দিচ্ছিল না তারা।

খানিক বাদে তাকে আগুনের পাশে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তারা তার মুখটা আগুনের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। সেখানে একটা দৈত্য বসে ছিল। তার বিরাট শরীরটা, রক্ত খেয়ে পুঁটুলি হয়ে থাকা মশায় ঢাকা। মশাগুলোকে তাড়াবার কোনো চেষ্টাই করছিল না দৈত্য। কেবল মাঝে মাঝে মুখটায় হাত বুলিয়ে নিচ্ছিল একেকবার। ওতে কয়েকটা করে মশা পিষে গিয়ে মুখ জুড়ে তার রক্তের আঁকিবুকি বানিয়ে দিচ্ছিল।

“ও হল গিয়ে বেলবগ।” বলে কুর্দিশ তাকে একটা ঠেলা দিল। “ভয় নেই। বেলবগ দৈত্য হলেও লোকটা ভালো।”

ততক্ষণে বেলবগ তার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। মোটা গলায় হেঁকে সে বলে, “কী হে ইয়েগর, আরেক পাত্তর হবে নাকি?”

“মন্দ কী?” ইয়েগর মাথা নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে কেউ মধুভরা আরেকখানা শিং এনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। সেটা হাতে নিয়ে বেলবগের দিকে তাকিয়ে ইয়েগর বলে, “তুমি খাচ্ছ মধু, সে ভালো কথা। কিন্তু মশাগুলো তোমার সব রক্ত খেয়ে গেল যে!”

“আরে ও নিয়ে ভেবো না। ওরা তো বাজে রক্ত চুষে বের করে দিচ্ছে।” মাথা নাড়ল বেলবগ, “এই যে ধরো আমার স্বভাবটা এত মিঠে। সেইটে বজায় রাখা অতই সহজ? এই মশারা সবসময় আমার সব বদবুদ্ধি বদরাগ শুষে নিয়ে আমায়

সাফ রাখে। তোমার ক টা লাগবে নাকি? আমি দিতে পারি। নিয়ে পেলে-পুষে নিজের ঝাঁক বানিয়ে নিতে পারো চাইলে।”

“আহা, থাক থাক।” ইয়েগর মাথা নাড়ল, “তার চাইতে আরও খানিক মধু খাওয়া যাক বরং।” বলে কোনোদিকে দৃকপাত না করে ইয়েগর তার দ্বিতীয় পাত্রটাও গলায় উপুড় করে দিল।

“হুম। ভালো মধু তো খেয়ে দেখলে। এবার তবে খানিক মন্দ মধু চেখে দেখবে নাকি?” হঠাৎ তার পাশ থেকে কে যেন সাবধানী গলায় বলে উঠল, “এসো, আমার সঙ্গে একপাত্তর...”

কথাটা যে বলছিল তার চেহারাটা মানুষেরও হতে পারে, আবার কোনো জন্তুরও হতে পারে। শরীরটা ধাতুর তৈরি। ঝাপসা মুখটা বারবার তার চেহারা বদলে চলেছে। ইয়েগর ঘুরে তাকাতে সে একটা সিংহের থাবা বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। থাবার নখে একটা গ্লাস আটকানো।

“এ হল শেবগ।” কুর্দিশ তার কানে কানে বলে দিল, “এটাও খেয়ে দেখ খানিক। ভালো আর মন্দ তো দুই ভাই।”

“বেশ বেশ। ভালোমন্দ দুইই চেখে দেখি তবে।” বলে হাসতে হাসতে ইয়েগর গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে সেটা শেষ করে দিয়ে পাশে এগিয়ে আসা একটা হাতে সেটা ধরিয়ে দিল। অধিদেবতা আর অপদেবতাদের দলটা ফের তার হাতের ডানা ধরে টেনেটুনে নিয়ে রওনা হল, আর তারপর হঠাৎ হাসির হররা তুলে তাকে কারো একটা চওড়া পিঠের ওপর বসিয়ে দিল।

ইয়েগর টলমল করে উঠে সিধে হয়ে বসতে গিয়ে চারপাশে হাত-টাত ঘুরিয়ে একশা। মধ্যে থেকে তার একটা হাত গিয়ে দাড়িওয়ালা একটা মুখে সপাটে একটা চড়ই কষিয়ে দিল। ততক্ষণে ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠেছে, “সামলে বোস ইয়েগর!”

বলতে না বলতেই যে পিঠটার ওপর ইয়েগর বসে ছিল সেটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। তারপর মাটিতে খুরের ধাক্কা মেরে তারা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল।

কয়েক পাক ঘোরবার পর সেই দাড়িওয়ালা মুখটা ফের তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে গলা ঝাড়ল একবার। এইবার ইয়েগর খেয়াল করল, সে ওই দাড়িওয়ালার পিঠেই বসে আছে। লোকটার শরীরটা ঘোড়ার।

"তা, খানিক ঘুরে আসা যাক, নাকি হে?" ঘোড়ামানুষ বলে উঠল, "আমার নাম পোলকান।"

এই বলে ইয়েগরের জবাবের অপেক্ষা না করেই সে সামনে জ্বলতে থাকা আগুনটার মাথায় লাফ দিয়ে উঠল। গরমের একটা হলকা এসে ইয়েগরের শরীরটাকে ঝলসে দিয়ে গেল যেন। প্রাণপণে পোলকানের পিঠটা জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ল সে। তার সঙ্গে সেঁটে থাকা কুর্দিশও নরম দুটো থাবা দিয়ে ইয়েগরের গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর কানের কাছে গরগর করে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন? মজা না?"

ফার্নের নীল মধু ততক্ষণে ইয়েগরের মাথায় চড়ে বসেছে। একটু একটু ঘুরছিল মাথাটা তার। তাকে পিঠে নিয়ে পিলকান তখন মাঠে জড়ো হওয়া হাজারো অতিথির মধ্যে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছোটার মধ্যেই আগুনের আলোয় উদ্ভাসিত অ-মানুষী মুখগুলো ধরা দিচ্ছিল ইয়েগরের চোখে। তাইগার বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য আশ্রয় থেকে পায়ে, বুকে, ডানায় ভর করে এইখানে এসে হাজির হয়েছে তারা। কিন্তু এই মুহূর্তে আর তাদের কুৎসিত লাগছিল না ইয়েগরের চোখে। যেন তার ভালো আর মন্দের সংজ্ঞাগুলোই

কয়েক মিনিটের মধ্যে বদলে গিয়েছে একেবারে। পাশ দিয়ে হঠাৎ বাদুড়ের মতো ডানাওয়ালা একটা সাপ মাশাকে পিঠে নিয়ে উড়ে গেল। মাশা সেই আগের মতোই আছে, অথচ যেন ঠিক আগের মতো নয়। অন্ধকার বাতাসে তার খোলা চুল উড়ছিল। খানিক মানুষ আর খানিক পরি সেই মেয়ে উড়তে উড়তে কী যে সুন্দর হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছিল চারপাশে! ইয়েগরকে দেখে তার দিকে একবার হাত নেড়ে সে হঠাৎ অনেক উঁচুতে উড়ে গেল। ততক্ষণে তার কাঁধে জড়িয়ে থাকা জীবন্ত লোমের চাদরটি চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মুখগুলোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে চলেছে

ইয়েগরকে। "ও হল ক্রোডো। আর ওই যে, স্বয়ং ইয়ারিলো। ও হচ্ছে লেডা। মহা বজ্জাত আর যাকে বলে একেবারে। থাক গে। ওই দেখো! লাডো এসেছে। ভারি মিষ্টি, তাই না?" বলতে বলতে গলাটা ভারি আদুরে গরগরে হয়ে উঠছিল কুর্দিশের, "এই তাঁদোড়গুলো হল লাডোর ছেলেমেয়ে। লায়লা, মালিনা, ডিডো, কালিনা, আর বড়োটা... ওই যে, ওর নাম পোলেয়া। আর ওই দেখো, ওদিকে, ওই চার মাথাওয়ালাকে দেখছ? ওর নাম শ্বেতভিড। ভারি দয়ালু যোদ্ধা। আর ওই যে লোমে ঢাকা জন্তুগুলো, উফ! ওগুলো হল ভোলোটা। কাউকে ভয় দেখাবার জন্য এরা পারে না হেন কাজ নেই। সবাই এসেছে। মানে, যারা প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে সেইরকম সবাই। মানুষের হাত থেকে লুকিয়ে বাঁচবার জন্য এই এক তাইগাই তো বাকি আছে ওদের হাতে! কিন্তু তবুও... কদ্দিন টিকবে আর বলো তো!"

"চিরকাল।" গর্জন করে বলে উঠল ইয়েগর। তারপর উত্তেজনায় পোলকানের পেটে লাথি কষিয়ে দিল একখানা। সঙ্গে সঙ্গে পোলকান উঁচু হয়ে উঠে বিরাট লাফ দিল একটা। অমনি হাত ছেড়ে গিয়ে তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল ইয়েগর।

"ভয় নেই, ভয় নেই।" কানের কাছে কুর্দিশ বলে উঠল ঠিক তখনই, "তুমি তো উড়তে পারো।"

অমনি ইয়েগর খেয়াল করল, সে মোটেই নিচের দিকে আছড়ে পড়ছে না। বরং আকাশেই গোল হয়ে চক্কর কেটে চলেছে সে। মাধ্যাকর্ষণ বস্তুটাই যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে তাকে ছেড়ে। তবে মাধ্যাকর্ষণ উধাও হলেও পরির দল মোটেই উধাও হয়নি। তারাও তখন দিব্যি তাকে ঘিরে উড়ছে আর সুযোগ পেলেই হেসে হেসে খানিক সুড়সুড়ি কিংবা কনুইয়ের গুতো দিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সেই পুঁচকে ইচ্ছেধারী ইয়েগরের ঠিক মাথার ওপরে এসে উড়ছিল। হঠাৎ সে বলে, "কী হে? আমাদের মধু বস্তুটা তাহলে খারাপ কিছু নয়, বলো? সন্ধেটা কাটছে কেমন

জবাবে ইয়েগর হা হা করে হাসতে হাসতে বলে, "ভাগো হিঁয়াসে!"

তার এখন প্রাণভরে হাসতে ইচ্ছে করছে। আকাশের বুকে ডিগবাজি খেয়ে

উড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। তার এখন চারদিকে ঘিরে আসা ওই না-মানুষী অপদেবতাদের জড়িয়ে ধরে

ভালোবাসতে মন চাইছে। তাদের সঙ্গে নাচবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। চিৎকার করে গান গাইতে মন চাইছে। আগুনের জ্বলন্ত শিখার মধ্যে দিয়ে বারেবারে উড়ে যেতে চায় সে। তার ঝলসানো উত্তাপকে গায়ে মেখে নিয়ে, নীল ফুল থেকে নিংড়ে নেয়া জ্বালা ধরানো নীল নির্যাস বারংবার গলায় ঢেলে... তার ভেতরে উথলে ওঠা আনন্দের ঢেউ হঠাৎ বিচিত্র একটা চিৎকার হয়ে উঠে এল তার গলা বেয়ে, "আহা কী দারুণ রাত! কী যে অপূর্ব, অসামান্য রাত!"

আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল তার পুরনো পরিচিত দিওবা-গুও, পা-দুটো বুকের কাছে গুটিয়ে আগুনের ধারে বসে আছে। তার নেকড়েরা গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে তাকে। চোখ পিটপিট করতে করতে আপনমনেই গান গাইছিল বুড়ো। আর তার নেকড়েরা ধুয়া ধরছিল তার সঙ্গে।

সাইবেরিয়ার মাটির পুরনো দেবতাদেরও দেখা যাচ্ছিল আগুনের পাশে তাইগা ও তুন্দ্রার আত্মা তাঁরা। ছোটোখাটো চেহারা। মোটাসোটা, গোলগাল। ভালুকের চর্বি মেখে চকচকে দু' জনের মুখ। স্লাভ ঈশ্বরদের হাতে হাত ধরে আপন খেয়ালে নেচে যাচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের ঠোঁটে জীবনের গান। গানের সে জীবন মৃত্যুহীন, অক্ষয়, প্রাচুর্যে ভরা।

শুধু অনাথ দিওবা-গুও একলা একলা বসে ছিল। কারো সঙ্গে মেশবার ইচ্ছে নেই তার। কেবল তার চোখেই ধরা পড়েছে অমৃতের মৃত্যু, অক্ষয়ের ক্ষয়, প্রাচুর্যের অন্তের ইঙ্গিত। তার গানে সেই শোকের ছায়া পড়ছিল।

ওদিকে ইয়েগর তখন অজস্র ছোটোবড়ো শিং থেকে বারে বারে গলায় ঢেলে চলেছে নীল ফুলের আগুনে নির্যাস। স্ট্রাইবগ আর ডাঝবগ-এর পাত্র থেকে পান করেছে সে। তার ঠোঁটে চুমু এঁকে দিয়েছে লাডো। সুন্দরী লায়লা-মালিনার বাঁশি গান শুনিয়েছে তাকে।

হঠাৎ উড়তে উড়তেই সেই দুঃখে আনন্দে গানে ডুবে থাকা দেবতা, অপদেবতা,

পরি আর দৈত্যদের দিকে তাকিয়ে সে হেঁকে উঠল, "ওহে বিবর্তনের শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাদের দল, তোমরা মরবে না। আমি মরতে দেব না তোমাদের। বিপন্ন প্রজাতিদের তালিকায় তোমাদের নাম তুলে দেব আমি। শুনতে পাচ্ছ? বিপন্ন প্রজাতি! হা হা। তারপর আর কেউ কখনো তোমাদের ছুঁতে আসবে না। যেমনভাবে চাও, ঠিক তেমনভাবেই বেঁচে থাকো তোমরা। কিন্তু বেঁচে থাকো।"

জবাবে পরির দল হাসল। পোলকান তার খুর ঠুকল মাটিতে। পাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে জলপরিরা ইয়েগরকে তাদের ঠাণ্ডা শরীর দিয়ে ছুঁয়ে আদর করে গেল। তাকে ঘিরে সেই অগুনতি অস্তিত্ব দপদপিয়ে উঠছিল বারবার। পাক খাচ্ছিল, ঢেউ তুলছিল, হঠাৎ হঠাৎ গলে মিশে গিয়ে যেন আগুনের সাগর হয়ে ঢেকে দিচ্ছিল তাকে। সেই অগ্নিসাগরের বুক থেকেই ফের তারা অসংখ্যবার অসংখ্য রূপ ধরে জন্ম নিচ্ছিল, ফের মৃত্যুর ডাকে

মিশে যাচ্ছিল সেই সাগরের বুকে, লক্ষ-কোটি কণা জুড়ে নিজেদের সৃষ্টি করে ফের ভেঙে দিচ্ছিল, মৃত্যু, পুনরুত্থান, আবির্ভাব, তিরোভাব, উত্থান, পতন...

অবশেষে একসময় মাঠটার একধারে মাটিতে নেমে এল ইয়েগর। কুর্দিশ ততক্ষণে উধাও হয়েছে তাকে ছেড়ে। কেবল মাশা দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশে। নগ্ন, সুন্দর, পবিত্র। তার চোখদুটো ইয়েগরের দিকে তুলে ধরা। তার মুখে কোনো কথা ছিল না। ঠোঁটে হাসি ছিল না। কাছে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল ইয়েগর। মাশা তার হাতদুটো তার কাঁধে ছড়িয়ে দিল।

ইয়েগর টের পাচ্ছিল, মাশা মিশে যাচ্ছে তার শরীরে। তার রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জায় দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে মাশা। এমনভাবে মিশে যাচ্ছে যেন তার আলাদা কোনো অস্তিত্বই ছিল না কখনো।

ইয়েগর আর ভয় পাচ্ছিল না। মাশাকে সে অস্বীকার করল না। বরং আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরল তার মিলিয়ে যেতে থাকা শরীরটিকে।

তারপর একসময় সে খেয়াল করল, মাশার কোনো চিহ্ন বেঁচে নেই আর। তার হাতদুটো তার নিজের শরীরকেই জড়িয়ে রয়েছে কেবল। আর তারপর, হঠাৎ সে

টের পেল, আর সে একা নয়। আর সে কেবল ইয়েগর নয়। এখন সে একসঙ্গে দুটি শরীর। এখন সে একসঙ্গে দুটি আত্মা।

ভালোবাসার জনকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে যে অস্তিত্বকে লাভ করবার জন্য অন্ধভাবে হাতড়ে বেড়ায় মানুষ, অর্ধনারীশ্বরের যে যুগ্ম অস্তিত্বে পৌঁছোবার পথ সে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলেছে, সে পথের ঠিকানা ইয়েগরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে আজ।

কিন্তু, সে আর ইয়েগর নয়। গায়ে সেঁটে থাকা ফারের পোশাকটার হাতা ধরে, সেটা খুলে ফেলবার জন্য টান দিতে বড়ো যন্ত্রণা হল তার। যেন সে নিজের চামড়াতেই টান লাগিয়েছে। কারো দিকে নজর ছিল না তার আর। উপুড় হয়ে শুয়ে উষ্ণ, প্রাণদায়ী মাটির শরীরে মুখ ঠেকিয়ে সে তখন শেকড় ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার বুকে। যেন এক বিশাল জ্ঞানবৃক্ষ হয়ে উঠছিল ইয়েগর। তার ডালে ডালে ফল ধরেছে। ভালোমন্দের জ্ঞানের ফল। প্রকৃতির আত্মাকে চিনে নেবার ফল।

পরদিন সকালে বৃষ্টি এল। প্রথমে ঝিরঝিরে, তারপর আস্তে আস্তে মুষলধারে বৃষ্টির ধারা নেমে এল তাইগার বুকে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অগুনতি গাছের পাতা ও শেকড়রা সেই জল খেয়ে পুষ্ট হল, তাদের শিরা-উপশিরায় জমাট বেঁধে থাকা ঘন রস ফের সচল হল। ধুয়েমুছে, নতুন করে গড়ে, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের নতুন জীবন দিয়ে চলল সেই বৃষ্টি। আগের রাতে ফুটে ওঠা মধুফুলদের নীল পাপড়ির দল সেই বৃষ্টি ঘা খেয়ে তলিয়ে গেল মাটির নিচে। তারপর সব কাজ সারা হলে সেই বৃষ্টির অবিরল ধারা ঝরে পড়তে থাকল মাটিতে শুয়ে থাকা পুরুষটির শরীরে।

মাঠটার ঠিক মাঝখানে বড়ো শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল ইয়েগর। তার চারপাশে কেউ কোথাও নেই। সুন্দরী তাইগা উপুড় হয়ে ছিল তাকে ঘিরে। তাকে নিদালি গান শোনাচ্ছিল অলস গলায়। স্বপ্ন পাঠাচ্ছিল তার ঘুমের গভীরে। বড়ো সুন্দর সেইসব স্বপ্নেরা।

সেই স্বপ্নে গাছপালা, পশুপাখি, ঘাসবন, সকলেই তার কাছে এসে নিজের

নিজের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল তার সঙ্গে। সেইসব কথার অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল

ইয়েগরের। মানুষ ওদের যেসব আলাদা আলাদা নামে ডাকে, সেইসব নামে ডাকবারও দরকার হচ্ছিল না কোনো। কারণ সে আর ওই প্রাণেরা তো আলাদা নয়। তারা তো সকলে মিলে একটাই অস্তিত্ব! যা কিছু শ্বাস নেয়, বাড়ে, নড়ে, যা কিছু জন্মায়, মরে, ধুলো হয়ে গিয়ে ফের সৃষ্টি হয়, অ্যামিবা থেকে ঐরাবত সেই সবকিছুই তো আসলে সে-ইয়েগর! চিরজীবী, চিরতরুণ ইয়েগর! পরিবর্তিত হই, সেইটেই আমার আমিত্ব। পরিবর্তনই একমাত্র ধ্রুব। অতএব সেই অমোঘ নিয়ম মেনে ইয়েগরও বদলাচ্ছিল। কিন্তু বদলে গেলেও অরণ্য বা মানুষের জন্য ভালোবাসাটুকু বদলাচ্ছিল না তার।

এর সপ্তাহ খানেক বাদে কয়েকজন ইওয়েঙ্ক দল বেঁধে নদী পার হবার সময় ইয়েগরকে দেখতে পায়। নদী-পাশে একটা ছোটো টিলার মাথায় নুড়ির তৈরি একটা খুদে ঢিবির পাশে বসে ছিল সে। বসে বসে অদৃশ্য কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল।

লোকগুলো প্রথমে খানিক ঘাবড়ে গিয়েছিল তাকে দেখে। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন। বারবার শুধু একটাই কথা বলে চলেছিল মানুষটা, সে আর কেবল একলা নয়। তাইগার সমস্ত অরণ্য, সমগ্র জীবজগত তার অংশ। ইওয়েঙ্করা তাকে ধুয়েমুছে সাফ করল। খাবার খাওয়াল। তারপর একটা বলগা হরিণের পিঠে চাপিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে এসে শহরে খবর পাঠাল।

শহর থেকে হেলিকপ্টার আসবার জন্য যখন তারা অপেক্ষা করছিল, ইয়েগর সেই সময়টা একলা একলা সেখানকার মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াত। বলগা হরিণ আর পাহারাদার কুকুরদের সঙ্গে তার যত কথাবার্তা। আর কী আশ্চর্য, ভয়ানক কুকুরগুলোর একজনও তাকে কামড়াতে আসত না।

ইওয়েঙ্ক ভেড়াওয়ালারা ইয়েগরের যত্ন-আত্তির ত্রুটি করত না। তারা ভাবত, বেচারা তাইগার বুকে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পাগলই হয়ে গেছে বুঝি। তাদের

সব প্রশ্নের জবাবে কেবল দুটোই উত্তর ছিল তার মুখে হ্যাঁ, আর না। তাদের কথাবার্তাগুলোকেও সে মন দিয়েই শুনত শুধু। তার হাবভাবে মনে হত মানুষে আর বলগা হরিণে বিশেষ তফাত সে করতে পারে না।

অবশেষে একদিন হেলিকপ্টার এল। ইওয়েঙ্কদের ক্যাম্প থেকে প্রথমে ইয়েগরকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভূতত্ত্ববিদদের একটা ফিল্ড স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হল বড়ো শহরের হাসপাতালে। হাসপাতালের আলো-হাওয়াভরা ঘরটাতে সে ছাড়া আরও তিনজন রোগী ছিল। তার পাশের বিছানায় ছিলেন ছায়াপথের শাসক। আকাশের তারাদের মরণ-বাঁচন উপস্থিত তাঁর ইচ্ছাধীন না হলেও, সে-ঘরের প্রতিবেশীদের ঘুম হওয়া বা না হওয়াটা পুরোপুরিই তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল। অতএব রাত হলেই ইয়েগর নিজেকে একটা গাছে বদলে নিয়ে পরদিন সকাল অবধি নিশ্চিন্তে ঘুমোত।

ডাক্তারবাবু ইয়েগরের সঙ্গে অনেক গল্পসল্প করতেন রোজ। ইয়েগরের কথাবার্তায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কেতা মোতাবেক কোনোরকম সন্দেহ দেখাতেন না ডাক্তারবাবু। তাঁর চেষ্টা ছিল ক্রমাগত কথা বলে বলে যদি এর পাগলামোটার শেকড়ে পৌঁছোনো যায়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর মনটা শান্ত হলে ইয়েগর ডাক্তারদের মতলবটা বুঝে গেল। অতএব তাঁদের সামনে আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ কথাবার্তা চালু করে দিল সে। কাজটা তার পক্ষে কঠিন নয়। কারণ এখন তো সে ইচ্ছে করলেই যে-কোনো প্রাণী হয়ে যেতে পারে। তাই সাধারণ মানুষ হয়ে যেতে আর কষ্ট কী?

কয়েকদিন এইরকম করে সাধারণ মানুষ হয়ে থাকবার পর ডাক্তাররা বুঝল, ইয়েগর ভালো হয়ে গেছে। নিজেদের কাজটা তারা ভালোভাবে করতে পেরেছে ভেবে খুশি হয়ে তারা ইয়েগরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার কাগজপত্র তৈরি করতে বসল।

কিন্তু এরপর একদিন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। গ্যালাক্সির শাসক মশাই

মহাকাশে একটা ব্ল্যাক হোলে তাঁর যানটাকে এনার্জি নেবার জন্য গুঁজে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিকঠাক করে ব্ল্যাক হোলটার শক্তি বুঝতে না পারায় তার ধাক্কা খেয়ে তিনি মাঝরাতে খাট থেকে মেঝেতে আছড়ে পড়ে হাতটা ভেঙে ফেলেন।

তবে ছায়াপথের শাসক বলে কথা। সামান্য হাত ভাঙার ব্যথায় হইচই করা তাঁর সাজে না। অতএব তিনি কাউকে কিছু না বলে ফের বিছানায় উঠে বসে ভাঙা হাতটা ধরে একা একাই ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন।

ব্যাপারটা খেয়াল করে ইয়েগর আর ডাক্তারকে ডাকল না। তার বদলে বুদ্ধের ভাঙা হাতটা ধরে ভালো করে তাকিয়ে দেখল সেটার দিকে। কেমন অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে। হাতটা। নড়বড়ে হয়ে দুলছে। খানিক বাদে তার চামড়া আর মাংসের মধ্যে দিয়ে ইয়েগরের চোখ এগিয়ে গেল আঘাতটার গভীরে। সেখানে হাড়টা মাঝখান থেকে জটিলভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। ভাঙা জায়গাটাকে মোলায়েমভাবে হাতের তেলোয় চেপে ধরল সে। টের পাচ্ছিল, তার হাত থেকে কিছু একটা স্রোত বয়ে চলেছে আহত হাতটার ভেতরে।

খানিকক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পর বুড়োমানুষটার কাতরানির শব্দ থেমে এল। আর কোনো ব্যথা নেই তার হাতে। এইবার ইয়েগর চাপ দিয়ে দিয়ে খুব যত্ন করে ভাঙা হাড়টাকে সেট করল, তারপর অসাড় করে দেয়া জায়গাটার ওপর হাতের আঙুলগুলো চেপে ধরল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আঙুলগুলো থেকে বের হয়ে আসা আবছা আলোটা তীব্র ঔজ্জ্বল্যে ঝিকিয়ে উঠল। তারপর ছোটো ছোটো ধারালো ঝলকে চামড়ার আড়াল পেরিয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল তার ভেতরে থাকা ভাঙা হাড়গুলোকে। প্রায় আধঘণ্টা বাদে দেখা গেল হাতটা সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। বৃদ্ধ শাসক আবার হাত নাড়িয়ে চাড়িয়ে তাঁর যোদ্ধাদের হুকুম-হাকাম দিতে পারছেন।

এরপর এক বিশ্বব্যাপী হুকুমনামায় তিনি ইয়েগরকে অর্ডার অব দ্য সুপারনোভায় ভুষিত করলেন ও শ্বেত বামনদের শাসনভার তার হাতে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সোপর্দনামা জারি করলেন। এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য ইয়েগর তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাল এবং সেদিন থেকে সে ছায়াপথের মালিকের সেরা বন্ধু হয়ে

উঠল।

জানা গেল সেনাপতিমশাইয়ের আসল নাম ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। হাসপাতালে আসবার আগে তিনি একজন জৈব-পদার্থবিদ ছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে দাবি করতেন। সকলেই করে। নিজের দায়িত্বের বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। একদিন ইয়েগরকে ধরে বসিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, গোটা গ্যালাক্সিটাই আসলে একটা জীবন্ত প্রাণী এবং তিনি, ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ, সেই প্রাণীটির মস্তিষ্ক। তার যাবতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। কোটি কোটি নক্ষত্রের জন্মমৃত্যু, তাদের নিয়তির নিয়ন্তা তিনি। এই গুরুদায়িত্ব তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আস্তে আস্তে তার চাপই পাগল করে দিতে চলেছে তাঁকে। তিনি শান্তি চান। অথচ সিগনাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে যুদ্ধের শব্দ ভেসে আসছে। লক্ষ লক্ষ তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সেই যুদ্ধের আগুনে। তিনি ঘুমোতে চান। অথচ অগণিত গ্রহে প্রাণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সেই নতুন সৃষ্ট প্রাণেরা মহাকাশ জুড়ে ভেসে বেড়ায়। তারা সময়ের ধারাকে বিকৃত করে। তারা মহাশাসকের কথা শোনে না। তাই তিনি দরকারে কঠিন সাজা দেন সেইসব সভ্যতাকে। কখনো সুপারনোভা গড়ে, কখনো একেকটা সম্পূর্ণ সভ্যতাকে ব্ল্যাক হোলের গর্ভে চালান করে, কখনো-বা তাদের নক্ষত্রকে ধুলো করে মহশূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু গ্যালাক্সিতে অগণিত তারা। অগণিত অশান্তি। কিন্তু তিনি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ। গ্যালাক্সির শাসক তিনি। কিন্তু গোটা গ্যালাক্সিতে এমন একচিলতে জায়গাও নেই যেখানে তিনি একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারেন।

“সবকিছু ঠিক কেমনটা হলে ভালো লাগবে বলুন তো আপনার? কী হলে আপনি শান্তি পাবেন?” ইয়েগর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

জবাবে তিনি বললেন, “যদি আমি তারাদের ধুলো হতে পারতাম! না না, হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু... সময়ের একটা কোয়ান্টাম... উঁহু, আমি সব জায়গায়, সব সময়ে... স্থানকালহীন অনস্তিত্বে... নাহ। আমি আর বাঁচতেও চাই না। আমি শুধু একটু শান্তি চাই। একটু ঘুমোতে চাই।”

সেই রাত্রে গ্যালাক্সি শাসকের ফের ঘুমের সমস্যা দেখা দিল। মাঝরাত্রে সিরিয়াস নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে আদেশনামা পাঠানো শুরু করলেন তিনি। কাউকে তিরস্কার, কাউকে পুরস্কার বিতরণ চলল অনেকটা সময় ধরে। শেষমেশ নার্স এসে তাঁকে ঘুমের একটা কড়া ইঞ্জেকশন দিতে ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ শান্ত হলেন।

ইয়েগর বুঝল, ক্লান্ত বৃদ্ধের একটু সাহায্য দরকার। গভীর রাত্রে তাঁর বিছানার পাশে উঠে এসে তাঁর কপালে আঙুল ছোঁয়াল সে। আস্তে আস্তে আঙুলগুলো তাঁর কপালের দু পাশে, তাঁর গালে, মুখে, ঘাড়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন। তারপর একটুখানি হেসে ইয়েগরের দিকে ফিরে বললেন, "আমি কাল রিটায়ার করেছি, বুঝলে? আমার জায়গায় কাজটা যে নিয়েছে সে খুব দক্ষ লোক। আমার দায়িত্ব শেষ। এইবার আমি একজন রিটায়ার্ড বুড়ো। কিছু খেতে পেলে ভালো হয়।"

সেই দিনটা থেকেই খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগলেন ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ। কয়েকদিনের মধ্যেই ডাক্তাররা বললেন, রোগের কোনো চিহ্ন নেই আর তাঁর মনে। তারপর একই দিনে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হল ইয়েগর আর ভ্যাসিলি পেট্রোভিচকে।

চলে যাবার আগে ইয়েগরকে হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারবাবু ডেকে পাঠালেন একবার। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদটি ইয়েগরের কেস ফাইলটার পাতা উলটেপালটে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর সেটা দুম করে বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর আঙুলের টোকা দিতে দিতে বললেন, "ইয়েগর, তোমার এখন অসুখ নেই কোনো। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তাইগায় হারিয়ে যাবার আগে তুমি যেমন ছিলে এখন তার চাইতেও শরীর স্বাস্থ্য বেশি ভালো হয়ে গেছে তোমার। আমাদের চিকিৎসায় এমনটা ঘটেছে এইটে ভাবতে আমার ভালোই লাগবে, বুঝলে! কিন্তু আমি জানি সেটা ভুল। কেন জানো? কারণ এখানে ভর্তি থাকতে থাকতেই অন্তত বার দুয়েক তুমি এমন দুটো কাজ করে দেখিয়েছ। যেগুলো করা মানুষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধ্যে নেই

এখনো। আমি ভ্যাসিলি পেট্রোভিচের কথা বলছি। দু-দু' বার তুমি তার চিকিৎসা করেছ। আমি সব জানি। কিন্তু প্রশ্ন। হল, কী করে? কোন পদ্ধতিতে?"

"জানি না।" ইয়েগর মাথা নাড়ল, "পারি যে এইটুকু জানি কেবল। আরও অনেক কিছুই পারি। কিন্তু কেমন করে পারি তা আমার বুদ্ধির বাইরে।"

"হুম। আচ্ছা ইয়েগর, বায়ো এনার্জেটিকস বলে কোনো বিষয়ে কখনো কোথাও পড়েছ?"

"পড়েছিলাম বোধ হয় একবার। অনেকদিন আগে। এখন আর সেসব মনে-টনে নেই। শুধু একটাই কথা আমি জানি। এ গ্রহের যাবতীয় প্রাণ একটাই চেতনার সঙ্গে জোড়া।"

"বায়োফিল্ড! এ বিষয়ে অনেক চালু তত্ত্ব আছে ইয়েগর। আচ্ছা, তুমি তোমার শক্তির দু-একটা নমুনা আমায় দেখাবে একটু? ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। যা-ই করো না কেন তুমি, তোমার ফিট সার্টিফিকেটখানা বাতিল হবে না।"

ইয়েগর মাথা নাড়ল। তারপর নিজেকে হাজারো জাতের পাখির একটা বিরাট দলে বদলে নিয়ে সারাটা ঘর জুড়ে উড়ে বেড়ালো খানিকক্ষণ। পাখিরা ঘরের জানালায়, দেয়ালে, ঘুলঘুলিতে বসে যার যার ভাষায় গান শোনাল।

সেদিকে তাকিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বড়ো ডাক্তার বললেন, "ইন্টারেস্টিং। দারুণ ইন্টারেস্টিং। তা, এখান থেকে বেরিয়ে তুমি কী করবে বলে ঠিক করেছ ইয়েগর? উপস্থিত গান-টানগুলো থামাও। নইলে গোটা হাসপাতাল এসে, কী হচ্ছে দেখবার জন্য আমার দরজায় লাইন দেবে।"

জবাবে পাখিদের একটা দল মানুষের গলায় বলে উঠল, "ঠিক করেছি খুব আনন্দ করে বেঁচে থাকব। আর সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত উপদেবতা, অপদেবতাদের বাঁচাবার জন্য লড়ে যাব।"

"আমি তোমায় বিশ্বাস করি।" বলতে বলতেই মাথা নাড়লেন বড়ো ডাক্তার, "না না। মন রাখা ভদ্রতা করছি না। সত্যিই তোমায় বিশ্বাস করতে চাই আমি। কিন্তু যা বলছ, যা করছ, তার কিছু বুঝতে পারছি না যে। মনে হচ্ছে আসলে আমিই পাগল

নই তো? কোথায় শিখলে তুমি এসব?”

“সহজ।” বলতে বলতেই সমস্ত পাখিগুলো জুড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে একটা ইয়েগর হয়ে যাচ্ছিল, “আমি শরীরের সীমাকে পেরিয়ে যাবার কৌশল জেনেছি। আর আমি একা নই।”

“আমায় তুমি শেখাবে?” বড়ো ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, “খুব কি কঠিন?”

“শুধু আপনাকে নয়। সবাইকে শেখাব আমি। না সহজ নয়। বড় কঠিন। কিন্তু শেখাটা সম্ভব। এবার আমি যাই?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। যখন খুশি। আমি তোমায় আটকাব না। কিন্তু একটা প্রশ্ন। এখান থেকে তো তুমি যখন খুশি চলে যেতেই পারতে। তাহলে কেন...”

“ওভাবে যদি চলে যেতাম, তবে তারপর কী হত আমার?” ইয়েগর হাসল, “এই যে এখন এইভাবে এখান থেকে বের হচ্ছি, এখন আমার হাতে আপনার সই করা কাগজ আছে একখানা। তাতে লেখা আছে আমি একেবারে সুস্থ। লেখা আছে আমি শহরের অন্য লোকজনের সঙ্গে থাকতে পারি। কাজও পেতে পারি।”

“হ্যাঁ, তা বটে। তবে কাগজ-টাগজ যা-ই হতে নাও না কেন, বাইরে বেরিয়ে লড়াইটা তোমার খুব একটা সহজ হবে না কিন্তু।”

“জানি তো!” বড়ো ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে ভ্যাসিলি পেট্রোভিচকে সঙ্গে করে ইয়েগর হাসপাতালের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। প্রাক্তন গ্যালাক্সি শাসক আসলে দুনিয়ায় একেবারে একা। হাসপাতালে থাকাকালিন তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে আছে। ইয়েগর কাজেই তাঁকে নিজের কাছেই এনে তুলল।

ফের নিজের পুরনো কাজে ফিরে গেল ইয়েগর। ভ্যাসিলি পেট্রোভিচের একটা পেনশনের বন্দোবস্ত হয়েছিল। সারাটা দিন একা একাই তিনি তাদের অ্যাপার্টমেন্টটাতে কাটাতেন। নানা উদ্ভট যন্ত্রপাতির মডেল তৈরি করবার নেশায় পেয়েছিল তাঁকে। প্রায় দিনই সন্ধেবেলা দুই বন্ধু মিলে বেজায় তর্কবিতর্ক চলত। কিন্তু তাতে কেউ কাউকে হারাতে পারত না।

“আরে ধুস! পৃথিবীর প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াটা আবার কী? যতসব বাজে কথা।” ভ্যাসিলি বলে চলতেন, “ও তো মানুষের বিবর্তনের একটা গোড়ার ধাপ হবে কেবল। ওই ধাপটা পেরিয়ে তারপর একদিন মানুষ গোটা ব্রহ্মাণ্ডের চেতনার সঙ্গে এক হয়ে যাবে। এইসব মহাকাশযান-টান দিয়ে কিস্যু হবে না, বুঝলে? আদিম জিনিস সব। এসব টিনের কৌটো ছেড়ে সরাসরি মহাকাশ বেয়ে চলাফেরাটা রপ্ত করে ফেলতে হবে আমাদের।

“যে-কোনো প্রাণীর রূপ ধরতে পারো তুমি, এই বলছ তো? ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেলে পরে মানুষ দেখবে আলো, হাওয়া, মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র এইসব কিছুর চেহারাও ধরতে পারবে। বায়োফিল্ড খুব ভালো জিনিস। কিন্তু আদতে সে হল গিয়ে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছেয়ে থাকা একক যে শক্তি, তারই একটা অংশ।

“তুমি বলছ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তার মাথায় চেপে বসে কাজটা আমরা ভালো করিনি, তাই তো? আমি বলব, গোটা গোটা ব্রহ্মাণ্ডটার সঙ্গে লড়াই করে তাকে জয় করবার চেষ্টা করাটা তার চাইতে আরও খারাপ। প্রকৃতিকে তো মানুষ জয় করেই ফেলেছে। কিন্তু তার ফলটা কী হয়েছে, সে তো হাতেনাতেই টের পাচ্ছি আমরা। তাহলেই ভাবো!

এইভাবে দিনের পর দিন ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ তাঁর যুক্তি সাজাতেন। ইয়েগর তাঁর সঙ্গে বেজায় তর্ক করত। নানান যুক্তি দিত। তারপর যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পারলে হঠাৎ একটা ভালুক হয়ে গিয়ে তাঁর মুখে থাবা চাপা দিয়ে ধরত।

মুখ চাপা ভাসিলি প্রাণপণে চিৎকার করবার চেষ্টা করতেন, “মুখ বন্ধ করে দেবার এটা কোনো যুক্তি হল নাকি? আমি কিন্তু এবার নিজেকে নিউট্রন স্রোতে বদলে নিয়ে তোমায় মজা দেখিয়ে ছাড়ব, এই বলে দিলাম।”

একদিন হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারবাবু ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ইয়েগরদের অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির। সেখানে এসে ইয়গরের ফ্ল্যাটে ভ্যাসিলি পেট্রোভিচকে দেখে তিনি খানিক অবাক। খানিক কথাবার্তার পর তিনি ইয়েগরকে বললেন, “আমায় যে তুমি কিছু কিছু বিদ্যে শেখাবে বলেছিলে!”

“কেন শিখতে চান?”

“আমি একজন ডাক্তার। আমি মানুষের অসুখ সারাতে চাই। কিন্তু তবুও অনেক সময় সারাতে পারি না ইয়েগর। আমার কষ্ট হয়। কী মনে হয় জানো, কোনো অসুস্থকে বাঁচিয়ে তোলবার ক্ষমতা থাকলেও তুমি সেটা কাজে লাগাবে না, এটা অমানবিক। আমাকে শেখাও ইয়েগর। তাহলে দেবদেবতাদের বাঁচাবার যুদ্ধে আমিও তোমার পাশে দাঁড়াব। আমার বয়েস কম ইয়েগর। আমি ভালো সৈনিক হতে পারব।”

“বেশ।” মাথা নাড়ল ইয়েগর, “শেখাব আপনাকে।” এরপর থেকে প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা বড়ো ডাক্তার তার কাছে আসা শুরু করলেন। ভ্যাসিলি পেট্রোভিচের অজস্র টিটকিরি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতেন তিনি এবং সেইসব সহ্য করতে করতেই মেডিক্যাল কলেজ বা অন্য কোনো স্কুল যে বিদ্যে তাঁকে শেখায়নি তার পাঠ নিচ্ছিলেন তিনি ইয়েগরের কাছে। বড়ো ডাক্তারের পড়াশোনা অনেক। বিশ্বাস করবার ক্ষমতাও অসীম। কখনো-বা ইয়েগরের শিক্ষায় ফিলিপিনো আদিবাসীদের বিনা অস্ত্রে টিউমার সারাই করবার গুজবের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন ভেবে খুশিয়াল হয়ে উঠতেন। কখনো চেতনাকে চতুর্থ মাত্রায় তুলে নিয়ে গিয়ে দেহকে জানবার তত্ত্ব বানিয়ে তাই নিয়ে তর্ক জুড়তেন। এই শেষের তত্ত্বটা শুনে ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ হাসতে হাসতে গড়িয়েই পড়েছিলেন প্রায়।

সেদিন যত টিটকিরি খেয়েছিলেন বড়ো ডাক্তার তেমনটা তিনি আর কখনো খাননি। আর সেই করতে করতেই অবশেষে একদিন ডাক্তার টের পেলেন, রহস্যটা তিনি বুঝতে পারছেন। কেমন করে যে পারছেন তা তিনি জানেন না। শুধু এইটুকুই টের পারছিলেন, চেতনার গভীরে একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়ালটাই তাঁকে শুধু মানুষের সীমাবদ্ধ খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে। বন্দিশালার এই দেয়ালটা পেরোতে পারলে একমাত্র

তবেই মানুষের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি আরও উন্নত, আরও বিস্তৃত কোনো অস্তিত্বের নাগাল পাবেন।

সে-বছর বসন্তের শেষের দিকে ইয়েগর ফের শহর ছেড়ে রওনা দিল। টুকিটাকি কয়েকটা কেনাকাটা সেরে সে সোজা রওনা হয়ে গেল তাইগার গভীরে। ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ তাদের শহরে অ্যাপার্টমেন্টে বসে তাঁর বিচিত্র যন্ত্রপাতিদের মডেল গড়ে চললেন। সেসব যন্ত্রের নীল লেন্সদের মহাকাশের হাজারো তারার দিকে তাক করে তাতে চোখ রেখে তিনি সবার আড়ালে নিজের গ্যালাক্সি শাসকের দিনগুলোর কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। বড় ডাক্তার ওদিকে ইয়েগরের শিখিয়ে যাওয়া কায়দাগুলো ক্রমাগত অভ্যেস করে চলেছেন। ধীরে ধীরে চেতনার গভীরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই দেয়ালটাকে পেরোবার কৌশল তাঁর দখলে আসছিল। ধীরে ধীরে দুরারোগ্য অসুখগুলোকেও অবলীলায় সারিয়ে তুলছিলেন তিনি। রুখে দিচ্ছিলেন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকেও।

কিছুদিন পরে ইয়েগর যখন ফিরে এল, দেখা গেল সে একলা আসেনি। তার সঙ্গে একজন দাড়িওয়ালা অতিথিও ছিলেন। মানুষটার একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, দুটো চোখ তিনি একসঙ্গে অনবরত পিটপিট করতেন। ইয়েগর আর এই নতুন লোকটা শহরে ফিরেই একসঙ্গে বেশ কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসবার পর থেকে দু' জনে মিলে কোনো দুর্বোধ্য ব্যাপার নিয়ে সারাদিন ঝগড়াঝাঁটি চালাত। মাঝেমধ্যে ঝগড়াটা হাতাহাতিতে বদলে গেলে ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ উঠে এসে তাদের টেনে আলাদা করে দিতেন আর ভয় দেখাতেন, সদ্য বানানো মেসন কামান দিয়ে দুটোকেই নাকি খতম করে দেবেন একেবারে।

পরের হেমন্ত অবধিও বাঁচলেন না ভ্যাসিলি পেট্রোভিচ। মৃত্যুশয্যায় তিনি ইয়েগরকে বললেন, "আমার শরীরটাকে মহাকাশে সমাধি দিতে পারবে তুমি? সেখানে আমি আস্তে আস্তে সূর্যের টানে তার দিকে এগিয়ে যাব, তারপর একদিন তার বুকে আছড়ে পড়ে এক ঝাঁক ফোটনে বদলে গিয়ে ছড়িয়ে যাব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। সময় আমায় আর ছুঁতে পারবে না। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বেঁচে থাকব আমি। চিরকাল।"

ওদিকে ডাক্তার তাঁর কথা রেখেছিলেন। এদেশের সমস্ত লৌকিক দেবতা, অধিদেবতা, অপদেবতা, পরি, দানব, পিশাচদের সংরক্ষিত জীবদের তালিকায় জায়গা দেবার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন পাঠালেন তিনি সব জায়গায়। কেউ তাঁর কথা শুনল না। তারপর এদের নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখলেন তিনি। কোনো পত্রিকা তাদের ছাপাল না। আর এই সবকিছু করতে করতেই তিনি বুকে একটা বিশ্বাসকে বড়ো যত্নে জ্বালিয়ে রেখে চললেনুএকদিন মানুষ আর তাঁর জন্মভূমি এই ভঙ্গুর গ্রহটার মধ্যে যুদ্ধের শেষ হবে।

একদিন তারা একে অন্যের বন্ধু হবে। একদিন...

মেফিস্টো

আবার দৈত্যাকার স্কুইডটা। কোনোই সন্দেহ নেই তাতে।

উনি খবরের কাগজটা দলা-মোচড়া করে জলে ছুঁড়ে দিলেন। ওটা কাগজের নৌকোর মতো ভেসে রইল খানিক তারপর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল; সাগরের জলে ছোট্ট একটা ঘূর্ণি কাগজটাকে টেনে নিল।

এবারে ওটা সাগরের একেবারে তলায় চলে যাবে এবং অনির্দিষ্টকাল পড়ে থাকবে। ওর সাদাটে তথ্যের পাখনা ছড়িয়ে: বিশাল সমুদ্র এবং বিশাল স্কুইড...

সমুদ্র... চারদিকেই তার গর্জন শোনা যাচ্ছে। চকচকে পাথরগুলোর ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউ, পাথরের ফাঁকে আটকা পড়ে ছোটো ছোটো অসংখ্য ঢেউয়ের ছলাৎ ছল উঠছে। একেবারে শেষের ঢেউগুলো পায়রার বাসার বাদামি খড়কুটো আর সবজেটে শিরাওয়ালা গিরগিটির ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

বেশ মনোযোগ দিয়ে যদি কেউ শোনে তো বলতে পারবে ঢেউগুলোর দু-রকম দশা, দুটোই ধীর এবং একঘেয়ে: সময়ের ধাতব পেন্ডুলামটা অনেকটা বিস্তার নিয়ে দুলেই চলছিল।

ঢেউটা ঘুমপাড়ানি গান গাইছিল, মনে হচ্ছিল একটানা একই সুরে বারবার, 'ঘুমোতে যাও, ঘুমোও, ঘুমোও... তুমি এখন স্থির ও প্রশান্ত হয়ে আছ...'।

ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে সূর্যের আলো জলতল ছুঁয়ে যাচ্ছে। পেন্ডুলাম দুলছে, বাধাহীন, কোনো তাড়া নেই, আর এসময় স্ফটিক ঢেউগুলো ছুটে যাচ্ছে পাড়ে (সমুদ্র -ঝাঁঝিগুলো ভেসে ভেসে পাথরের গায়ে, ঠিক চিকচিকে লাল লাল ফোঁটার মতো)। গতিটা আবার বিপরীতমুখী হচ্ছে, পেন্ডুলাম উলটোমুখে দুলে ফিরে আসায়, সমুদ্রের গভীরে একটা সাদা পাথর বেরিয়ে পড়ছে।

খবরের কাগজের লোকগুলো... কেন ডাকল? ওরা কি কখনো কেবিনের মধ্যে

জাহাজের লোকজনসুদ্ধ ডুবছে এরকম ভেঙে পড়া পালতোলা জাহাজ ̮ স্কুনার, দেখেনি?

অথবা ওরা বোধ হয় ভেবেছিল... না না, সেটা অসম্ভব। "এটা কি দানব-স্কুইডটার কাজ?" ওরা জিজ্ঞেস করেছিল। ভাঙাচোরা মাস্তুলের দড়িদড়া আর একপাশ তুবড়ে যাওয়া দেখে এটা অবশ্য করে ভেবে নেওয়া যায় যে স্কুইডটাই মাস্তুল ভাঙা আর স্কুনারটার উলটে যাওয়ার জন্য দায়ী।

দানব স্কুইডটা বোধ হয় ওর গুঁড়গুলো ছড়িয়ে মাস্তুল আঁকড়ে ধরে এক ঝটকায় স্কুনারটা উলটে দিয়েছিল।

.বেঞ্চটা বেশ গরম, দুপুরের রোদে বেশ সুখকর, কিন্তু তবুও, জল এই গরম ভাবটার ওপর দিয়ে টেক্কা দিতে পারেনি। ঠান্ডা আর গরম, চরম এই দুটো জিনিসের সঙ্গেই মানুষ আজীবন লড়াই করে গেল, কেবলমাত্র বুড়ো হবার পরই সোনালি ফসলটা হাসিল হল। যাকে বলে প্রজ্ঞা, কিন্তু সম্ভবত এটা একটা ক্রমশ ফুরিয়ে আসা শক্তি।

সবুজ খাঁড়িটার দৃশ্য দারুণ, একফালি সমুদ্র তীরভূমির মধ্যে ঢুকে এসেছে। প্রজাপতিদের নরম ছায়া, গোল গোল, সূর্যের মতো। ওগুলো সত্যিই প্রজাপতির পিছু পিছু ঘোরা সূর্যের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়, শুধু একটা উত্তপ্ত পাথরের দেওয়াল বরাবর আবছা মরীচিকা সরে সরে যায়। দেওয়ালের ওপরে একটা বেড়াল ঝিমোচ্ছে, ওর নাক থেকে খুব হালকা শিসের আওয়াজ আসছিল। মাঝে মাঝে ও মাথা তুলে, কান খাড়া করে, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ওর সতর্ক চোখদুটোকে ছোটো করে নিয়ে কী দেখছিল।

"আমি মাঝরাতে আসব। মেফিস্টো।"

"এই যে, শোনো। তোমরা বেড়ালেরা তো আবার ভবিষ্যৎ দেখতে পাও। রাতচরা। বলে তোমরা সবকিছুই দেখো আর জানো। ও কি সত্যিই রাত্তিরে আসবে? রাত্তিরে ওকে দেখতে পাবো কীভাবে? ওহো হো, আচ্ছা আচ্ছা, পূর্ণিমা তো, শেষমেশ সম্ভবত ওকে দেখতে পাব। যদি না গভীর সমুদ্রের তলা থেকে পাঠানো

টেলিগ্রামগুলো সব তড়িতের কণার জটলা হয়ে তারের মধ্যেই না হারিয়ে যায়। প্রশ্নটা ছিল জ্ঞানপিপাসাটা কোথায় থামে আর সর্বশক্তিমানের স্বপ্নটা কোথায় শুরু হয়। এই দ্যাখো বুড়ো হেনরি কী দারুণ আইস-টি নিয়ে আসছে, হাঁটু থেকে পা -টাও প্রায় ভাঁজ হয় না বেচারার। ধন্যবাদ বুড়ো খোকা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি কি অদৃষ্টে বিশ্বাস করো? ওরাই আমাকে 'ম্যারিয়েনু' কে দেখিয়ে দিয়েছে, জানো তো। ওটা এমন পরিশ্রমী জাহাজ, পাপুয়া নিউগিনি থেকে মালপত্র ফেরি করত আর গ্রেট বেরিয়ার রিফ থেকে সমুদ্র-শশা তুলে আনত।"

ওখান থেকে অস্ট্রেলিয়ার তটরেখা দেখা যায়।

স্কুনারটা অগভীর জলে উলটে পড়ে ছিল। তার মানে বিশাল স্কুইডটা আশেপাশেই আছে।

এক্কেবারে ওর কায়দা: রাত্তিরে যখন জাহাজের সবাই ঘুমন্ত, নজরদার লোকটা বিশাল স্কুইডের জ্বলজ্বলে প্রকাণ্ড শরীরটা দেখে চিৎকার করছিল। বেচারা প্রাণের ভয়ে মাস্তুল আঁকড়ে ধরে ঝুলে ছিল, উথালপাতাল ছিরানো মালপত্রের মতো।

সবসময় একইরকম: রাত্তির আর ছোটো জাহাজ... অথবা মাঝে মধ্যে ইয়ট।

পরপর এই নৈশকালীন আক্রমণ সারা পৃথিবী জুড়েই হচ্ছিল যদ্দিন না শেষমেশ এই বিশেষ জায়গাটাতে পৌঁছোয়। আর খবরের কাগজওয়ালারা চেঁচাচ্ছিল, "শোনো, শোনো! দানব স্কুইডটাকে দেখা গেছে!"

তো আমার কী করার আছে এতে? গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের মধ্যে ১১১৫-খানা নতুন প্রজাতি আছে আর চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পর সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

গ্রন্থাগার... নিস্তব্ধতা, অনেকগুলো হাতের এবং তার সঙ্গে বই-বাঁধানো চামড়ার সোঁদা গন্ধ।

সমুদ্রের ভিজে ভিজে ভাবটা প্রতিটা কোনায় ঢুকে গেছে। নোনা আর ভেজা ভেজা আবহাওয়ায় সমস্ত বই, কাগজপত্র, কেমন ফুলো ফুলো, পাতাগুলো ঢেউ খেলে গেছে।

আহ, হ্যাঁ মিলটন... "স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা ভালো!" ওই

লাইনটা এমন অসীম শয়তানি গর্বে ভরা, যেন, যেন মেফিস্টোরও হয়তো তাইই। যাই হোক, জানা আছে কি, একটা দানব-স্কুইড কতটা বাড়তে পারে, কী তার সীমা? আদৌ কোনো সীমা আছে, নাকি সীমাহীন সাগরের গভীরতার মতোই তার পরিমাপ? এটাকে জ্ঞানের লোভের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে: যত তুমি জানবে তত আগ্রাসী আর ক্ষমাহীন হয়ে উঠবে... তাই নয় কি?

শয়তান সবসময় একটা শর্ত আরোপ করে রাখে, আর সেটা হল যে বিদ্যা তুমি পাবে তার জন্য মূল্য চোকাতে হবে এবং ওরা দু'জনেই সেটা দিয়েছে, দেয়নি কি? উনি ওঁর কষ্ট দিয়ে আর জো তার ত্রাস দিয়ে।

নাকি এটা প্রতিশোধ? আর তাই যদি হয় তাহলে এত দীর্ঘ অপেক্ষার পর কেন, ও তো বহু আগে থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

...সূর্যের আলো জানালার রঙিন কাঁচ ভেদ করে এসে পড়েছিল, কত শতাব্দী আগের তৈরি জানালা। সূর্যের রশ্মি পড়ে ঘরটাকে জীবন্ত করে তুলেছে, রঙবেরঙের মাছেদের মতো রঙে, যেন প্রবালের ফাঁকে ফাঁকে তোতাপাখি বেঁধে রাখা আছে। কেবল এই বছরেই ধ্বংস হওয়া পালতোলা জাহাজ আর ইয়টের তালিকাটা এইরকম।

ভারত মহাসাগরঃ দ্য সাগা, দ্য শিপসিয়ার, দ্য ডেয়ার ডেভিল এবং দ্য কাটলফিশ।

প্রশান্ত মহাসাগরঃ দ্য জেমিনি, দ্য পার্ল, দ্য হিন্দু, দ্য ফুর এবং দ্য মেরিপোজ।

অতলান্তিক মহাসাগরঃ দ্য মোগল, দ্য আর্থার, দ্য ডেভি ক্রকেট, দ্য পিগি এবং দ্য অ্যাভেঞ্জার।

...সময়ের হাতে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া শয়ে শয়ে কিংবা হয়তো হাজারে হাজারে হলদে কাগজের স্তূপ, টেলিগ্রামের, মেফিস্টোর জীবনের যা কিছু জানা যায়, ওগুলোর মধ্যেই। কীভাবে ভাবনা, জ্ঞান আর কাজ একত্রিত হতে পারে। বরাত জোরে ছোট্ট জো সৈন্যদলের টেলিগ্রাফ অপারেটর ছিল। আর তারপরেই সমস্যাটা এসে আছড়ে পড়ল বা। ছারখার করে দিল; সারকোমা, ক্যান্সার। শিগগিরই ছেলেটা

শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে যেতে লাগল, বিরাট খাঁচা, বড়ো বড়ো হাত আর পা, শুকিয়ে আসা এইটুকু ছোট্ট মাথা। ও বলেছিল মৃত্যুর চেয়ে এইই ভালো।

টেলিগ্রাফের ব্যাপারে মেফিস্টো দারুণ দক্ষ ছিল: এই যে এখানে, ওর প্রথম বার্তাটা, কাগজটা প্রায় ধুলো হয়ে গেছে। কতগুলো ড্যাশ আর ডট, ডট আর ড্যাশ, আর এমনিই পরপর, এই হিজিবিজিটার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

'...আমি খুব দুর্বল বাবা, নড়তেই পারছি না প্রায়। আমি এখনো তোমার দেয়া ওষুধের প্রভাবে আছি। আমি একটা গুহায় বসে আছি, আর সারারাত, কেউ একটা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আগুনে জ্বলজ্বলে চোখে, তার চোখ এতটাই উজ্জ্বল যে একটা অদ্ভুত ভয়াল আকার বেরিয়ে আসছে। আমার ভয় করছে। মেফিস্টো।' (ওটাই ওর ছদ্মনাম হবার কথা ছিল। ও নিজেই এটা পছন্দ করেছিল।)

পেন্সিলে একটা মন্তব্য লেখা ছিল ওতে, 'অভিযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

কিছু মনে করিস না, খোকা, ভয়টা কিন্তু আমার ইদানীং জন্মেছিল। এই যে গোটা একটা লম্বা টেলিগ্রামের সারি, যার প্রত্যেকটার মধ্যে ভয় ঠাসা।

জুলাই ৬ '...আমি কত ছোটো আর পলকা। ওই আগুনচোখো জন্তুটার কী করেছি আমি?'

জুলাই ৭ '...দেখা গেল জন্তুটা আয়নায় প্রতিফলিত একটা প্রতিবিম্ব মাত্র, নিজেকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আয়নাটা এখানে রাখা হয়েছে। এই দেহটা আমার নিজস্ব নয়, সর্বক্ষণ সেটা মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে রেখেছে। এই দেহটা আমায় নিংড়ে নিয়েছে। আমি এর মধ্যে নড়তে চড়তে পারি না। এর মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছি আমি, ঠেসেঠুসে এরই ভেতর, পুরোটা। আমার কাছে এটা একেবারেই অপরিচিত, এমনটা আর কখনো কোনো কিছুই হতে পারে না। এর ভেতর আমার গলা আটকে আসছে, দমবন্ধ হয়ে আসছে...'

জুলাই ৮ '...বেশ ঠিক আছে, বাবা। দয়া করে ভেবো না, একদম ভেবো না। এটা আমারই সিদ্ধান্ত ছিল। আমি এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠব। আমার চারপাশে যে কী এক অন্য জগত! রাত্রে, সবটাই কালো আর জ্বলজ্বল করছে; আর দিনে পুরোটাই

আলোয় আলো। আর বিরামহীন গতি।'

জুলাই ১০ '... মাছ, মাছ, মাছ। সব্বাই আমার পেছনে লেগেছে। আমায় খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, অনুসরণ করে যাতে আমায় গিলে খেতে পারে। গপ করে খেয়ে নেবে। তাও এখানে থাকা আমার পক্ষে খুব শক্ত। আমি বড়ো দুর্বল আর থপথপে।'

জুলাই ২১ '...আজকে আমার জন্য একটা শুভদিন। মোটামুটি ভালোই লাগছে, প্রবালের ঝাড়ের মধ্যে আলোর খেলা অসাধারণ। একটু হাঁটতে যাচ্ছি।'

আগস্ট ১৮ '...আজ খুব বাঁচা বেঁচেছি। কোনোমতে পালিয়েছি। আমি এখনো ওই লোভী বিচ্ছিরি লুটেরাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, লম্বা ঝকঝকে দাঁতের সারি আমার দিকেই বাগানো, আর ওদের গোল গোল রাগী চোখ। আমায় ফিরিয়ে নাও। প্রচণ্ড ভয় লাগছে।'

আগস্ট ১৯ '... ফিরিয়ে নাও, বাবা।'

আগের সত্ত্বাটা মনে পড়ছিল ওঁর: বৈজ্ঞানিক সাফল্য ওঁকে খটখটে শুকনো করে তুলেছিল, আর উনি বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী আর নিজের বা অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় অত্যন্ত জেদি হয়ে উঠেছিলেন।

অতি সচেতনতা ওঁর হৃদয়টাকে শুকনো কাঠ কাঠ করে তুলেছিল, কেবল ওর জিজ্ঞাসু মনটাই পড়ে ছিল।

সেদিনটা ওঁর স্মৃতিতে দাগ কেটে বসে আছে। উনি পাথরের ওপরে বসেছিলেন, ঠিক যেখানে মোটা কেবলটা সমুদ্রে নামানো হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটায়, ভাবছিলেন ওটাকে কীভাবে ঢেকে রাখা যায়। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পাথরের ওপর জল বুড়বুড়ি কাটছিল, আর এসময় হঠাৎ করে উনি মেফিস্টোকে দেখতে পেয়েছিলেন। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "কোন সাহসে তুমি!"

মেফিস্টো গুটিগুটি ওঁর কাছে আসছিল, হাতগুলো বাড়িয়ে, ড্যাবড্যাব করে ওঁর দিকে চেয়ে, কালো ঠেলে আসা চোখদুটো সম্পূর্ণই দুশ্চিন্তায় বিভিন্ন দিকে ঘুরছিল। ওর মাথার চারপাশে কাটা দাগ বরাবর বড়ো বড়ো সেলাইয়ের দাগ।

লম্বা চ্যাটচেটে দেহটা যেটা জো-র আত্মা আর মগজ বহন করছে, সেটা ওঁর

মধ্যে ভয় আর বিতৃষ্ণা ছাড়া কিছুই জাগাল না। উনি পিছিয়ে এসেছিলেন, সাবধানেই; একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়... তখুনি ভেতর থেকে ওই বেগুনি রঙের রাক্ষসটার প্রতি একটা অসম্ভব রাগ উঠে এল।

আগস্ট ২০ '...আমার মনে হয়, আমি তোমায় বুঝতে পেরেছি বাবা, আর এটা আমায় ভীষণ দুঃখ দিয়েছে। আমি আগে কখনো তোমায় বুঝতে পারিনি, আর তোমার জন্য খুব গর্ব হত আমার। আমি তোমায় আর অনেকদিন বিরক্ত করব না, অনেক, অনেকদিন...'

তারপর সেই প্রথমবার অনেকদিনের নীরবতা।

সেপ্টেম্বর ২০ '...আমি অসুস্থ ছিলাম আর সপ্তাহ দু-এক কিছুই খেতে পারিনি। উপোস অবশ্য আমার জন্য ভালোই। আমার শক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। আমি বাইরে একদমই যাই না। জলে আলোর খেলা দেখেই বুঝতে পারি রাত থেকে কখন দিন। হল। দিনের বেলা জলটা সবজেটে, যত সন্ধের দিকে এগোয়, রঙটা গাঢ় হয়, পরপর রঙের বদল হতে থাকে, গাঢ় সবুজ, নীল, লাল, শেষমেশ পুরোপুরি কালো।'

সেপ্টেম্বর ২১ '...হেনরি আমার জন্য একটা বড়ো, সুস্বাদু ট্রাউট সুতো বেঁধে নামিয়ে দিয়েছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর দয়ালু মুখটা জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আমি খুউব চাইছিলাম জলের ওপরে উঠে আসি। মাছটা নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিলাম আর পুরোটাই খেয়ে ফেলেছিলাম। কাঁচা খাবার খেতে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, কিন্তু তবুও আপনা থেকেই মনে এল, 'এটা ভাজা নয় কেন?' পেট ভরে গিয়েছিল তাই খাবার পর ঘুমোতে গেলাম (এখন আমি বেশ আরামে ঘুমোই, আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই ঘুমোই, কিন্তু এই ঘুমটা অনেকটাই ঝিমুনি বা তন্দ্রার মতো।)। হঠাৎ করে জলের মধ্যে কিছু একটা সন্দেহজনক নড়াচড়া আমায় ছুঁয়ে দিল। দেখলাম, কয়েকটা ইল মাছ। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, পাখনাগুলো নড়ছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে পালাব ভাবলাম, কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। ইলগুলো বেশ। মোটাসোটা, হিলহিলে, আর

কুকুরের মতো বড়ো বড়ো দাঁত। তার ওপর সাংঘাতিক বিশ্রী গন্ধ। সারারাত ধরে আমি ওদের স্বপ্নে দেখলাম।'

সেপ্টেম্বর ২২ '...আমার আর কোনো পার্থিব স্বপ্ন নেই। মনে হয় আমার মগজ এই ক' দিন অজানা জগতে মানিয়ে নিতে নিতে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে, আর এখন কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী স্মৃতিনির্ভর হয়ে কাজ করতে পারছে। আমি তোমায় ভালোবাসি, মনে রেখো।'

তাহলে মানুষটির ভেতরে ও কী দেখেছিল? কেবলমাত্র বাবা নয়, ওর নিজের গর্ব করার মতো কেউ, 'বাবা, যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয়, আমি সমুদ্রে তোমার চোখ হয়ে উঠব।' নিজেকে বোঝাতে ও এটাই বলত বারবার, স্রেফ মরে যাওয়ার থেকে এমন জীবন কাটানো ঢের বেশি ভালো।

অস্ত্রোপচার ঠিকঠাক সাফল্য পাবেই এমন কোনো লক্ষণ ছিল নাঃ তখন আমার জানার কোনো উপায়ই ছিল না যে সমুদ্রের জল বা সামুদ্রিক খাদ্য দেহের মধ্যে প্রতিস্থাপিত কোষকে প্রত্যাখ্যান থেকে ঠেকাতে পারে।

সেপ্টেম্বর ২৫ '...আমি জানি তুমি মাকে ঘৃণা করতে। ওর মেয়েলি চাহিদা আর তোমার জ্ঞানপিপাসার মধ্যে বিবাদ লেগেই ছিল। আমি বিমর্ষ ছিলাম, তাই মায়ের কথা মনে করতাম, একটু ভালোলাগার জন্য। নিজেকে ছোট্ট ছেলে বলে ভেবে নিতাম, ভাবতাম হাফপ্যান্ট পড়ে চাকা নিয়ে খেলছি, সঙ্গে একটা কুকুর। খুব শক্ত ছিল এই ব্যাপারটা কারণ ছোটোখাটো এক-একটা জেলিফিশ চুপিসারে আমার কাছে চলে আসত। (আমাদের এলাকার জলে এদের অস্তিত্ব তুমি উপেক্ষা করেছিলে।)। সাংঘাতিকভাবে আমায় হুল ফুটিয়ে দিত ওরা। শেষমেশ আমি মায়ের মুখটা দেখতে পেতাম, ভেসে ভেসে। যাচ্ছে, কিন্তু মুখটার রঙ সবুজ।'

সেপ্টেম্বর ৩০ '...মাছেদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ আবিষ্কার করেছি। গতকাল কতগুলো সি-অ্যানিমোন দেখতে পেয়েছি যেগুলো আমাদের বাগানের বেগুনি-গোলাপি কারনেশন ফুলের মতো। আমি ওদের আমার গুহার কাছে পাথরের ওপর রেখে দিয়েছি আর সবচেয়ে বড়ো দু-খানা হাতে করে নিয়ে এসেছি।

আজ সকালে ইল মাছগুলো আবার এসেছিল, আর আমি ওদের চোখে সি-অ্যানিমোনগুলো ঠেসে ধরেছিলাম। ওরা অমনি গুটিয়ে গিয়ে পালিয়ে গেল। জীবন, যা হোক, সহনীয় হয়ে উঠছে।'

এপ্রিল **১১** '...আমার একটা পর্যবেক্ষণঃ এখানে সব্বাই সবাইকে খায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের খায় তাদের চেয়ে যেগুলো বড়ো, তারা যেমন ছোট্ট কাঁকড়া বা ছোটো ছোটো মাছ, এগুলোকে আবার খায় বড়ো প্রাণীরা। শেষে এদের খায় আরো বড়ো, বিশাল প্রাণীরা। বড়ো হাঁ আর ধারালো দাঁত থাকলেই খাবার জুটবে।'

এপ্রিল **১৮** 'আমি একটা তিমি-হাঙর দেখেছিলাম, যে ছোটো ছোটো কাঁকড়া আর প্ল্যাঙ্কটন খায়। একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, কিন্তু আমি ভয় পাইনি। ছোটো মুখের বিরাট প্রাণী এখানে তত পাত্তা-টাত্তা পায় না।'

বেচারা ছেলেটা! ও এখনও মজা করতে পারছে। আমি প্রতিদিন ওর শিকারের ব্যবস্থা করতাম। ও যা কিছু ধরত, একটা বয়ার সঙ্গে আটকানো তারের থলেতে এনে জমা করত।

এপ্রিল **২৯** 'আমায় কিছু রঙের তালিকা পাঠাবে, প্লিজ। নইলে সমুদ্রের গভীরে থাকা ছোটো ছোটো জীবন্ত প্রাণীগুলোর বর্ণনা দিতে ভুল করে ফেলতে পারি। আজ দুপুরে কেউ একজন একটা ম্যাকারেল সুতোয় ঝুলিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার জন্য, ভেবে পুরোটা গিলে নিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় কেউ একটা টান মারল আর একটা বড়ো বঁড়শি আমার মুখে আটকে গেল। আমি ধরা পড়েছিলাম। ব্যথা লাগছিল। যতটা শক্তি দিয়ে পারি আমি লড়াই করছিলাম, আশেপাশে যা কিছু পাই তাইই আঁকড়ে ধরে, কিন্তু নাহ, আমায় জল থেকে টেনে তুলে ফেলা হল। শেষমেশ আমি বুঝতে পারলাম, আমায় ঠিক কী করতে হবে। আমি মাছধরা সুতোটাকে পাথরের চারপাশে জড়িয়ে দিলাম আর হুকটাকে আমারই শরীরের একটুকরো মাংস-সহ ছাড়িয়ে নিলাম। সেই ক্ষত থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছিল। প্রথম যখন সেটা লক্ষ করি, বেশ একটা অস্বাভাবিক লেগেয়েছিল। আমি নিজেকেই খেয়ে ফেলতে চাইছিলাম। এর জন্য জেলেগুলোই দায়ী। আমি এর শোধ

তুলব। মেফিস্টো।'

মে ৩০ '...সারাটা দিন গুহার মধ্যে শুয়ে রইলাম, শুয়ে শুয়ে নিজের জীবনের কথাই ভাবছিলাম। শেষ অবধি সিদ্ধান্তে এলাম এই যে আমাকে আরও শক্তিশালী আর ধূর্ত হতে হবে। সবচেয়ে শক্তিশালী আর সবচেয়ে ধূর্তরাই যত চায় তত ভালো খাবার খেতে পারে আর আরামদায়ক গুহায় ঘুমোতে পারে। আমাকেও অমনি হতে হবে। এখানে খেলার যা নিয়মকানুন তাইই আমায় মানতে হবে।'

জুলাই ১ '...একটা স্কর্পিনা ধরেছি, তোমার কথামতো, কিন্তু ওটা আমাকে হুল ফুটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলছিল। আমার জন্য একটুও দুঃখ হয় না তোমার, বাবা? কিংবা হয়তো আমায় ঝেড়ে ফেলতে চাও... বলো তো, অস্ত্রোপচারের সময় আমার পুরোনো শরীরটা কি আমার পাশেই শোয়ানো ছিল? ওটা নিয়ে কী করলে তুমি? কখনো কখনো আমার মনে হয় ওটা কাছেপিঠেই কোথাও আছে আর একদিন দেখতেও পাব ওটাকে।'

জুলাই ৭ 'আজ, অসহ্য সব দৃশ্য মাথার ভেতরটা পুড়িয়ে দিচ্ছিল। শব্দেরা ভোঁ ভোঁ করছিল ভেতরে। সেসব শব্দ আর কোনোদিন উচ্চারণ করতে পারব না আমি।'

জুলাই ১৭ 'গতকাল আমায় প্রায় খেয়ে ফেলেছিল। আমি সাংঘাতিক ভয়ে কোনোমতে পালিয়ে আসি, পাথরের আড়ালে। কিছু একটা আমার মাথার ওপরে একঝলক দেখা গেল, চোয়াল হাঁ করা। ঠিক হাঙর নয়, তবে ওরকমই কিছু, এ-জিনিস তুমি কখনোই দেখতে পাবে না। অক্টোপাসের জন্য একটা কন্টেনার বরাত দাও। হাঃ হাঃ!'

জুলাই ১৮ '...আমি খুব একলা, বাবা। আমাকে ফিরিয়ে নাও আর সমুদ্রের জলভর্তি কোনো জালার মধ্যে রাখো, ওপরে, তোমার কাছে কাছে। শোচনীয় অবস্থা আমার, ভালো নেই মোটেই।'

'...কী শক্তিশালী আমি। আজই কাকভোরে, সাঁতার কাটছিলাম, বেশ জোরেই। জল কেটে কেটে একেবারে ওপরে উঠে আসছিলাম, আরও আরও দ্রুত। ম্যাকারেলগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল এক ঝাঁক, একটা রুপোলী রিবনের মতো।

আমি জল থেকে ছিটকে ওপরে উঠলাম, তোমাদের দমবন্ধ করা পৃথিবীতে, তারপর আবার সমুদ্রে এসে পড়লাম।

'জলের ছিটেয় আমার সারা দেহ ধুয়ে গেল। আমি যারপরনাই খুশি হলাম, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ টিকল না। আমি আমার গুহায় ফিরে সমস্ত কিছু নিয়েই ভাবতে বসলাম, আর আবার আমার খারাপ লাগতে থাকল...

'একটা ম্যাকারেল ধরে খেয়ে নিলাম। ভালোই খেতে, কিন্তু কাঁকড়া এর চেয়েও ভালো। কেবল ঝিনুক কাঁকড়ার চেয়েও সুস্বাদু। আমি এইভাবে ওগুলো শিকার করতে যাইঃ একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঝিনুকটার কাছে পৌঁছাই আর ওর খোলার ঢাকনাদুটো খুললেই তার মাঝখানে রেখে দিই। তারপর চারপাশে নজর রাখতে রাখতে একটু একটু করে ওর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাই।'

কে জানত পনেরো বছর পর খবরের কাগজের সাংবাদিকরা ওকে দানব স্কুইড বলে ডাকবে? সাংবাদিকদের তখন আমি সত্যি সত্যি ভয় পেতাম, কিন্তু এখন আমার ওদের জন্য অবজ্ঞা আর ঘৃণা ছাড়া কিছুই নেই।

"...আজকে আমি এক কিলোমিটার গভীর অবধি গিয়েছিলাম। বেশ কষ্টকর আর আতঙ্কের। এখানে এত ঘন অন্ধকার, যে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। কিন্তু এই অন্ধকার হাজার হাজার আলোয় উদ্ভাসিত, আমাকে রাতের শহরের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেলাম একটা স্পার্ম হোয়েল, সেই গভীর থেকে উঠে আসছে। একটা বিশাল স্কুইড ওটাকে কামড়ে দিল। স্কুইডটা, নাক-বোঁচা তিমিটার মুখের চারপাশে ঝিলমিল করছিল উজ্জ্বল বলয়ের মতো। উজ্জ্বল আর বুড়বুড়ি কাটা কিছু একটা এই ভয়ংকর অথচ সুন্দর জোড়ার চারপাশ ঘিরে, বা বলা চলে একেবারে সারা গায়ে লেপা ছিল। এই জিনিসটা অন্ধকারে ওদের দেহরেখাটা ঠিকঠাক বুঝতে সাহায্য করছিল। আমি আশা করছিলাম স্কুইডটা জিতবে।

'আমি একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে বেশ অনেকটা সময় সেখানে কাটালাম। ওখানে চারপাশে কয়েকটা তারামাছ আর কয়েক জোড়া সমুদ্র-শশা ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, শেষে একটা চ্যাপটা আঁশওয়ালা গিরগিটি দেখতে

পেলাম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আর অতিকষ্টে মাথাটা আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। সম্পূর্ণ অন্ধকার সত্ত্বেও আমি ওর ধীর নড়াচড়াটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং লক্ষ করলাম কীভাবে ও গভীর সামুদ্রিক উদ্ভিদ খুঁটে তুলছে আর একেবারে কোনো তাড়াহুড়ো না করে চিবোচ্ছে। ওটার মাথার ওপরে লাল রঙের চোখ। বুঝতে পারলাম, আমি দেখতে পাচ্ছি কারণ আমার অবলোহিত দৃষ্টিশক্তি। গিরগিটিটা আমাকে লক্ষ করেনি, যদিও ওটা আমার খুব কাছ দিয়েই গিয়েছিল। বারটনকে বোললা, আভাস দিও, ওর গভীর সমুদ্রের ছবিগুলো জীবনের সত্যের খুব কাছাকাছি।' (আমি বলেছিলাম, কিন্তু বারটন আমার কথা বিশ্বাস করেনি। পরে ওর ইয়টটা, যেটার ওপর আমার খুব লোভ ছিল্ু কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।)।

'...সাদাটে পাখনার ডলফিন ধরলাম। ওটা আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নানারকম শব্দ করতে লাগল। ঝাঁকের বাকিরা লুকিয়ে পড়ল। আমি এটাও খেয়াল করলাম, প্রথমদিকে ওর বিপদসংকেতটা অন্যরকম ছিল। পুরো ঝাঁকটা ওর দিকেই সাঁতরে আসছিল কিন্তু তারপর যেই আমি আমার হাত-পাগুলো পুরো টানটান করে দিলাম, ও অন্য স্বরে। আওয়াজ করতে লাগল, আর ঝাঁকটা ফিরে গেল। ও ওদের সতর্ক করে দিয়েছিল। ডলফিনরা কথা বলতে পারে কি পারে না সেটা প্রতিষ্ঠা করা না করায় আমার কিছু যায় আসে না, আমি ওর খুলিটা ফাটিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিলাম। খেয়েদেয়ে পেট ভরে গেলে আমি গুহায় ফিরে গেলাম আর অনেকক্ষণ ডলফিনের জীবন নিয়ে ভাবতে থাকলাম। ওরা অনেক উন্নতি করবে। ওরা বুদ্ধিমান, নিজেদের একটা ভাষা আছে, সামাজিক বিন্যাস আছে। মনে হয় ডলফিনরাই আগামী দিনের সমুদ্রের শাসনকর্তা।'

'...না, শক্তিমানেরা সমুদ্র শাসন করে, আর ডলফিনরা দুর্বল। সমুদ্র শাসন করে ক্রাকেনরা*। আমি মাঝেমধ্যে এক-একখানা দেখতে পাই, আর ভীষণ ভয়ে থাকি। যত জোরে পারি দুদ্দাড় করে ছুটে পালাই আর শেষকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুহার মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি।

'...মাঝে মাঝে মানুষজন দেখতে পাই। ওরা প্রায় স্থিরই থাকে। কেবল জলের ঢেউয়ে মাথার চুল অল্পস্বল্প নড়তে থাকে। ধীরে ধীরে গভীরে নেমে আসে ওরা, তোমার সঙ্গে এত মিল, বাবা, যে আমায় ভয় পাইয়ে দেয় আর অমনি আমি পালিয়ে যাই। বুঝতে পারি আমি ওদের মতো ওরকম স্থির হয়ে যেতে ভয় পাই। কিন্তু ওদের দেখে কৌতূহলও হয়, আমার লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে ওদের লক্ষ করি। ওরা অদ্ভুতরকম স্থির হয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় ওরা আমায় তাড়া করে ধরে ফেলবে। কিছু

একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার-স্যাপার করবে আমার ওপর, আর আমি ব্যথা পছন্দ করি না।

'আমি কী পছন্দ করি? আমি অনেক অনেক খেতে ভালোবাসি। আমি অন্য প্রাণীদের ধরে মেরে ফেলতে ভালোবাসি।'

'আমি কী পছন্দ করি না? যখন অন্য কেউ আমাকে খেতে চায়। আমি মানুষদের পছন্দ করি না, পাথরের মধ্যে দিয়ে ছিটকে ওঠা জল পছন্দ করি না। বিমূর্ত জ্ঞান যা আমায় একসময় আকর্ষণ করত তার বদলে মাথায় এখন ভাবনা কীভাবে আত্মরক্ষা করব। আর পেট ভরাব।

'... অদ্ভুত ধরনের কিছু মাছ দেখলাম্‌ কালো, বিরাট মাথা, ছোটো ছোটো করাতের মতো দাঁত বেরিয়ে আছে মুখ থেকে। মাছগুলো একঝাঁপটায় চলে গেল, ঘন। নীল। আমি কয়েকটা ধরলাম। আমার সমগ্র সত্ত্বা চিৎকার করে উঠল, খেও না ওদের, খেও না। কিন্তু আমার মগজ বলল, যে না খাওয়া অবধি আমি বুঝতে পারব না আমার প্রবৃত্তি ঠিক ছিল, নাকি ভুল।

'আমি আটটা মাছ ধরেছিলাম। আমি তোমায় ছ'টা দিয়েছি আর বাকি দুটো গিলে খেয়েছি। আর এখন আমি ওদের খেয়ে ফেলে সত্যিই পস্তাচ্ছি। ভেতরটা জ্বলছে। খুব শিগগির আমি মারা যাব, আর স্থির হয়ে পড়ে থাকব। বাঁচাও আমায়, বাবা!

(তারপর কতগুলো বোদা, বিষণ্ণ, যন্ত্রণার শব্দ লেখা)

'...বেঁচে উঠেছি। তুমি কোনোভাবেই কোনোদিন আমায় সাহায্য করোনি। আমাকে কেবল নিজের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আমি বাদে সবাইই আমার শত্রু। সারা দিনরাত গুহায় বসে বসে ক্ষমতার কথা ভাবি। কী দিয়ে তৈরি সেটা? শক্তি, দাঁত অথবা পাখনা? আমি একটা কাঁকড়া, একটা মাছ বা একটা অক্টোপাসের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমার মগজটা মানুষের আর সেটা শক্তিধর।

'ভেবে দেখেছি, তোমায় বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, বাবা।'

'আজ, আমি একটা বিশাল ক্রাকেন দেখেছি। ওটা খুব ধীরে ধীরে সাঁতার দিচ্ছিল আর সীমাহীন তার বিস্তার। কী চকচকে তার চোখ, কী বিরাট নখ, কী লম্বা আর মোটা ওর হাত! ও ছিল দৈত্যাকৃতি অপরূপ। ওরকম প্রকাণ্ড হয়ে ওঠা যে কতটা বিস্ময়কর।

'...আমি একেবারে তলদেশ অবধি ডুব দিয়েছি, কারণ তুমি বলেছিলে যেতে। আমি ধীরে ধীরে অনেকটা নীচে নেমেছি, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার, আমার হাত-পা আর সাইফনকে কাজে লাগিয়ে। শলা-চিংড়িগুলো আমার দিকে অনুপ্রভ রস ছুঁড়ে দিয়েছে।

'নীচে, আরও নীচে নেমে গিয়েছি আমি, একেবারে তলদেশে পৌঁছব বলে। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। চোখের সামনে ফুলঝুরি দেখছিলাম। নিঃশ্বাস নেওয়া ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছিল। আমার হাত দুর্বল হয়ে উঠছিল, প্রচণ্ড চাপে আমার শরীরটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। এক-একসময় মনে হচ্ছিল বিরাট একটা দাঁত -ছাড়া মাছ যেন আমায় চিবিয়ে চলেছে।

'আমার সারাটা শরীর আর্তনাদ করে উঠছিল, 'ফিরে চলো! তুমি এরপর শেষ হয়ে যাবে!' কিন্তু আমার মন বলছিল আর কিছুক্ষণ সহ্য করো, আর একটু, হয়তো এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেলব আমি যেটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। শেষ অবধি আমি সমুদ্রের নীচে পৌঁছলাম। এটা একেবারে নিথর নিঝুম প্রাণহীন জায়গা। কেবল কিছু জিনিস, অনেকটা বড়ো চাদরের মতো, অল্প অল্প নড়ছে। প্রাণীটা চ্যাপটা, কালো আর গায়ে আবছা সবুজ আলোর ছিটছিট।

‘বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শক্তির একটা অনুভূতি এই চাদরের মতো জিনিসটা থেকে বয়ে আসছিল।

‘ওটার পাশেই অদ্ভুত একটা ন-মুখো তারা। আমি ওটা পাকড়ে নিয়ে জলের ওপরে উঠতে শুরু করলাম। কালো রঙের প্রাণীটা আমায় তাড়া করল, যেন উড়ে এল।

‘আমি প্রাণপণে উপরের দিকে চললাম আর শিগগিরই জলের উপরে উঠে এলাম। দেহে আর শক্তি ছিল না, ওখানেই পড়ে রইলাম, আমার ওপর দিয়ে একের পর এক ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। না, আমায় কিছুই আক্রমণ করেনি।

‘খানিকটা বিশ্রাম নেবার পর আমি তোমার কাছে সাঁতরে এসেছিলাম। এবারে আমার প্রশ্নঃ এইরকম কিছু অখাদ্য জঞ্জালের জন্য আমার জীবন বিপন্ন করা কতটা যুক্তিযুক্ত?’

‘...আজ, আমার মাথায় যে চিন্তাটা এল সেটা জলের গভীরের স্রোতের মতোই শীতল। আমি সেসব বিষয়ে নীরব রইলাম। নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে গিয়ে এমন বিভোর ছিলাম যে গুহার মুখটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, ফলে তিনটে ইল মাছ সাঁতরে ভেতরে চলে এসেছিল। আমি ওদের মাথাগুলো খুঁড়িয়ে দিয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম।’

দু-বছর পরঃ ‘...আমি একটা নতুন গুহা খুঁজছি। আমি যেখানে খুশি সেখানেই ঘুমোতে পারি কেননা এই অঞ্চলে চারপাশের যত প্রাণী সবাই আমায় ভয় পায়। কিন্তু তবুও কেন শুধু শুধু ঝুঁকিটা নেব? সবসময় কোনো না কোনো উজবুক থাকেই যাদের মুখটা মগজের চেয়ে বড়ো। গুহার ভেতরটা আরামদায়ক আর নিরাপদ। আমি প্রায়। সবকিছুই খাই এবং বেশিরভাগ সময় খাবার কথা ভেবেই কাটাই। তোমার প্রয়োজনীয় মাছটা আমি আসার পথে খেয়ে ফেলেছি। আরও কিছু মাছ না ধরা অবধি তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু বলতেই হবে, ওগুলো খেতে খুব একটা ভালো ছিল না। ভালো কথা, তুমি কখনো সাঁতার কাটতে যাওনি কেন? আমি কত লোককে সমুদ্রতীরে দেখেছি স্নান করতে, কিন্তু তোমায় দেখিনি কখনো।’

'...আজকে একটা ভালো গুহা খুঁজে পেয়েছি। একদল অক্টোপাস থাকত ওটাতে। ওরা জায়গা ছেড়ে দিতে খুব একটা রাজি ছিল না। মাথাটা জলে ফুলিয়ে টসটসে করে আমার দিকে চেয়েছিল ওরা। আমি একটা কড ধরে ওদের দেখালাম। এইভাবে ক্রমে লোভ দেখিয়ে চালাকি করে ওদের বাইরে এনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম।

'...একটা কাজের মতো পাথর খুঁজে পেয়েছি, ওটাকে নিয়ে এসেছি, গুহার দরজা। হিসেবে ব্যবহার করব। তুমি মোটা মাথার কচ্ছপ নিয়ে আগ্রহী ছিলে। তাই বলছি। ওরা মোটেই খেতে খুব একটা ভালো নয়, কিন্তু যদি খেতেই হয় তো খেতে পারো। আজ, কয়েকটা বোকা লোক আমার জন্য কিছু জ্যান্ত টোপ নামিয়ে দিয়েছিল। একটা বঁড়শিতে ছিল দুটো ছোটো মাছ্‌ একটা টুনা, আরেকটা বাচ্চা উড়ুক্কু মাছ। রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি, সাঁতরে ওপরে উঠে এলাম, নৌকোটার একটা দিক ধরে উলটে দিলাম। এখন দুর্ভাগা জেলেটা আমার পাশেই চুপচাপ ভাসছে। আমি ওর ওপর একটা পাথর রেখে দিলাম যাতে ঢেউয়ে ভেসে চলে না যায়। এখন আমি ওকে নিয়ে করবটা কী? খেয়ে ফেলব?'

'...কোন সাহসে তুমি আমায় আদেশ করো! আমি ওকে খেয়েছি প্রতিশোধ নিতে যদিও ও খুবই শক্ত আর মোটেই ভালো খেতে ছিল না। গলায় আটকে গিয়েছিল প্রায়, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, শেষ অবধি আমি একটা উপায় বার করে নিই ঠিকই। তুমি বরং একটা ডাইভিং মুখোশ পরে এখানে এসে একবার দেখে যাও আমাকে। আমি অপেক্ষা করছি। মেফিস্টো।'

আরও তিন বছর কেটে গেলঃ

'...আমি প্রকাণ্ড আর ক্ষমাহীন। তার ওপর এখানকার সবার চেয়ে আমি অনেক বেশি চালাক। তুমি ভাবতেই পারবে না এখানে চারপাশে কী বোকাদের দল! একটা উদাহরণ দিইঃ চারটে বিশাল স্কুইড একটা স্পার্ম তিমিকে আক্রমণ করল। প্রথমটা ওর মাথাটা পেঁচিয়ে ধরল, আর বাকি তিনটে তিমিটাকে মারার আগেই ওটাকে নিয়েই নিজেদের মধ্যে মারপিট করতে থাকল। তিমিটা জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে

প্রথম আক্রমণকারীটাকে আগে খেয়ে ফেলল, তারপর বাকি যে তিনটে লড়াই করছিল সেদিকে নজর দিল। ওদের মধ্যে একটা আবার তিমিটাকে আক্রমণ করল, বাকি দুটো নিজেদের মধ্যে মারপিট জারি রাখল। ওদের গুঁড়ের টুকরো-টাকরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল, বোকার হদ্দগুলো! ভয়। পেয়ো না, আমি মানুষ খাই না। আমি ডলফিন আর বাচ্চা স্পার্ম তিমি খাই।'

'...তুমি আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চেয়েছঃ আমি নতুন প্রজাতির মাছ ধরে দেব তোমার জন্য আর তুমি আমায় খাওয়াবে। ভুলে যাও! আমি কারো বশংবদ নই। এখন আমাকে তোমার প্রয়োজন। কিন্তু ভবিষ্যতে কী ঘটবে কে বলতে পারে? তুমি আমায় ঈর্ষা করো, আমার বুদ্ধি আর শক্তিকেও, আমাকে বিষ দিতে চাও তুমি। আমি তোমাকে বা অন্য কাউকেই আর বিশ্বাস করি না। আমি একা, একাকী। একাকিত্বই শক্তি।

'...গতকাল আমার প্রথম পূর্ণবয়স্ক স্পার্ম তিমি মেরেছি আমি। আমি একটা বিরাট স্কুইডের অপেক্ষায় ছিলাম ওই মাংসের পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে ধরার জন্য, তারপর চুপিসাড়ে গিয়ে আমি ওটার খুলিটা ফাটিয়ে দিলাম। বিরাট স্কুইডটা এরপর আমায়। আক্রমণ করল, ফলে ওটাকেও মারতে হল।

'...এই জলভূমিতে আমি সবচেয়ে বড়ো আর শক্তিশালী প্রাণী। কাউকে ভয় করি না আমি। এবারে আমি আমার শক্তি পরীক্ষা করব আরও কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষের সঙ্গে, মানুষ। গতকাল একটা ইয়ট দেখতে পেয়েছি। ঠিকঠাক হিসেব করে নিয়ে, ওটার ডানদিক দিয়ে গিয়ে ধরেছি, ধরে আমার সবখানি শক্তি দিয়ে টেনে ওটাকে উলটে দিয়েছি। তারপর একেবারে সমুদ্রের তলায় শুয়ে শুয়ে লক্ষ করলাম হাঙরেরা নাবিকগুলোর দ্রুত গতি করে দিল। কুড়িজনমতো তড়িঘড়ি সাতাঁর কেটে উঠে এসেছিল, তাদের লম্বা ছায়া নিয়ে, আমি জলের তলায় ডুবোপাহাড়ের ওপর শুয়ে দেখছিলাম কী ঘটছে। আমি বিশাল, অবিশ্বাস্যরকম অসাধারণ এবং চরম নিষ্ঠুর। পরেরবার একটা। বড়ো জাহাজকে উলটে দেবার চেষ্টা করব।'

'...একই কাজ করেছি জাহাজটার সঙ্গে। এটার নাম সেইন্ট অ্যান। আমি জানি আরও বহু বহু বছর ধরে আমি বাড়তেই থাকব। এখন আমি জানি, আমি নিজেই একটা ক্রাকেন। আমি ক্রমশ শক্তিশালী হব। ইতিমধ্যেই আমি বুদ্ধিমান। মহাসমুদ্রের গভীরে আমিই ভয়ের কারণ। আমার বিস্তীর্ণ বিশাল ঠান্ডা সাম্রাজ্য আমিই শাসন করব। আমি চিরকাল বেঁচে থাকব আর ত্রাসের সঞ্চার করব। যে আমার বশ্যতা স্বীকার করবে তার প্রতি নির্লিপ্ত থাকব আর শত্রুদের জন্যে থাকব ক্ষমাহীন। সব্বার মনের মধ্যে প্রবল ভয় ঢুকিয়ে দেব, মহাসমুদ্র আমিই শাসন করব আমার উন্নত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, আমার শারীরিক শক্তি দিয়ে আর আমার আদিম ধূর্ততা দিয়ে খেয়ে ফেলা ভালো, কিন্তু অন্যের মনের ভেতর ত্রাসের সঞ্চার করে দেওয়া আরও ভালো।'

'একটা অক্টোপাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, বিশাল আকারের, প্রায় দুই টন ওজন হবে। আমাকে দেখেই ব্যাটা ফ্যাকাসে মেরে গেল আর ভান করল যে মরে গেছে। ছেড়ে দিলাম ওকে। যাই হোক, ওদের তো বশবর্তী হওয়া শেখাতে হবে! আমি জেলেদের একটা নৌকোর দিকে সাঁতরে গেলাম। আমায় দেখে ওদের মুখ রক্তশূন্য, ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল, আমি দয়া করে ওদের ছেড়ে দিলাম।'

'...আজ একটা ক্রাকেন দেখেছি, সীমাহীন তার দৈর্ঘ্য আর শক্তি। তবে ওটা নির্ঘাত একটা বোকা প্রাণী ছিল। বললাম, 'ছিল', কারণ বুরবকটা আর নেই। আমি ওর মাথাটা

দু-টুকরো করে দিয়েছি। এখন আমি ওর জায়গায়, সর্বোচ্চ অবস্থানে বসে আছি আর আরও বড়ো হয়ে উঠছি, আরও বড়ো।'

'...আমি নিজেই এক বিভীষিকা, সমুদ্রের আতঙ্ক। জলের ওপরে উঠে এলে গোটা সমুদ্র তটস্থ হয়ে ওঠে। জীবন্ত যা কিছু তক্ষুনি লুকিয়ে পড়ে। এমনকি তোমরাও, মানুষেরা, আমার শক্তির কাছে মাথা নামিয়ে নিয়েছ।'

'...আমি আমার নিজের রাজত্বে ফিরে যাচ্ছি, নিঃসঙ্গ এবং সম্পূর্ণ শব্দহীন। বিদায় দু-পেয়ে তুচ্ছ মানুষ, কখনো তুমি আমার বাবা ছিলে। মেফিস্টো।'

...সোনার রঙ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। উপসাগরের জলে প্ল্যাঙ্কটন ভর্তি থাকায় অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে। কালো জলের গভীরতায় ওপর থেকে নামানো কেবলের। তারের গা হালকা প্রতিভা ছড়িয়ে রেখেছে। এই তারটা গভীর জলের কত না রহস্য প্রকাশ করেছে, বোধ হয় প্রায় সবটাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটা হল মেফিস্টো নিজেই।

সম্ভবত ও এখন প্রকাণ্ড চেহারার। কারো কোনো ধারণাই নেই, এই বয়েসে একটা দানব স্কুইড কত বড়ো হতে পারে।

এরকমটা বলা যেতে পারে, মেফিস্টো ছিল সাগরের গভীরে ছেড়ে দেওয়া তার বাবার অহমিকা। না, বরং সে ছিল বিজ্ঞানের অহমিকা।

সেই সাগরের মধ্যে তার লোভাতুর চোখ ছিল মেফিস্টো, তার খুঁজে বেড়ানো হাত সাগরের গভীরের দূরবর্তী যত আনাচ-কানাচে পৌঁছে যেত। তারপর আসবে নম্র ভদ্র জো-এর কথা, মৃত্যু যাকে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল একই সঙ্গে বাগানের এককোণে ছোট্ট কবরের নীচে শুয়ে আবার এই প্রকাণ্ড স্কুইডটার দেহের মধ্যেও থাকা।

"দানব স্কুইড, আর আমি তার বাবা। অদ্ভুত পাগলের প্রলাপ। এর মানে তো একটা রকেট, একটা গাড়ি, একটা জাহাজ বা একটা বিদ্যুৎচমককে ছেলে হিসেবে দেখার মতো।"

"কফি, হেনরি!"

আহ এই যে কফি, গরম এবং সুগন্ধি। কফি! সুখের সুঘ্রাণ আর তার সঙ্গে দুঃখের কামড়, ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে শুকনো পাতার তিতকুটে স্বাদ।

"আমি বেরিয়ে পড়েছি, মেফিস্টো।"

...কী যে স্যাঁতসেতে রাস্তা, ভেজা পাতাগুলো এসে গালে এসে লাগছে, ঠান্ডা ভেজা হাতের মতো। সমুদ্রের গভীরে জল শুষে নেওয়া শুড়ের মতো আমায় স্পর্শ করছে। যেন একেবারে তলাকার বালিতে চুপচাপ শুয়ে, নরম সোনালি বালিতে। আর একটা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি, যারা রাস্তাগুলো ভালোভাবে চেনে তাদের কাছে

অবশ্য রেলিংটা বাহুল্য।

চাঁদের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। আমি কি কল্পনা করেছিলাম মেফিস্টো একটা দানব হয়ে উঠবে?

স্যর রাদারফোর্ড কি কখনো গোড়াতে হাইড্রোজেন বোমার কথা ভাবতে পেরেছিলেন?

...কালো জলটা নড়ে উঠল। চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল তাতে। একটা তেলতেলে চকচকে ভাব ভেসে উঠল জলের ওপর। সমুদ্রে এখনো অগণিত রহস্য এতরকম যে সমস্ত আবিষ্কার করে ফেলাটা অসম্ভব ছিল।

আর ওই সমস্ত রহস্যই এসেছে আশা আর আতঙ্ক বহন করে। ওঁর হাত কাঁপছিল, বুকটা ধকধক করছিল। চারপাশের সবকিছুই কাঁপছিল। বিদায় হেনরি। কফিটা চমৎকার ছিল।

বিদায়, আমার সম্পদ এবং ওরই উপহার দেওয়া অপরিমিত স্বাধীনতা। সমস্ত কিছুর জন্য তোমায় ধন্যবাদ পিতা! তুমি খুব দয়ালু আর ভালো ব্যবসায়ী।

"মেফিস্টো, আমি অপেক্ষা করছি!"

শব্দটা জলের ওপরটা ভেদ করে এক মুহূর্ত প্রতিফলিত হল, তারপর সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে গেল। সমুদ্রটা শান্ত। কাঁধ ঝুঁকে আসা বুড়ো মানুষটা জলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। উনি ভাবতে শুরু করেছিলেন কিছুই ঘটবে না, কিছুই নেই কোথাও। খুব চিন্তায় তাঁর হাই উঠতে শুরু করেছিল আর নিশ্চিত হয়ে পড়ছিলেন যে পরদিনটা নিশ্চয়ই গরম হবে। এর ফলে উনি আচমকা পরিবর্তনটা খেয়ালই করেননি, আর যখন খেয়াল করলেন, ভয়ে জমে গেলেন, হাপরের মতো বুক ওঠানামা করছিল, উনি বুকে হাত চাপা দিয়ে বসলেন।

জলটা শান্তই ছিল এতক্ষণ, কিন্তু জলের তলায় যা ঘটে চলেছিল তাতে জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। প্রায় বোঝা যায় না এমন সামান্য নড়াচড়ায় চাঁদের আলো ছিতরে যাচ্ছিল।

জলে প্রতিফলিত মিটমিটে আলোগুলোর নড়াচড়া ক্রমশ দ্রুত হয়ে উঠছিল।

চকচকে বাদামি রঙের উড়ুক্কু মাছ এদিক ওদিক ছিটকে যাচ্ছিল, জেলে-নৌকাগুলোও অদৃশ্য।

হঠাৎ সমুদ্রটা ফুলে ফেঁপে, প্রবলভাবে ফুঁসে উঠল, জলের ওপরের ফেনা ছিটকাচ্ছিল চারদিকে। শুড়গুলো ঝলসে উঠল, পাড়ের দিকেই গড়িয়ে আসছিল তারা। অসংখ্য শুড় পাক দিয়ে দিয়ে টানটান হয়ে উঠছিল, যেন জঙ্গলের গাছপালা।

শুড়গুলো পাইনগাছগুলো অবধি পৌঁছে সেগুলোকে পেঁচিয়ে ধরল। গাছের গুঁড়িগুলো মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। ঘড়ঘড় আওয়াজ করে পাথরগুলো গড়াচ্ছিল। পাশ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে স্কুইডের বিশাল কালো রঙের দেহটা জেগে উঠল, যেন বহুদিন আগে ডুবে যাওয়া কোনো জাহাজ।

বৃদ্ধ লোকটা দু-হাতে বুক চেপে তাঁর জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো ধারালো কিছু তার বুকে ফুড়ে গিয়েছিল। ব্যথায় দম আটকে আসছিল তার। একেবারেই নড়তে পারছিলেন না লোকটা, এমনকি যখন পাইনগাছের চেয়ে মোটা একটা বিশাল শুড় নেমে এল ওঁর ওপরে তখনো না। চোষকগুলো পাথর, পাটাতন, নৌকো যা পেল তার পথের সামনে, সমস্তই পাকড়ে ধরল। আর একটা চোষক মেফিস্টোর বাবাকেও ধরল, যেন ও-ও আরেকটা ছোটো পাথর। জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে চারদিকে ঢেউ তুলে মেফিস্টো গভীর জলে ফিরে গেল।

...সমুদ্রের পাড়ে আলোর মশাল আর মানুষের বেঁটে বেঁটে আবছায়া দেখা যাচ্ছিল। ওদের অস্ফুট আর্তনাদ জলের ওপর মিলিয়ে গেল।

দেউলিয়া গ্রহ

মহাকাশযানের জানালার হালকা আলোজ্বলা পর্দার ভেতর দিয়ে জিনাইটদের শহরটাকে আরও বেশি করুণ লাগছে। বিশেষ করে ওর পাহাড়তলি এলাকাটা। সেখানে না আছে হাজারো পিলারওয়ালা কোনো মন্দির, না আছে লাইলাক রঙের চৌকো পাথরে বাঁধানো পথ।

বাজারটা এখানেই, শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকায়। চারদিকে শুধু ঝুড়ি আর মাদুর, মাদুর আর ঝুড়ি! বলতে গেলে পথের ধুলোবালির ওপরেই কাঁচা বা আধসেদ্ধ খাবারদাবার স্তূপাকৃতি করে রাখা আছে, সবাই হাতে করে তুলে নিচ্ছে। ফল, শাকসবজি, মাছ বিক্রি হয়ে খদ্দেরের ঝুড়িতে ঢুকে যাচ্ছে আবার কখনো কখনো দরদস্তুরে না পোষালে দোকানদারের কাছেই পড়ে থাকছে। বিকট অঙ্গভঙ্গি, বাকবিতণ্ডা আর সর্বত্র জঘন্য নোংরা...

কম্যান্ডার খুঁতখুঁতে মানুষ। তার জ কুঁচকে গেল। এত জায়গা থাকতে যানের লোকজন কিনা শেষ অবধি এই যাচ্ছেতাই বাজারটাতেই গেল! পর্দায় দেখা যাচ্ছে। জিনাইটরা এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কোনজন জিনাইটের ছদ্মবেশে আসলে তার লজিটেনিয়ান বাহিনীর নিরীক্ষক তা বোঝা সত্যিই শক্ত। তবে হ্যাঁ, তারা ওখানেই আছে।

কম্যান্ডার পর্দার দিকে এগোল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সাদা পোশাক পরা মেয়েটার দিকে। সে কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে চলাফেরা করছে। অন্যদের থেকে অনেক আস্তে হাঁটছে। কেউ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ বা তার একেবারে সামনে পড়ে যাচ্ছে। তবে যে-ই একবার তাকে দেখছে সে দ্বিতীয়বার তার মুখের দিকে না তাকিয়ে পারছে না। যেন আজব, আশ্চর্য কিছু একটা দেখছে। ব্যাপারটা কী? আর দশটা জিনাইট মহিলাদের সঙ্গে এর তফাতটা কোথায়?

আজ সকাল থেকেই মনিটরের কাজ পনেরো কি কুড়ি পা দূর থেকে মেয়েটার ওপর নজর রাখা। মনিটরের পরনে লম্বা ঝুলের ধূসর রঙের পোশাক, তার ঘন দাড়ি, হাতের মেষপালকদের মতো মুখ বাঁকানো লাঠি, এর কোনোটাই জিনাইটদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তরুণীটি তার দিকে মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছিল আর তাতে সে মাথা এমনভাবে নাড়ছিল যেন মনে হচ্ছিল যে সে পাথুরে পথে হোঁচট খাওয়ার ভয় পাচ্ছে। আসলে এটা সবকিছু যে ঠিকঠাক চলছে তারই ইঙ্গিত।

পথচলতি লোকজন অবশ্য তরুণীটির দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়েই যাচ্ছিল, যদিও ও তা লক্ষ করছিল বলে মনে হয় না। খানিক বাদে বেড়া দিয়ে ঘেরা বাজারে তরুণীটি ঢুকে এল। নিজের টিউনিকটা উঁচু করে তুলে লাল ফলভর্তি একটা ঝুড়ির পাশে সন্তর্পণে পা ফেলল। আর ঠিক তখনই একটা বুড়ো লোক তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এল ওর দিকে। ছোটো ছোটো পদক্ষেপে। ক্ষিপ্র গতিতে। বুড়ো লোকটার দাড়ি কমলা রঙে রাঙানো, খুব সম্ভব সে মিনিট খানেক আগেই অর্থ বিনিময়কারীর ছাউনিতে দাঁড়িয়ে ছিল। শুকনো মুখে। কুঁজো হয়ে সে তরুণীটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সম্ভবত ওকে গয়নাগাঁটি দেখাচ্ছে। বিক্রির জন্যে।

তরুণীটি কি কিনবে কিছু? নাহ, বুড়োটা বোধ হয় খেলো গয়নাগুলো ওকে এমনিই দিয়ে দিতে চাইছে। আর তারপর হঠাৎ তার হাত ধরে টান দিয়ে সে একদিকে ইশারা করল। ঢাকা দেওয়া জঞ্জাল পড়ে রয়েছে সেদিকটায়।

তরুণীটি মাথা নেড়ে আপত্তি করছে। লোকটা যে ভাষায় কথা বলছে তা সে ভালোভাবে জানে না বলেই বোধ হয়। তবে ওর এহেন অনিশ্চিত হাবভাব মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। ওর নির্দেশক, সাইকম তো জোর দিয়ে বলেছিল যে রাস্তাঘাটে, বাজারে, বন্দরে এমন অনেক লোকের সংস্পর্শে আসা সম্ভব যারা শহরের বহুল প্রচলিত সাধারণ ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও কথা বলে।

বুড়োটা তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে এবারে। নাহ। এবার ওর মনিটরের হস্তক্ষেপের দরকার। সে যেন অন্ধ, চোখে দেখতেই পায় না এমন ভঙ্গিতে মনিটর ওদের কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ কমলা রঙের দাড়িওয়ালা লোকটার গায়ে

এত জোরে ধাক্কা মারল যে সে হুমড়ি খেয়ে পড়েই গেল। তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে যতক্ষণে সে নিজেকে সামলাচ্ছে ততক্ষণে তরুণী বেড়ার ফাঁক গলে তার নাগালের বাইরে বেরিয়ে গেছে।

এখন এটাও একটা প্রশ্ন যে বাজারে এত মহিলার মধ্যে কমলা দাড়িওলা লোকটা এই তরুণীর দিকেই বা আকৃষ্ট হল কেন? কেনই বা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল?

জিনাইটদের চেহারা, জীবনযাপন, অভ্যেস ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘদিন মন দিয়ে পড়াশোনা করার পরেই সাইকম তরুণীটির চেহারা গড়ে তুলেছিল। কম্যান্ডার নিজেও তার খুঁটিনাটি পরখ করেছে এবং সে একটা ভুলও বের করতে পারেনি। তাহলে পথচলতি লোকজন সবাই মেয়েটাকে ওভাবে বিশেষ চোখে দেখছিলই বা কেন আর কেনই বা কমলা দাড়িওলা বুড়ো লোকটা তার হাত ধরে টানাটানি জুড়ল ওভাবে? ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখা দরকার এবারে।

পর্দার কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাল টিপল কম্যান্ডার। "সাতাশ নম্বর, এক্ষুনি মহাকাশযানে ফিরে এসো।" আদেশটা কম্যান্ডার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটো উড়ন্ত প্রাণীর মতো দেখতে একটা ড্রোন তরুণীর মাথার ওপরে সোজা নেমে এসে বার বার ওকে মহাকাশযানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশটা শুনিয়ে যেতে লাগল।

মেয়েটা তার চলা থামিয়ে দিল এবার। তারপর আচমকাই উলটো মুখে ঘুরে শহরতলির দিকে হেঁটে গেল চুপচাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা একটা টিলার গায়ে পৌঁছে গেল সে। জায়গাটা নির্জন। আশেপাশে একজন জিনাইটকেও দেখতে পাওয়া যায় না। এইবার, ভালো করে চারদিক একবার দেখে নিয়ে তরুণীটি তার উড্ডয়ন যন্ত্রটা চালু করে দিল।

কম্যান্ডার স্বস্তিতে চোখদুটো বন্ধ করে ফেললেন।

"তোমার হাতদুটো দেখি!"

তরুণীটি কম্যান্ডারের সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে কনুইদুটো গায়ের সঙ্গে

ঠেকিয়ে হাতদুটো ওপরে তুলল। হাতের তেলোদুটো সামনে সোজা করা। ওই ভঙ্গিতেই একেবারে মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল সে। শুধু মাথাটা পেছনে অল্প হেলে রইল, যেন ওর চকচকে কালো চুলের বড়ো খোঁপাটার ভারেই।

কম্যান্ডার ওর হাতদুটো ধরে চোখের কাছে নিয়ে এসে এপাশ ওপাশ থেকে ভালো করে দেখল। সবকিছু তো ঠিকই আছে। আঙুলের লম্বা লম্বা নখ, পাতলা চামড়ার নীচে দেখা যাওয়া শিরা-উপশিরা, চামড়ার ভাঁজের বিচিত্র কারিকুরি, যেন গোলাপি মার্বেলের ওপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফাটল।

সবকিছু ঠিক আছে বলেই তো মনে হল! আর যদিও বা সামান্য কিছু গোলমাল থেকে থাকে তা এক্ষুনি চোখে পড়ছে না।

কম্যান্ডার তরুণীটির হাতদুটো ছেড়ে দিল, সে দুটো ওর শরীরের দু-পাশে শিথিলভাবে ঝুলতে লাগল।

"তিন পা হাঁটো।"

তরুণীটি মাথা তুলে সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে দেখাল।

"এবার আমার দিকে ঘোরো। পাশ ফেরো।"

তরুণীটি ঘুরল।

"দেয়ালের দিকে যাও, আবার ফিরে এসো। আস্তে আস্তে।"

"এবার আর একটু তাড়াতাড়ি।"

"থামো। হাঁটো। থামো। আবার হাঁটো। সামনে এগিয়ে এসো, পিছু হটো।" কম্যান্ডারের নির্দেশ দেওয়া চলতেই থাকল।

"মাথার অবস্থানটা একটু কেমন যেন..." হঠাৎ বলে উঠল কম্যান্ডার।

তরুণীটি তাড়াতাড়ি মাথাটা উঁচিয়ে তুলল।

"হুম। তাহলে এখানেই কিছু গোলমাল আছে।"

"না।" তরুণীটি উত্তর দিল।

"তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?"

"জানি না। বলতেও পারব না। কিন্তু আমার মনে হয় গোলমাল এখানে নয়।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল কম্যান্ডার, তারপর হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়ল, লম্বা লম্বা পা ফেলে তরুণীটির কাছে এল। সাবধানে তরুণীটির কাঁধের কাছে লাগানো পোশাকের আংটাদুটো আর কোমরের পিন খুলে ফেলল। সাবধানে করার কারণ এগুলো জাদুঘরে রাখার মতোই খাঁটি জিনিস। একেবারেই অথেনটিক জিনাইট জিনিস। কোমরের পিনটা খুলে নিতেই আকাশি বর্ডার দেওয়া সাদা রঙের টিউনিকটা মেঝের ওপর নিঃশব্দে পড়ে গেল।

সাবধানে, একটা একটা করে, যেন ওজন করছে এমনিভাবে সন্তর্পণে তার গায়ের ব্রোঞ্জের গয়নাগুলো খুলে নিল কম্যান্ডার, তারপর সেগুলো সাবধানে টেবিলের ওপরে রাখল। সাদা টিউনিকটা তুলে নিয়ে সে ইন্টারকমের কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে এসে বলল, "সেন্ট্রাল ডিপোসিটরি, জিনাইটদের খাঁটি কাপড়ের কিছু নমুনা আমাকে পাঠাও।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালে লাগানো অনুভূমিক এলিভেটরের ছোট্ট দরজাটা খুলে গেল আর একটা প্যাকেট নিয়ে ধূসর রঙের কনভেয়ার বেল্ট বেরিয়ে এল। প্যাকেটের ভেতরে নানান রঙের কাপড়ের চৌকো চৌকো টুকরো।

এবারে দরজা বন্ধ করে কম্যান্ডার আরও একবার তরুণীটিকে ভালো করে পরীক্ষা করল। তার চেয়ার থেকে মাত্র তিন পা দুরে মেয়েটা দাঁড়িয়ে। ওর পায়ে শুধু কাঠের চপ্পল, তাতে একগাদা সাদা লেস জড়াজড়ি হয়ে রয়েছে। মাথা পেছনে সামান্য হেলানো আর চোখ আগের মতোই আধবোজা। কাঠের চপ্পলগুলোকে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ ওগুলোও ব্রোঞ্জের ওই গয়নাগুলোর মতোই খাঁটি।

কম্যান্ডার চেয়ারে বসে পড়ে কাপড়ের নমুনার প্যাকেটটা খুলল এবার। তার যদি ক্লান্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র অধিকার থাকত তাহলে সে স্বীকার করত যে সে চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত।

বার বার সে ব্যর্থই হচ্ছে। সে ব্যর্থতা কখনো ছোটো, কখনো-বা বড় আকারের, কিন্তু ব্যর্থতার ধারাবাহিকতাটা একই রয়ে যাচ্ছে। তার নেতৃত্বে একটা অভিযানও আজ অবধি সাফল্যের মুখ দেখেনি। এখনকার এই গোলমালটার কথাই ধরা যাক।

সাতাশ নম্বর এক নতুন শিক্ষানবিশ। এই ওর প্রথম অভিযান। আর সেই প্রথম অভিযানেই ওকে এই জিনাইট শহরের আদিম বাসিন্দারা ওকে শত ছদ্মবেশ সত্ত্বেও অন্যরকম বলে চিনে। ফেলল, অথচ তার কারণ কম্যান্ডারের কাছে এখনো স্পষ্ট নয়।

সাতাশ নম্বর কোনো জিনাইট জন্তুর ছদ্মবেশ নিলে সেটা যে অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হত সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একশো চল্লিশ তো একটা ছোটো, কালোকোলো জন্তুর চেহারা নিয়ে দিব্যি ভালোই কাজকর্ম করছে। জিনাইটরা যখন এদিক ওদিক কোথাও যায় বা দূরেও যায় তখন অনেক সময়েই তাদের সঙ্গে এই জাতের পুষ্যি একখানা থাকে।

এই সাতাশ নম্বর মেয়েটা এখনো কাঁচা। সেকথা মাথায় রেখে ওকে এরকমই কোনো জন্তুর চেহারা নেবার পরামর্শ দেয়া উচিত ছিল কম্যান্ডারের। হ্যাঁ, এতে তার পক্ষে সবকিছু ভালোভাবে দেখাশোনা করার সুযোগ কিছুটা হয়তো কমত ঠিকই। জন্তুদের তো আর এখানে সব জায়েগায় যাবার অধিকার নেই! কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু যেত আসত না। কারণ দরকারি সব কিছুরই ছবি দূর-নিয়ন্ত্রিত ড্রোনগুলো তো তুলছেই।

এই নজরদার ড্রোনগুলো জিয়া গ্রহটার জন্যেই বিশেষভাবে তৈরি। এখানকার ছোটো ছোটো উড়ুক্কু প্রাণীদের মতো করে গড়া হয়েছে। কোনোটা কালো, কোনোটা গাঢ় ধূসর। বেশ চড়া একটা গুনগুন শব্দ তুলে ওড়ে। গোটা শহরের ওপর দিয়ে চক্কর কাটতে থাকে এরা সবসময়। কখনো বা বাড়িঘরের ছাদে বা গাছের ডালপালার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে। নজরদারির সীমার মধ্যে যা কিছু পড়ে তার সব খবর অনবরত মহাকাশযানে পাঠায়। মহাকাশযানে রাখা এদের নিয়ন্ত্রক কনসোল আবার তথ্যগুলোকে একত্র করে ভ্রাম্যমাণ রিলে স্টেশনগুলোতে পাঠিয়ে দেয়।

সাতাশ নম্বরের স্থির হয়ে থাকা জিনাইট শরীরটার দিকে আরেকবার দেখে নিয়ে কম্যান্ডার ইন্টারকমের থার্মাল সুইচ টিপল, “একশো চল্লিশ, এখানে রিপোর্ট

করো, এক্ষুনি।”

মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমের শক্ত মেঝেতে নখের আওয়াজ করতে করতে একটা কালো, লোমশ প্রাণী ঢুকল। পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে সেটা যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন বোঝা গেল যে একজন জিনাইটের থেকে সেটা উচ্চতায় কম নয়। আস্তে আস্তে লেজ নাড়তে নাড়তে আর মুখ দিয়ে লালা ফেলতে ফেলতে সেটা সাতাশ নম্বরের পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু একবারও তার দিকে না তাকিয়ে সেখানেই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল।

তাদের দিকে তাকিয়ে কম্যান্ডার চুপ করে গেল। হঠাৎ করেই নিজেকে খুব ছোটো বলে মনে হচ্ছিল তার। এই মুহূর্তে নিজেকে আর তার যানের ক্যাপ্টেন, তার মোলোতম অভিযানের কম্যান্ডার এইসব কিছুই মনে হচ্ছে না। এই মুহূর্তে, সে কেবলই চার নম্বর; অবসর নেবার মুখে এসে দাঁড়ানো এক প্রৌঢ় লজিটেনিয়ান। আর মাত্রই গোটাকয়েক অভিযান ঠিকঠাক করে ফেলতে পারলেই যার ছুটি। অথচ ওই ‘ঠিকঠাক ব্যাপারটাই সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে।

কোনো সংগ্রাহক যদি পরীক্ষানিরীক্ষার পরে কোনো গ্রহ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে তাহলে তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়। অন্তত সংগ্রাহকের নিয়মাবলিতে সেরকমই লেখা আছে। কোনো গ্রহ ছেড়ে চলে আসার পরে সেই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ সদস্যরা গ্রহটা বা সেই অভিযান সম্পর্কে আর কিছুই মনে রাখে না। কেবল তার কম্যান্ডার একটা রিপোর্ট তৈরি করেন। তাতে সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল দিয়ে, তার বিশ্লেষণ করে, গ্রেট লজিটেনিয়াকে সেই গ্রহ কী দিতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তও জানাতে হয়। সেইটে ঠিকঠাক করতে পারলে তবেই তার অভিযানকে সফল বলা হবে। সেই প্রতিবেদন এরপর জমা পড়ে ভিনগ্রহের সভ্যতা বিষয়ক সুপ্রিম কমিটির কাছে। এরপর কম্যান্ডার সহ তার দলের সবাই গোটা অভিযানটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ফের পরের অভিযানে রওনা দেয়।

এতদিন এরকমটাই হয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের ঘটনা আলাদা। সবকিছু

কেমন গড়বড় হয়ে যাচ্ছে এবারে। গোটা অভিযানটাই কেমন বিস্বাদ, তেতো ওষুধ খাবার মতো হয়ে উঠছে তার কাছে।

একরকম জোর করেই মাথা থেকে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল কম্যান্ডার। এই অভিযানের ভবিষ্যতই তার কাছে এখন একমাত্র চিন্তার বিষয়। সে একশো চল্লিশ আর সাতাশ নম্বরের দিকে তাকাল। ভারি অদ্ভুত ছদ্মবেশ দু' জনেরই। এদের মতো কাউকে লজিটেনিয়ায় আগে কখনো দেখা যায়নি। দু' জনেই কম্যান্ডারের সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে, একজন নগ্ন জিনাইট নারী যার মাথাটা পেছনে সামান্য হেলা আর অপরটা কালো রঙের এক চতুস্পদ। এবার আর আলাদা আলাদাভাবে নয়, কম্যান্ডার তাদের দু' জনকেই একসঙ্গে পরীক্ষা করে দেখে নিল। সাবধানের মার নেই। এই গ্রহের বুকে এদের এখনো অনেক কাজ রয়েছে।

খানিক দেখাশোনা সেরে কম্যান্ডার এবার বেশ খানিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, "একশো চল্লিশ, ফের বাইরে যাবার জন্য তৈরি?"।

একশো চল্লিশ মাথা নেড়ে অস্পষ্ট আওয়াজ করল একটা, আর তারপর, যেন ঘাবড়ে গিয়ে তার সামনের থাবাদুটোকে গুটিয়ে বলের মতো করে নিল। ছদ্মবেশটা তাকে জিনাইটদের শহরে লুকিয়ে কাজ করতে খুবই সাহায্য করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর পাশাপাশি খাওয়াদাওয়া করা আর মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখাটা বেশ শক্ত হয়ে পড়ছে তার। তাছাড়া এই ছদ্মবেশটা ধরতে তার এত সময় লাগে আর এতই পরিশ্রম হয় যে প্রতিবার মহাকাশযানে ফিরে সেই ছদ্মবেশটা আর সে খোলবার ঝামেলায় যায় না।

"বললে এক্ষুনিই যেতে পারি।" লম্বা চোয়ালের ফাঁক দিয়ে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করে একশো চল্লিশ উত্তর দিল।

"উঁহু, এখন নয়। কাল। কাল তুমি মনিটর হিসেবে যাবে। অন্ধকার হবার পর। জিনাইটরা দেখতে পায় এমন জায়গায় যে-কোনো অস্ত্রশস্ত্র বা উড্ডয়নযন্ত্র ব্যবহার করা বারণ থাকবে। আগের মতোই।"

তরুণীটিও এবারে ঘর থেকে বেরোনোর উপক্রম করল। ধাতব মেঝের ওপর

তার কাঠের জুতো খুব হালকা শব্দ তুলছিল। কম্যান্ডার একটু ভ্রু কোঁচকালেন। এত হালকা পায়ে হাঁটছে কেন এ? একজন স্বাভাবিক জিনাইট মেয়ের হাঁটা কি এর চাইতে খানিক ভারী চালে হয়?

সাধারণ জিনাইটদের সঙ্গে কোথাও কিছু একটা তফাত রয়ে থেকে যাচ্ছে এর চেহারার। এখানকার মেয়েদের শয়ে শয়ে ছবি দেখে, বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতেই সাইকম এই ছদ্মবেশটা বানিয়েছে, কিন্তু তাও...

নাহ। তফাৎটা যে ঠিক কী সেটা সে নিজেও ধরতে পারছে না। নিরানব্বই বা একশো চল্লিশ নম্বর তারাও কেউ এর চেহারার সঙ্গে জিয়ার অন্য কোনো মেয়ের কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য ফারাক ধরতে পারবে না। কিন্তু জিনাইটরা তবুও ঠিক ওকে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে ফেলছে! কী করে? কোন পথে?

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে কম্যান্ডার এখন একা। তার মন তখন ভেসে গেছে সব সমস্যা থেকে অনেক দূরে... তার নিজের গ্রহে... লজিটেনিয়ায়... আহা, লজিটেনিয়া! বাইরে ছড়িয়ে থাকা এই হতচ্ছাড়া জিয়া গ্রহটাকে নিয়ে সে-মুহূর্তে আর কোনো চিন্তাই তার মাথায় ছিল না। অকাজের জায়গা একটা। এ গ্রহে অভিযানের প্রথম দিনটা থেকেই তার অভিজ্ঞ চোখ বুঝে গিয়েছিল, মহান লজিটেনিয়াকে দেবার মতো কোনো সম্পদ নেই এই গ্রহের ঝুলিতে।

জিয়া...

গলায় কেমন একটা দলা যেন আটকে আসে তার। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন এক অদ্ভুত, তীব্র হতাশা আর সারল্যে মাখানো অনুভূতি! তার দিকে চোখ রেখে টান টান তারে বাঁধা শরীরটা স্থির হয়ে থাকে। তার পা মাটি ছোঁয় কি ছোঁয় না! মাথার ওপর এই গ্রহের স্ফটিকস্বচ্ছ তারার দল। তাদের সে স্পর্শ করতে পারে না। রাতের কালো আকাশের ছায়া তার মুখে। বসন্তের বাগিচা যেন-বা এই গ্রহটি! ঋতুরাজের স্বচ্ছ শোভা আর ভোরের আকাশের কোমলতায় জড়ানো! তার হলুদ তারার দিকনির্দেশ মেনে উত্তরের দিকে ভেসে চলেছে একদল পরিযায়ী পাখি।

তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার গভীর গিরিখাতে প্রতিধ্বনিত হয়... জিয়া জিয়া জিয়া...

একসঙ্গে একরাশ অনুভুতির প্লাবনে যেন ভেসে চলেছিল সে। এরকম তার আগে কখনো হয়নি। এ গ্রহ যে কী করল তার! একটা শব্দ থেকে এমন সব অনুভূতি... একজন লজিটেনিয়ান নারীর পক্ষে একটু বেশিই স্বভাববিরুদ্ধ। যেমন এই অকারণ মনখারাপ! এতই তীব্র তার অভিঘাত, যে কোনো আলো, কোনো শব্দ সেই মনখারাপের বর্মকে ভাঙতে পারে না। যেমন সহসা জেগে ওঠা তীব্র, অদম্য, যন্ত্রণাদায়ক কামনার ঢেউ... হাতুড়ির মতো ক্রমাগত আঘাত করে যায় তার চেতনায়। অথবা সেই অদ্ভুত অনুভূতি যা সেই সন্ধেয় তাকে আচ্ছন্ন করেছিল! কোনোমতেই যার নাগাল থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারছিল না সে... নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তার... সে অনুভূতি ছিল তীব্র আতঙ্কের।

চারজন ছিল ওরা আজ। চারজন সৈনিক। পেছন থেকে দুটো চতুষ্পদের মতোই শব্দ তুলে মাপা পায়ের মার্চের ভঙ্গিতে যখন ওকে লক্ষ করে এগিয়ে আসা শুরু করল তারা, তখনই ও প্রথম ভয় কাকে বলে টের পেয়েছিল। অনুভূতিটা যেন বাইরের কোনো উৎস থেকে আসছিল... ওর চারপাশ থেকেও, আকাশ বাতাসে ঘনিয়ে উঠে ওর মাথাটাকে ঘিরে একটা শক্তিক্ষেত্র তৈরি করে ফেলল যেন। কিন্তু সেই শক্তিক্ষেত্র ওকে রক্ষা তো করলই না, বরং ওর সমস্ত চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিল, ওর রক্তকে ঠান্ডা করে দিল। চিৎকার করে মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়বার তীব্র একটা ইচ্ছে সেই মুহূর্তে চেপে ধরেছিল ওকে।

তবে শেষপর্যন্ত ও এরকম কিছুই করল না। বদলে ও 'ভয়' শব্দটাই উচ্চারণ করল কয়েকবার। সেটা উচ্চারণ করামাত্রই অসহায় অনুভূতিটা দূর হয়ে গেল ওর। ও আবার চিন্তা করার শক্তি ফিরে পেল। ও, সাতাশ নম্বর, কড়া নিয়মকানুনের লজিটেনিয়ান দুনিয়ার এক প্রাণী! অথচ ও কিনা নিজেকে ওই অসভ্য জিনাইটদের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছিল, যারা যুক্তির বদলে জৈবিক প্রবৃত্তির বশে কাজকর্ম করে! কথাটা ভেবে ও নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'ভয়!' নিজের মনেই ও আবার বলল, এই জান্তব ভয়ই ওর মধ্যে আত্মরক্ষার

প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। সৈনিকদের পায়ের শব্দ, ঝনঝন আওয়াজ, রাতের ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়ায় আটকে থাকা তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ ু এই সবকিছু মিলেই ওকে ওই ছায়া ছায়া রাস্তাটায় ওভাবে উদভ্রান্তের মতো দৌড়তে বাধ্য করেছিল। আতঙ্ক গ্রাস করেছিল ওকে। সেই মুহূর্তটায় ও না ছিল একজন সংগ্রাহক, না একজন যুক্তিবাদি লজিটেনিয়ান মহিলা। ভয় পেয়ে যাওয়া এক ছোটো জিনাইট মেয়ের মতোই হয়ে গিয়েছিল ও তখন।

যেইমাত্র ও সেটা বুঝতে পারল, ছোটা থামিয়ে দিল ও। ওর পেছনে যে চারজন তাড়া করে আসছিল তারা কিন্তু অত চট করে নিজেদের থামাতে পারল না। আরও কয়েক পা এগিয়ে, ঢালু কর্দমাক্ত পথে পিছলে পা ফাঁক করে বসে পড়ে কোনোমতে তাদের থামতে হল। সাতাশ নম্বরের থেকে মাত্রই কয়েক পা দুরে। তা সত্ত্বেও একই জায়গায় ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। আর কয়েক পা দৌড়ে এসে ওকে ধরবার উৎসাহ ওদের কারোই আর অবশিষ্ট ছিল না।

সাতাশ নম্বর এইবার পেছন ফিরে ওর পিছু ধাওয়া করা জিনাইট সৈনিক চারজনের দিকে তাকাল, কিন্তু তার শরীরের একটা পেশীও নড়ল না। ওর স্থির হয়ে দাঁড়ানো, ওইভাবে তাকানো ু এসব কিছুর মধ্যেই একটা অস্বাভাবিকত্ব ছিল। একটুও নড়াচড়া না করে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়ানোটা একজন জিনাইটের পক্ষে খুবই অস্বস্তিদায়ক এবং অসম্ভবও। একমাত্র লজিটেনিয়ানদের পক্ষেই এটা সম্ভব।

কিন্তু সাতাশ নম্বর খুবই অনভিজ্ঞ, তাই নিজের এই ভুলটাও বুঝতে পারল না। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সৈনিকদের ভালো করে দেখে যেতে লাগল। যদিও এতক্ষণ ওর পেছনে দৌড়ে এসে এখন তারা এত নিরীহর মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন তা বুঝতে পারল না। ইচ্ছে করলে তো এক লাফে ওর একদম কাছে চলে আসতে পারে।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তরুণীটির মন থেকে ভয় একেবারে উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে ভয় পাওয়ার জন্যে বরং একটু লজ্জিতও হল। ভয়ের সেই তীব্র অনুভূতি সম্ভবত আর কখনো ফিরে আসবে না। কম্যান্ডারকে কি

ও এসব বলবে? একজন লজিটেনিয়ান হিসেবে ও যা অনুভব করছে তা কম্যান্ডারকে তো তার রিপোর্ট করবার কথা! সংগ্রাহকের তো তাই কাজ।

অবশ্য ও এখন আর আদৌ কোনো লজিটেনিয়ান নয়। এই সৈনিক চারজনের কী করবে ও? ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। সাধারণত ঠোঁট অল্প ফাঁক করা আর বুকের ওঠানামা দেখে জিনাইটদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া বোঝা যায়। কিন্তু এদের সারা শরীরই যেন ধড়ফড় করছে, ঘড়ঘড় করে গার্গল করার মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, পা থেকে কোমর অবধি কেঁপে কেঁপে উঠছে, বুক মনে হচ্ছে ফেটেই যাবে আর চোয়ালগুলো হাঁ হয়ে ঝুলে রয়েছে। শব্দ করে তারা ঢোঁক গিলল আর তাদের শরীরগুলো একেবারে চুপসে গেল, যেন শরীরের পেশি আর হাড়গোড়গুলো আলাদা হয়ে গেল। আবার ঘড়ঘড় আওয়াজ করে তারা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

তবে যতই হোক, এরা মিলিটারির লোক। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে জিনাইটদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদের সামনে অত জোরে দৌড়েই ভুল করেছে সাতাশ নম্বর।

দুরুদুরু বক্ষে তরুণীটি তার মেন্টরকে মনে করল। সে আর কেউ নয়, একশো চল্লিশ নম্বর, ওই বিশাল কালো চতুষ্পদ প্রাণীটা। সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর ও আর তাকে দেখতে পায়নি। একশো চল্লিশ ওর সঙ্গে সরাইখানায় ঢুকতে পারেনি, তাই সে আলো-আঁধারি একটা রাস্তায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু চারজন সৈনিক সেই সময়ে মারামারি শুরু করল, কাছেই একটা আবর্জনার স্তূপ থেকে সাদা পাথরের টুকরো, মাটির দলা, হাড়গোড় তুলে নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি করতে লাগল। তারপরেই ওরা তরুণীটিকে দেখতে পেয়ে ওকে তাড়া করল। এ-গলি ও-গলি দিয়ে তাড়া করতে করতে শহরের বাইরে সেই সমুদ্রের কাছে ওকে ওরা নিয়ে এল। কিন্তু কোথাও একশো চল্লিশকে দেখা গেল না।

সাতাশ নম্বর বুঝতে পারছিল না এই সৈনিকগুলো এখন এরকমভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কেন? এতটা পথ ওর পিছু ধাওয়া করে আসার কী কারণ ছিল

তাহলে? এখন তো আর ওর কাছে আসার কোনো ইচ্ছেই ওদের মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ওর কী কিছু বলা উচিত বা উলটোমুখো হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত? এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার কোনো অর্থ নেই। একেবারেই বোকার মতো কাজ। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর আর কোনো রাস্তা না পেলে ওকে বাধ্য হয়ে ওদের চোখের সামনেই ওর উড়ানযন্ত্র চালু করে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে হবে।

হঠাৎ ও লক্ষ করল ওদের চারজনের মুখের ভাব আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। তার মানে কি ওরা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছিল?

এবার... এরা সবাই একসঙ্গে...

কিন্তু ওরা কেউ কিছু করতে পারল না। ওদের দেখে মনে হল ওরা কীরকম যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। আর তার পরেই ওদের মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ পড়ল। ঠিক এই একইরকম ভয় ও-ও পেয়েছিল না? কিন্তু ওদের ভয় পাওয়ার কারণটা কী? ফাঁকা একটা জায়গায় তরুণীটি দাঁড়িয়ে, তার মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে আর তাতে বোঝা যাচ্ছে যে সে মুখ একেবারে একজন সাধারণ জিনাইট মহিলার। ও তো নড়াচড়াও করছে না। তাহলে হলটা কী?

হঠাৎ পাথুরে রাস্তায় নখের আওয়াজ ভেসে এল, বহুদূর থেকে। বলা বাহুল্য, জিনাইট সৈনিকরা কিছু শুনতে পায়নি আর সেইদিকে তাকালেও কিছুই দেখতেও পেত না। কিন্তু শব্দটা শোনামাত্র সাতাশ নম্বর বুঝতে পারল যে এই বিচ্ছিরি, অস্বস্তিকর অবস্থা এবার শেষ হবে। শেষমেশ শব্দটা এবারে কাছে এসে যেতে সৈনিকরা যখন পেছন ফিরল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জন্তুটা এক লাফে ওদের টপকে সাতাশ নম্বরের পায়ের কাছে চলে এল আর এসেই একেবারে স্থির হয়ে গেল, যেন চকচকে কালো পাথরে তৈরি এক মূর্তি। তরুণীটিও আগের মতোই একটা পেশিও একটুও না নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিনাইটরা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল, তারপরেই ওদের একজন ঝাঁকিয়ে উঠল আর

সবাই কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। ওদের দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করছিল আর তার মধ্যেই ওরা বারবার একটা শব্দ উচ্চারণ করছিল যেটা কোনো লজিটেনিয়ানই আগে কখনো শোনেনি আর তার অর্থও জানে না। শব্দটা হল 'গেকাটা'।

সৈনিকদের কাঁপুনি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে এবার ওরা মাথা না তুলেই ছুটে পালিয়ে গিয়ে কাছাকাছি কোনো ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেবে। ঠিক তখনই কালো মেঘের দল উড়ে এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলল। সেই আধো অন্ধকারে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকা ছন্দোবদ্ধ পায়ের শব্দে বোঝা গেল যে পিছু ধাওয়াকারীরা পালিয়েছে।

খানিক বাদে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ ফের বেরিয়ে এলে ওরা দু'জন চলতে শুরু করল। তরুণীটি মাথা নীচু করে কুকুরটার দিকে দেখল একবার। যেন বলতে চাইছে, সবকিছু তো ঠিকঠাকই আছে, আমরা কোনো নিয়ম তো ভাঙিনি, তাই আমরা এখন ফিরে গিয়ে কম্যান্ডারের কাছে রিপোর্ট করতেই পারি! সে-দৃষ্টির জবাবে কুকুরটা অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধভাবে মাথা নাড়ল। তার ঘাড়ের রোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। সেগুলো আর চকচক করছিল না। হ্যাঁ, সবকিছু এখন ঠিক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তারা বিচ্ছিরি কিছু ভুল করেছে যেগুলোর কথাও কম্যান্ডারকে বলতে হবে।

তরুণীটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এল। চার নম্বরকে ও সবকিছু বলবে ঠিকই, কিন্তু ব্রোঞ্জের বর্ম পরা ওই চারজন পিছু ধাওয়াকারী সৈনিককে দেখে যে ভয় পেয়েছিল সেটা কখনোই জানাবে না। সেটা ওর একান্ত নিজস্ব অনুভব এবং সেটা চিরদিন অনুচ্চারিতই থাকবে। তাতে ভালো, মন্দ সে যাই হোক না কেন। তাছাড়া ভয় পাওয়া কোনো লজিটেনিয়ানেরই উচিত নয় আর সে সম্পর্কে জানারও তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা এমনই এক অদ্ভুত অনুভূতি যা ও চিরদিন গোপন রাখবে।

মহাকাশযানে ফিরে আসবার পর সাতাশ নম্বরের মনিটর, ঘটনাটা যতটুকু দেখেছে বুঝেছে সেই সবকিছুই রিপোর্ট করল কম্যান্ডারকে। শুধু ওই ভয় পাওয়ার

কথাটাই বলল না।

সব শুনে কম্যান্ডার মাথা নীচু করে বসে রইল একটুক্ষণ। এই বিশৃঙ্খল আর এলোমেলো জিয়ার জন্যে সে বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এখন যদি কোনো মেসেজ আসত... এক্ষুনি এখান থেকে রওনা হবার মেসেজ... তাহলে সে তার সমস্ত জিনিসপত্র জিয়াতে ফেলে রেখে মাথার ওপরের এই বিচ্ছিরি নীল আলো ছুঁড়ে নক্ষত্রের মাঝে কালো মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে এক মুহূর্ত দেরি করত না। নিজের মনোমতো পরিবেশে ফিরে যাওয়া। এটাই একদম ঠিক কথা, নিজের মনোমতো পরিবেশ। ভাবতে ভাবতে একটু হতাশ হয়েই ঘাড় নাড়ল সে। এখন সে সৌভাগ্যের সময় নয়।

গ্রেট লজিটেনিয়ার ধবধবে সাদা সমাধিগৃহে অনেক সমাধি আছে। তবে সেগুলো সবই সাধারণ লজিটেনিয়ানদের। একজন সংগ্রাহকেরও সমাধি সেখানে পাওয়া যাবে না। ঘটনাচক্রে যদি কোনো সংগ্রাহকের মৃত্যু তার নিজের গ্রহে হয় তাহলে তার দেহাবশেষ হালকা আলোমাখা ক্যাপসুলে পুরে মহাশূন্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়, লজিটেনিয়ান মহাকাশযানের যাতায়াতের পথ থেকে বহুদূরে।

'নিজের মনোমতো পরিবেশ' কথাটা এইজন্যেই চার নম্বরের মনে এসেছ। প্রথমে একটা রসিকতার মতো, তারপরে তিক্ততায় আর তারও পরে একেবারে নিঃস্পৃহ হয়ে। সে বড়োজোর তার চেনাজানা 'মনোমতো কোনো পরিবেশে থাকতে পারবে, কিন্তু কখনোই নিজের বাড়িতে থাকতে পারবে না, কারণ তার তো কোনো বাড়িই নেই।

গ্রেট লজিটেনিয়ায় হাজার নিয়মকানুন আছে আর সেগুলোই একেবারে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেয় যে কোনো গ্রহে কে কতক্ষণ থাকবে। জিয়া এমনই এক গ্রহ যার দেওয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একের পর এক নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করে যেতে হবে। নতুন সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই গ্রহ যে সত্যিই কোনো কাজে আসবে না তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। একমাত্র তারপরেই তারা এই গ্রহ ছেড়ে যেতে পারবে।

অবশ্য যাওয়ার আগে নিজেদের উপস্থিতির সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। নতুন সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আর নিয়মকানুন আর নিয়মকানুন...

"শহরে ঢোকার জন্যে কাল তোমার শেষ সুযোগ। তিরানব্বই নম্বর তোমার মনিটর হবে।"

কম্যান্ডার শুধুমাত্র সাতাশ নম্বরকেই রিপোর্ট করতে বলেছে, তাই একশো চল্লিশ নম্বর মহাকাশযানের বাইরেই রয়ে গেল। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায়! আসলে সবসময়েই তার কেমন যেন মনে হয় তার নখওয়ালা থাবা আর গায়ের ঢেউ খেলানো লোম মহাকাশযানের ভেতরের উজ্জ্বল সাদা রঙকে নোংরা করছে।

একশো চল্লিশ ঘেন্নায় মাথা নাড়ল। দেখলে মনে হবে, যে পোকাটা সারাদিন ধরে তাকে উত্যক্ত করেছে তাকেই তাড়ানোর চেষ্টা করছে সে। এখন রাত হয়ে গেছে, পোকামাকড়ও আর নেই, কিন্তু একঘেয়ে, অবিরামভাবে বয়ে চলা চিন্তাগুলোর হাত থেকে ওর মুক্তি নেই, তাই শান্তিও নেই।

ওরা সবকিছুই গোলমাল করছে। মেয়েটা কোনোদিনই ঠিকঠাক সংগ্রাহক হয়ে উঠতে পারবে না। এই জঘন্য, বিশৃঙ্খল দুনিয়ার ওপর ও বিশদে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইছে। এই নোংরা শহরের দুর্গন্ধময় অজস্র গলিঘুজির গোলকধাঁধাতে ক্রমাগত ঘুরে মরছে ও। যা কিছু গ্রেট লজিটেনিয়ার মতো নয় তার প্রতি যেমন ওর কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, তেমনই ওর নিজের গ্রহের কাজে লাগবে এরকম জিনিসপত্র খোঁজবার ব্যাপারেও বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই। আর ওই বুড়ো কম্যান্ডার? মাতৃগ্রহের প্রতি ওর হৃদয়ে যে অপরিসীম অন্ধ ভালোবাসা আছে তার দশ ভাগের একভাগও মহাকাশযানের সব কর্মীদের মধ্যে মিলিতভাবে নেই। আর এই ভালোবাসার কারণেই ওর মন সব সময় নানান এলোমেলো ভাবনায় ঢেকে থাকে।

একশো চল্লিশ নম্বর ওর লম্বা নাকওয়ালা মুখটা উঁচু করে বুকফাটা একটা আওয়াজ তুলল। এই শব্দটার কোনো অর্থ না জিনাইটদের ভাষায় আছে, না

লজিটেনিয়ানদের। অথচ আওয়াজটা বের হয়ে এসেছে ওর হৃদয় থেকেই। একশো চল্লিশ নম্বর অবশ্য নিশ্চিত নয় সেটা কার হৃদয়, ওর নিজের, না যে প্রাণীর রূপ ও ধারণ করেছে তার।

ওর মতো দেখতে এরকম জন্তুদের ও শহরের রাস্তাঘাটে, নানান এলাকায় দেখেছে। আকারে, গায়ের রঙে, গলার স্বরে, স্বভাবে তারা একে অপরের চেয়ে আলাদা। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একশো চল্লিশ নম্বর বুঝেছে যে এদের মোটামুটিভাবে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একদল গৃহহীন, আর একদলের মালিক নির্দিষ্ট কয়েকজন জিনাইট।

হালকা আলোয় ঘেরা মহাকাশযানটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একশো চল্লিশ নম্বর বুঝতে পারল ওর আসল বাড়ি কত দূরে! বাড়ি ফেরার জন্যে ওর মন কেমন করে উঠল। চাঁদের আলোয় ঝলমলে বিশাল মহাকাশযানটা আসলে সেই দুরে থাকা দুনিয়ার একজন ক্ষুদ্র প্রতিনিধি মাত্র। নিজের দেশের সেবা করার মধ্যে যে অসীম আনন্দ রয়েছে তা হঠাৎ করে এইভাবে অনুভব করতে পেরে ওর মন আর্দ্র হয়ে উঠল। ফের একবার কুঁই কুঁই করে ডেকে উঠল ও। ছলছলে চোখের সাদাটে পাতাগুলো পিটপিট করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে ও মহাকাশযানের দিকে এগোল।

নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে পরেরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠল তিরানব্বই নম্বর। এই নোংরা গ্রহে কাজকর্মের জন্যে আজই ও শেষবারের মতো যাবে।

তিরানব্বই নম্বরের বয়স হয়েছে। অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। যে-কোনো গ্রহে গিয়ে ও বেশিরভাগ সময়েই সেখানকার বয়স্ক, দুর্বল কোনো স্থানীয় বাসিন্দার পরিচিত চেহারা ধরে। তবে সে গ্রহে নামার কোনো জায়গা থাকলে আর সেখানে অনুকরণ করার মতো কোনো বয়স্ক বাসিন্দা থাকলে তবেই এটা সম্ভব হয়। গোটা লজিটেনিয়ার দক্ষ সংগ্রাহকদের মধ্যে সে যে অন্যতম একথা ও নিজে খুব ভালো করেই জানে আর সেটা ভেবে ফুর্তিও পায়। সত্যি কথা হচ্ছে, সবকিছু নিয়েই

হাসাহাসি করার অভ্যেস ওর আছে, বিশেষ করে ওর সহযাত্রীদের নিয়ে। নিজের এবং অন্যের ছোটোখাটো ভুল-ত্রুটিও খুঁজে বের করা ওর স্বভাব। আর এ নিয়ে যে কম্যান্ডারও মজা পায়, তা ও লক্ষ করেছে।

একজন আদর্শ সংগ্রাহক হওয়াই ওর জীবনের লক্ষ্য ছিল। আর, তা পূরণ করার জন্যে সংগ্রাহকদের নিয়মাবলীর প্রতিটা নির্দেশের অন্ধ অনুসরণ করে গেছে সে চিরকাল। গ্রেট লজিটেনিয়ার প্রতি একশো চল্লিশ নম্বরের অন্ধ আনুগত্যও ওর কাছে মজার এক বিষয়। সেই গ্রেট লজিটেনিয়া, একশো চল্লিশের মাতৃভূমি; কোনো বিশেষ কাজের পুরস্কার হিসেবেই যার দর্শনলাভ তাদের কপালে কদাচিত জোটে। আর এই হতচ্ছাড়া সাতাশ নম্বরকে দেখে তো ওর হাসি সামলানোই দায় হয়! একে তো গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তার ওপর এই প্রথম অভিযান নিয়ে তার সে কী উচ্ছ্বাস! সাতাশ নম্বর এই প্রথম কোনো গ্রহে এল কিনা!

কিন্তু সে উচ্ছ্বাস বেশিদিন থাকবে না ও-মেয়ের। এরপর আরেকটা গ্রহ, তারপর আরেকটা... এই করতে করতেই এই উচ্ছ্বাস ওর বদলে যাবে নিঃস্পৃহতায় বা নিষ্ঠুরতায়। একশো চল্লিশ নম্বরের ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছে। নিজের দ্রুত শেষ হয়ে আসা জীবনীশক্তি, নিঃস্পৃহ স্বভাব আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তীব্র অনুভূতি তখন সাতাশ নম্বরেরও হবে। সংগ্রাহকের জীবনের সেটাই অবধারিত ভবিতব্য। গ্রহ আর মহাকাশযাত্রা, মহাকাশযাত্রা আর গ্রহ, আর এর মধ্যে দিয়েই গ্রেট লজিটেনিয়ার গৌরবের জন্যে সামান্য যা কিছু তথ্য তারা চুরি করে, তার বিনিময়ে এই তাদের একমাত্র মজুরি।

'বেচারা!' সরু, পাথুরে রাস্তা ধরে সাতাশ নম্বরের পেছন পেছন যেতে নিজের মনেই বলল তিরানব্বই নম্বর। রাস্তার এখানে ওখানে গৃহবধূরা তাদের বাড়ির দেওয়ালের ওপাশ থেকে আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলেছে আর সেই দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপের জন্যে রাস্তাটাকে যেন আরও অন্ধকার অন্ধকার লাগছে।

চারপাশে অনেক গাছ! যেন মন্দিরের সার। ওদের সরু সরু চকচকে পাতাগুলোর গড়ন ভারি সুন্দর। আধা স্বচ্ছ, ছোটো ছোটো পাতাগুলোকে দেখে মনে

হয় যেন তাদের ওপর কোনো ধাতুর চূর্ণের প্রলেপ লাগানো আছে। জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত মোটা মোটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে থোকা থোকা কালচে নীল রঙের ফল। একেকটা থোকায় এত ঘন হয়ে রয়েছে খুদে খুদে ফলগুলো যে দেখে মনে হবে যেন বিরাট বড়ো একেকটা গোটা ফল... চলতে চলতে ভারি খুশি হয়ে তাই দেখছে মেয়েটা।

... 'হুহ। বেজায় ফুর্তি প্রাণে।' মেয়েটার দিকে দেখতে দেখতে তিরানব্বই মনে মনে ভাবছিল। শুরুটা সবারই এমনভাবেই হয়। গ্রেট লজিটেনিয়ার বিধিসম্মত শৃঙ্খলার শিক্ষার ফল। এর মতো অজস্র তরুণ কর্মী কর্মজীবনের শেষ অবধি টের পায় না যে এই অসহ্য পেশা থেকে বেরোনোর পথ একটাইনিজের কমরেডদের মিথ্যে কথা বলা আর নিজের পেশার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা।

ঠিক কতদিন আগে থেকে ও সংগ্রাহকের আসল কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেটা তিরানব্বই নম্বর নিখুঁতভাবে বলতে পারে। ইদানীং নতুন কোনো গ্রহে পৌঁছেই বিপুল অভিজ্ঞতা আর সহজাত জ্ঞানের জোরে ও সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মিশে যায়। এতটাই, যে ওকে আর অন্যদের থেকে আলাদা করা চেনাই যায় না। যে -কোনো গ্রহের একজন সাধারণ বাসিন্দার কীসে আনন্দ হয় সেটাও ও নিখুঁতভাবে আন্দাজ করে নিতে পারে। উঁহু, কোনো উঁচু দার্শনিক, সুক্ষ্ম আনন্দের খোঁজ ও আদৌ করে না। বরং ও যার রূপ ধারণ করেছে তার একান্ত সাধারণ, মোটাদাগের আমোদ-আহ্লাদগুলোকে বুঝে নিয়ে সেইগুলোকেই চুটিয়ে উপভোগ করে যায়।

সংগ্রাহক হিসেবে ওর তৃতীয় অভযানে ও গিয়েছিল রেমিজাঙ্গি গ্রহে। সেখানে একবার ও কয়েকটা নিষিদ্ধ নীল মাকড়শা ধরে, চোখমুখ কুঁচকে সেগুলোকে নিজের পেটের ওপর রেখে ঘেঁতলে ফেলেছিল। আহা, কী তার সুবাস! সেই গন্ধ নাকে টেনে রেমিজাঙ্গির হিসেবে প্রায় তিন-তিনটে দিন ও নেশায় চুর হয়ে পড়েছিল। আবার ধরো সেই গ্রহটা, ওর সূর্যের নাম নিনা। সেই সৌরমণ্ডলে ওই একটামাত্র গ্রহ। জনবিস্ফোরণের জন্য সেখানে জায়গা অকুলান। সেখানকার আধা জংলি জীবগুলো এক-একবারে আট থেকে ন টা বাচ্চার জন্ম দিত। অতএব বাচ্চাদের যতদূর সম্ভব

নিকেশ করাই তাদের বাঁচবার রাস্তা। সেখানে গিয়ে ও সেই জীবদের সঙ্গে তাদের রূপ ধরে মিশে গেল। তারপর সেখানকার দস্তুর অনুযায়ী মুখ থেকে লালা ঝরাতে ঝরাতে ও এক গুহা থেকে আরেক গুহায় ওদের হলদেচোখো বাচ্চাগুলোকে খুঁজে বেড়াত। আর কখনো তেমন দু-একটার নাগাল পেলেই খপ করে চেপে ধরে হাউমাউ করে হাঁকার ছেড়ে গোটা দলটাকে এনে জোটাত তাকে নিকেশ করবার জন্য। আবার ধরো কপার মাউন্টেনের ঘটনাটা। সেখান থেকে কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছিল সে শেষতক। দলের অর্ধেক নিকেশ হয়ে গিয়েছিল তার সেই অভিযানে। তবে পালাবার আগে ইস্তক লজিটেনিয়ান অর্ডিন্যান্সের ছ' খানার ভেতর অন্তত চারখানা আইন তো সে ভেঙেই ছিল সেখানে! তাছাড়া পাখিমুখো হঁদুর শেয়েলার সঙ্গে রতিক্রিয়া... হে হে... অর্ডিন্যান্সে এরকম আইনভঙ্গের ক্লজ রাখবার কথা আইন বানানেওয়ালাদের মাথাতেই আসেনি।

ওই বিশেষ অভিযানটায় যাকে বলে ফুর্তির চূড়ান্ত করে ছেড়েছিল তিরানব্বই। এমনকি সেখানকার বাসিন্দারা নিজেরাও তেমন উদ্দাম ফুর্তি করতে পারে না। অবশ্য তিরানব্বইয়ের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক আচরণ। তবে হ্যাঁ, যখন ও মহাকাশযানে থাকে তখন ও একজন পাক্কা লজিটেনিয়ান আর লজিটেনিয়ানরা কখনোই আইন ভাঙে না। সেটা তাদের আইনবিরুদ্ধ। স্বভাববিরুদ্ধও বটে। অনমনীয়, কড়া আইনকানুন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলার শিক্ষা লজিটেনিয়ানিদের ছোটোবেলা থেকেই দেওয়া হয়। সেখানে লোকজনের দৃঢ় বিশ্বাস, কেউ আইন ভেঙে উলটো কোনো আচরণ করলে মানুষের কল্পনাশক্তি জেগে ওঠে। লজিটেনিয়ানদের পক্ষে সেটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, খারাপ মাথার অসুখ বলেই গণ্য করা হয় তাকে।

কিন্তু তিরানব্বই নম্বর কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। ভিনগ্রহের প্রাণীর রূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ও তাদের প্রবৃত্তি, ভাষা, ভাবনাচিন্তার ঢংগুলোকেও আত্মস্থ করে ফেলে। আর, তারপর তাদের মধ্যে মিশে গিয়ে, তাদের প্রবৃত্তির, তাদের আবেগের বশবর্তী হয়ে বিনা দ্বিধায় যা করার তা করে। নজরদার ড্রোনগুলো যে

তার গতিবিধির ওপরেও যে নজর রাখছে তা ও ভালোই জানে। কিন্তু তাদের লুকিয়ে কিছু করবার চেষ্টাও সে করে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে যথেচ্ছ ফুর্তি করে যায় আর ড্রোনগুলো সেইসব কিছুর খুঁটিনাটি রেকর্ড করতে থাকে।

আর কারো এরকম কাণ্ডকারখানা দেখলে অভিযানের কম্যান্ডার নিঃসন্দেহে ঘাবড়ে গিয়ে তার দফারফা করবার হুকুম দিয়ে ফেলত। কিন্তু তিরানব্বইয়ের ব্যাপারটাই আলাদা। নিয়ম-টিয়ম যথেচ্ছ ভেঙেও মহাকাশযানে ফিরে এসে সে সবসময়েই তার কম্যান্ডারকে দিব্যি বুঝিয়ে দেয় যে তার সব কাজকর্মই আসলে গ্রেট লজিটেনিয়ার জন্যে স্বার্থত্যাগের নিদর্শন।

যে-কোনো ফিল্ড ট্রিপের শেষে, হা-ক্লান্ত আর নিজের ওপরে যেন ভারি বিরক্ত এমন একটা ভাব করে ও কম্যান্ডারের সামনে আসে আর নজরদার ড্রোনগুলো যা যা দেখে থাকতে পারে বলে তার ধারণা সেই সবকিছু নিজে থেকেই গলগল করে উগড়ে দেয়। একটা কথাও লুকোয় না। আর সেই করতে করতেই সেই গ্রহের অধিবাসীদের জীবনের ছবির মতো একটা বিবরণ আর তার মূল্যায়ন তুলে ধরে ও। আর সেই মূল্যায়নটাকে ও সাজায় একজন লজিটেনিয়ানদের দৃষ্টিকোণ থেকে। ঘটনার বিবরণগুলোও এমন ভঙ্গিতে সাজায় যাতে অবধারিতভাবে বোঝা যাবে যে গ্রেট লজিটেনিয়ার কোনো বাসিন্দার তুলনায় সেই গ্রহের বাসিন্দারা একেবারেই আকাট আর ভয়ানক দুশ্চরিত্র। ফিল্ড ট্রিপে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতেই ভারি নিঃস্বার্থ আর নির্দয় একটা হাবভাব নিয়ে, যেন কতই না ঘেন্না পাচ্ছে এমন গলায় ও নিজেরই করা সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনাগুলোর বিবরণ দিত। ফলে যে ছবিটা ফুটে উঠত তা লজিটানিয়ান আদর্শের নিরিখে একেবারেই ন্যক্কারজনক, আর ফলত স্বাজাত্যাভিমানী লজিটানিয়ান কম্যান্ডারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হত।

কায়দাটার ফল হয়েছে এই যে, আর কোনো সংগ্রাহক যে শৃঙ্খলাভঙ্গগুলো করলে তার চাকরি আর প্রাণ দুটো নিয়েই টানাটানি পড়বার কথা, সেই একই কাজ করে তিরানব্বই নম্বরের সুনাম বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে। ভিনগ্রহের প্রাণীদের অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক হিসেবেই তার খ্যাতি এখন। বলা বাহুল্য, সুনামটা অর্জন করবার জন্য

তার একমাত্র মূলধন ছিল ওই বেহিসেবি ফুর্তি।

মাপা পদক্ষেপে সাতাশ নম্বরকে এখন অনুসরণ করছে ও। প্রতি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওর অস্থির হাঁটুগুলো এমনভাবে ওর পরণের পুরোনো আলখাল্লায় ঘষটে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এবার আলখাল্লার কাপড়ই ফুটো হয়ে যাবে! চলার ঝাঁকুনিতে ওর ছাগল দাড়িও নড়ছে। যে গলিটা দিয়ে ওরা চলছে সেটা একটা খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে। লাইল্যাক রঙের পাথরকুচি পাহাড়ের ওপর থেকে ওর চলার পথে এসে গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়তলি ছুঁয়ে এগোনো রাস্তাগুলোর দিক থেকে তাজা বাতাস বইছিল। সে হাওয়ায় ঠান্ডার হালকা আমেজ, তাতে টাটকা ধরা মাছ আর মাটির ওপর ফলে থাকা ডোরাকাটা বড়ো বড়ো ফলের সুবাস। এ-গ্রহের নক্ষত্র, যাকে এখানে হেলিয়স বলা হয়, সে আলো দিচ্ছে বটে কিন্তু তাতে ওদের ঠান্ডা কাটছে না। তবে ছ্যাঁতলা ধরা ইটের বিশ্রী দেয়ালগুলোতে সে আলো পড়ে তাদের সোনালি গোলাপি রঙে রঙিন করে তুলছে।

হেলিয়স আকাশ বেয়ে ওপরে উঠতে সেই গোলাপি রঙ আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছিল। তিরানব্বই নম্বরকেও আর বেশি দূরে যেতে হল না। হেলিয়সের গোলাপের পাপড়ির মতো লালচে হলুদ রঙের আলো ছড়ানো পথ মাড়িয়ে ও তার গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। গন্তব্যটা আসলে একটা সরাইখানা। এইবারে সেটা চোখে পড়তে বুড়ো তিরানব্বই নম্বর খুশিতে খুক খুক করে হাসল খানিক।

সরাইখানার ভেতরটা হালকা আলো-আঁধারি রয়েছে তখনও। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা চালু হয়ে যায়। কিংবা বলা ভালো, এটা কখনো বন্ধই হয় না। কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো অসমান টেবিলগুলো কখনোই পরিষ্কার করা হয় না। গভীর রাতে হা-ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরবার পথে নীচের রাস্তার মেয়েগুলো এইখানটায় আসে। একটু খাবারের খোঁজে টেবিলগুলো হাতড়ে ছড়িয়ে থাকা উচ্ছিষ্টগুলো তারাই চেটেপুটে সাফ করে দিয়ে যায়।

সরাইয়ের দরজার ঠিক পাশটাতে একটা টেবিল দেখে নিয়ে বুড়ো সেখানটায় গিয়ে বসল। সামনের গোটা চকটা বেশ ভালোভাবে চোখে পড়ে এখান থেকে।

সেখানে লোকজনের ভিড়। সরু সরু গলিগুলো সেখান থেকে বেরিয়ে সটান সমুদ্রের ধার অবধি চলে গেছে। এতক্ষণ ও সাতাশ নম্বরের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, মাত্র কয়েক পা পেছনেই। কিন্তু এইবার ওর স্বাধীনভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা হোক একটু। তিরানব্বই এইখানটায় বসে আসলে তার ধারেকাছেই রইল অবশ্য। প্রয়োজনে সাহায্যও করবে। সেটার দরকার আছে। কারণ যতবারই সাতাশ নম্বর এই শহরে এসেছে ততবারই জিনাইটদের কৌতূহল জাগিয়েছে সে। প্রতিবার, আক্ষরিক অর্থেই, তার রাস্তা আটকে ধরেছে কৌতূহলী জিনাইটরা। আর এটাই উপস্থিত ওই ব্যাটা কম্যান্ডার... ওই ব্যাটা... আহা বোকা পাঁঠাকে জিনাইটরা কী যেন বলে... যাক গে, ওই বোকা-পাঁঠাটাকে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছেড়ে দিয়েছে।

সাতাশ নম্বর একটা চড়াই বেয়ে উঠছিল। দু' হাতে ও ওর জামার দুটো ধার ধরে আছে যাতে তা হাওয়ায় না ওড়ে। তিরানব্বই নম্বর কর্তব্যবশত খানিক সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর পিঠের ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে একটা মাটির কাপ বের করে নিজের সামনে রেখে ফের একবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে বাইরে দেখল। নাহ, এখান থেকে আর নজরে পড়ছে না। ওর জায়গায় চড়াই বেয়ে একটা ক্রীতদাস সমুদ্রের ধারে নেমে আসছে এখন। সেখানে মাছ ধরে ফেরা জেলেদের খদ্দের ডাকবার ঘণ্টার শব্দ উঠছে। মাছ নিতেই আসছে নিশ্চয়! কিন্তু না! থেমে গেছে ক্রীতদাসটা। তিরানব্বই একটু উঁচু হয়ে বসল। সাতাশকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না অবশ্য, কিন্তু ক্রীতদাসটা নিঃসন্দেহে ওকে দেখেছে। গোল গোল করে তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। যেন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে।

সাতাশ নম্বরের সামনে এসে পড়লে যে-কোনো জিনাইট ঠিক এইটেই করে থাকে। ছাগলদাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে তিরানব্বই নম্বর আড়চোখে তাকালো, ফের একবার সেদিকে দেখে নিল। ব্যাপারটায় গোলমাল যে একটা কিছু সত্যিই আছে, সেটা ও আন্দাজ করতে পারছিল একটু একটু। ছদ্মবেশের কোনো ত্রুটি এর কারণ নয়।

আসলে এই গ্রহে এসে সে অভ্যেসমতো জিনাইটদের রূপ, প্রবৃত্তি স্বভাব এই সবকিছুর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েই ছদ্মবেশ ধরেছে। বলতে গেলে এই মুহূর্তে সে একজন জিনাইট। সে নিজেও কিন্তু মেয়েটার কাছাকাছি এলে একটা ব্যাখ্যাহীন টান টের পায় নিজের ভেতরে। একেবারেই যুক্তিহীন প্রবৃত্তিগত টান। এধরনের অনুভূতি একজন লজিটেনিয়ানের কাছে একেবারেই অজানা।

যাক গে। এ তো আর নতুন কিছু নয়! ক' দিন ধরেই হয়ে চলেছে। ওতে আর নজর রাখবার কী আছে। অতএব সে স্যাঁতসেঁতে টেবিলের গায়ে একটা চাপড় মারল। শব্দ শুনে সরাইখানার মালকিন এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। যেটুকু আলো ঢুকছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। সরাইখানাটায় একটাও জানালা নেই। আলোগুলোও এই মুহূর্তে নেভানো।

মালকিনকে দেখে তিরানব্বই নম্বর ওর হাতের মুঠি খুলল। ওর কোঁচকানো তালুর খয়েরি চামড়ায় চকচক করছে একটা মুদ্রা। সরাইখানার মালকিন এগিয়ে এসে সেটা খপ করে তুলে নিল ওর হাত থেকে। নিঃসন্দেহে টাকাটা বুড়ো ভিখিরির চুরির মাল। তবে তাতে তার কী আসে যায়!

মুদ্রাটার বদলে তিরানব্বই নম্বর পেল এক প্লেট বাসি মাছ, এক চুমুক হালকা রঙের পানীয় আর ছাতাপড়া কিছু সবজি। খাবারগুলো যত্ন করে খেয়ে সে আবার ছাগলদাড়িতে হাত বোলাল। পানীয়টা একেবারে অখাদ্য। তারপর ফের টেবিলে টোকা মারতে শুরু করল। অধৈর্য বিরক্ত টোকা। এবার মালকিনের হাতে আরও বেশ ক'টা মুদ্রা গুঁজে দিল সে। পরনের কাপড়ের ভাঁজে সেগুলো অদৃশ্য হতে দেখা গেল এইবার মালকিনের চলাফেরায় খানিক উৎসাহ এসেছে। আরও পানীয় এল এবং আরও, আরও।

মুদ্রাগুলো সত্যিই গতরাতে চুরি করা। জাল মুদ্রা তৈরি করতে অকারণ সময় নষ্ট হয়, তাই এই পথ। কম্যান্ডার ব্যাটাকে বোঝানো গেছে যে চুরিটা আসলে গ্রেট লজিটেনিয়ার গৌরব বৃদ্ধির জন্যে একটা অসমসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট। কিন্তু আদতে বুড়ো তিরানব্বইয়ের কাছে এটা বিশুদ্ধ একটা মজা। বিনা খাটুনিতে

উপার্জনের মজা, যেরকম অনেক জিনাইটই করে থাকে এখানকার পথে ঘাটে। অবশ্য তিরানব্বইয়ের একটা অতিরিক্ত সুবিধে ছিল যা জিনাইটের ছিঁচকে চোরদের নেই। তার কাছে উড়ুক্কু যন্ত্র আর শব্দহীন প্লাজমা ব্লেড ছিল। আর আজ কাল রাতের সেই রোজগার দিয়ে দেদার ফুর্তি। কেয়াবাত!

কাপের পর কাপ মদিরা গলায় ঢেলে চলেছিল তিরানব্বই। নেশাটা চড়ছিল তার আস্তে আস্তে। ক্রমশ আর দশটা জিনাইট বুড়োর মতোই ওরও হুঁশ চলে। গেল একেবারে। নেশার ঘোর যেন ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছিল। মাথাটা আস্তে আস্তে নীচু থেকে আরও নীচুতে ঝুঁকে পড়ছিল ওর। কাজেই খানিক বাদে সাতাশ নম্বর যখন, যেন অদৃশ্য কেউ তাকে তাড়া করেছে এমনি ভাব করে ওর একেবারে সামনে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে মহাকাশযানের দিকে পালিয়ে গেল তখন ও তাকে খেয়ালই করল না।

৬.

কেবিনের দরজাটা খুলে যেতে সাতাশ নম্বর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সেখানে কম্যান্ডার এসে দাঁড়িয়েছেন।

"তুমি? ফিরলে কখন?"

সাতাশ নম্বর কোনো জবাব দিল না। কম্যান্ডার ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে দেখছিল। প্রশ্নটা অবশ্য নিতান্তই বাহুল্য। সাতাশ নম্বর কখন মহাকাশযান ছেড়ে বেরিয়েছে আর কখনই বা মহাকাশযানে ঢুকেছে তা কম্যান্ডারের চাইতে ভালো আর কেউ জানে না।

তবে কম্যান্ডারের ভ্র কোঁচকাবার কারণ সেটা নয়। কারণ হঠাৎ করেই তার খেয়াল হয়েছে, সাতাশ নম্বরের পোশাকে একটা বদল এসেছে। সকালে যে টিউনিক আর চপ্পল পরেছিল, এখনও পরনে সেটাই রয়েছে, কিন্তু এখন তার রঙ চোখ ধাঁধানো সাদা। ব্যাপারটা শুরুতেই তার খেয়াল হল না কেন? সাতাশ নম্বর কেবিনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেন এটা কম্যান্ডারের নজরে পড়ল না? শুধু জামাকাপড়ই তো নয়। তার ঠোঁটও একেবারে সাদা, যেমন সাদা তার চোখের পাতা

আর গায়ের চামড়া। কীরকম অদ্ভুত একটা সাদা রঙ! যেন নিষ্প্রাণ। অথচ ম্যাড়ম্যাড়ে নয়। বরং ঝলমলে এবং দেখে ভঙ্গুর মনে হয়। যেন ধবধবে সাদা বরফের চাঙড় থেকে সাতাশ নম্বরকে তৈরি করা হয়েছে। ধবধবে সাদা একটা মুখ, সাদা চোখু যেন নিষ্প্রাণ একটা মুখোশ। আর তাতে কালো রঙের চোখের মণিগুলো নড়াচড়া করছে। তারা অন্তত জীবিত।

"হঠাৎ রূপ বদলালে যে?" সাতাশ নম্বরকে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন কম্যান্ডার।

সাতাশ চুপ করে রইল। তার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল, প্রশ্নটার জবাব দেবার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

"গতকাল সন্ধেবেলা তুমি চারজন জিনাইটের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এলে, কিন্তু পালালে কেন সেটা গুছিয়ে বলতে পারলে না। আজ সকালেও নিজের কাজ পুরো শেষ না করেই ফিরে এলে, তার কারণ কী সেটাও কিছু বলছ না। তার ওপর, সংগ্রাহকের কাজ করার জন্যে যে ঠিকঠাক পোশাক তোমাকে দেওয়া হয়েছিল তার বদলে এরকম একটা পোশাক আর রূপ ধরেছ। কেন?"

তরুণীটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমনকি তার চোখের মণিদুটোও কোনোরকম নড়াচড়া করল না। বাকি শরীরের মতো ও-দুটোকেও এখন প্রাণহীন বলেই মনে হচ্ছে। কম্যান্ডার কেবিনের ভেতর গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, তার কাঁধ দেওয়ালে ঘষটে যাচ্ছিল। এরকম ছন্দোবদ্ধ গতি তার চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত করে। এই সাতাশ নম্বরটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়? কম্যান্ডার নিয়মকানুন মনে করতে লাগল, কোনটা এর পক্ষে উপযোগী হবে।

'যেসব গ্রহের গ্রেট লজিটেনিয়াকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই তাদেরকে নতুন সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা যাবে।' এই একটা নিয়মই কম্যান্ডারের মনে পড়ল। প্রশিক্ষণ নেবার জন্য শিক্ষানবিশকে পুরোমাত্রায় উদ্যোগী হতে হয়। অথচ মেয়েটা কেমন যেন বিহ্বল একটা অবস্থায় রয়েছে। তবে সাতাশ নম্বরের সমস্ত মনিটর রিডিং অবশ্য দেখাচ্ছে মেয়েটার কোনো গড়বড় হয়নি।

অতএব ওর এই হতভম্ব দশাটা কাটিয়ে দেয়া দরকার।

"এই যে জিয়া গ্রহটা," কম্যান্ডার বলতে শুরু করল, "আমি জানি যে তুমি একে গভীর আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছ, একজন সংগ্রাহকের যতটা করা দরকার তার থেকেও বেশি মনোযোগ দিচ্ছ। তবে একটা জিনিস জেনে রেখো, গ্রহটার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ধ্বংস হতে বেশিদিন লাগবে না এর।"

সাতাশ নম্বর হঠাৎ চিবুক তুলে কম্যান্ডারের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি যেন কম্যান্ডারের শরীর অনায়াসে ভেদ করে চলে যাচ্ছিল। ওরকম করে কী দেখছে মেয়েটা সেইটা জানবার জন্য পেছনে ঘুরে দেখবার ইচ্ছে জাগছিল কম্যান্ডারের।

একটা অস্বস্তির অনুভূতি ছেয়ে ফেলছিল কম্যান্ডারকে। ছাগল দাড়িওলা তিরানব্বই নম্বরের কেজো ভণ্ডামি বা একশো চল্লিশ নম্বরের সর্বব্যাপী অসীম ঘেন্না এর কোনোটাই তাকে এরকম দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি। কিন্তু এখন এই কয়লার মতো কুচকুচে কালো চোখের মণিদুটোর স্থির দৃষ্টির সামনে সে থমকে গেল। আত্মবিশ্বাসটাই কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছিল তার সেই দৃষ্টির সামনে। কী করতে যাচ্ছিল সে? যা সে বলতে যাচ্ছিল সেটা যুক্তিযুক্ত, এই অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় এবং... মিথ্যে।

কম্যান্ডার মুখ ঘুরিয়ে নিল। যত্তসব উলটোপালটা ব্যাপার-স্যাপার! তার স্ট্র্যাটেজিতে কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না। এখন এখানে থাকতে থাকতেই অবাধ্য, একগুয়ে। মেয়েটার আত্মা থেকে জিয়ার সমস্ত ছবিকে ধ্বংস করে দিতে হবে। না হলে এরপর যখন অন্য কোনো সৌরজগতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সে, তখনও জিয়ার কথা তার মনে থেকে যাবে। সেটা বে-আইনি। নিয়মাবলিতে স্পষ্ট বলা আছে, যে একজন সংগ্রাহক তথ্য সংগ্রহ করবে, কিন্তু কোনো কিছু মনে রাখবে না। মহাকাশযান যখন কোনো গ্রহ ছেড়ে চলে যায় তখন সেখান থেকে জোগাড় করা সব তথ্য জমা করা হবে কম্যান্ড মডিউলের স্মৃতিকোষে আর নমুনাগুলো চলে যাবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা কিছু পাত্রে। সংগ্রাহকের মন সে-গ্রহের সমস্ত স্মৃতিকে মুছে ফেলে নিজের মস্তিষ্ককে তৈরি রাখবে পরের অভিযানের জন্য। লজিটেনিয়ান

মহাকাশযানের অসংখ্য অভিযান এবং সম্ভাব্যতা তত্ত্বর ওপর ভিত্তি করে বলাই যায় যে প্রত্যেকটা নতুন গ্রহ মানেই একেবারে ভিন্ন পরিস্থিতি, ভিন্ন শ্রেণীর জীবজগৎ, ভিন্ন সভ্যতা। অবশ্য শেষের বস্তুটা অধিকাংশ গ্রহেই পাওয়া যায় না।

এরপর একে ঠিক কী বলে বোঝানো যায় সেইটা ভাবতে ভাবতেই কম্যান্ডার কেবিনের ভেতর আরও কয়েকবার চক্কর কাটল। কিন্তু হঠাৎই, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে সাতাশ নম্বরের দিকে না তাকিয়েই খুব আস্তে আস্তে বলে উঠল, "এখন জিয়া যেরকম, লজিটেনিয়াও কিন্তু একদিন ঠিক সেরকমই ছিল।"

ছি ছি! গ্রেট লজিটেনিয়ার সঙ্গে, এমনকি তার অতীতের অবস্থার সঙ্গেও এই নির্বোধ জিনাইটদের অসভ্য দুনিয়ার তুলনা করাটা যে কতটা অপবাদসূচক তা কল্পনা করাও দুষ্কর!

"তবে সত্যি বলতে কী, জিয়ার এখন যে অবস্থা, লজিটেনিয়া কখনো ততটা খারাপ দশায় পৌঁছোয়নি। এখানে যা দেখছ, সেটাকে সভ্যতার করুণতম দশা বললেও ভুল হবে। বলা উচিত, একটা সভ্যতার অকালমৃত্যুর সূচনার অবস্থা এইটে। এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয়নি। ফলে এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নতি একেবারেই সম্ভব নয়। মানুষ এখানে নানা ভাগে বিভক্ত। তাদের ঘাড়ে ধরে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মানিয়ে একটা একক লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কোনো শক্তি গ্রহে নেই।"

"কিন্তু সভ্যতার এ মরণদশা এখানে হল কেন?" খানিকটা নিজের মনেই বলে চলেছিল কম্যান্ডার, "যেসব নজরদার ড্রোন জিয়ার চারধারে নানান কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের কাছ থেকে জানা গেছে, এ গ্রহের বাসিন্দা এক-এক উপজাতির উন্নতি এক-এক স্তরে রয়েছে। আর সে উন্নতিও নানান বৈপরীত্যে ভরা।

"আলাদা আলাদা উপজাতিদের আলাদা আলাদা শাসনতন্ত্র, আলাদা ঢঙের সরকারি, সামরিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কোনোটার সঙ্গে কোনোটা মেলে না। এক-একটা উপজাতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলোও আবার একে অপরের ওপর নজরদারি করে। এদের আচরণের অর্থ বোঝা দায়!

"একটা কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অভাবে প্রত্যেকটা উপজাতিই যেমন ঝগড়ুটে, তেমনই আগ্রাসী। কোনো উপজাতির নেতৃত্বে যেই কোনো দক্ষ লোক আসে, অমনি সে অন্য উপজাতির জায়গা দখল করে তার নিজের দলের সীমা বাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনো ভেবেও দেখে না যে এই নতুন দখল করা এলাকা তারা কতদিন নিজেদের শাসনে রাখতে পারবে।

"নতুন কোনো এলাকা জয়ের আগে অবধারিতভাবে যা চলে তা হল সে এলাকার সঙ্গে বাণিজ্য, আর তার আড়ালে গুপ্তচরবৃত্তি। তারপর লড়াইয়ের সূত্রপাত করে সেই শক্তিশালী লোকটা। সে হয় উপজাতিটার রাজা, কিংবা কোনো নেতা, কখনো কখনো কোনো প্রধান পুরোহিত।

"তবে এই যুদ্ধযাত্রাটা সে করে তার উপজাতির স্বার্থে নয়, বরং ব্যক্তিগত লাভের খোঁজে। সেটা অবশ্য খুবই যুক্তিপূর্ণ কাজ। কিন্তু যখন সে যুদ্ধজয় করে ধনসম্পত্তি নিয়ে ফিরে আসে তারপর তার কাজকর্মগুলোর কোনো যুক্তি থাকে না আর। লুঠে আনা ধনসম্পত্তির খানিকটা সে দিয়ে দেয় রাজকোষে। সে-টাকার ওপর তার আর কোনো ব্যক্তিগত অধিকারই থাকে না। বাকি যা রইল তার অনেকটা অংশ আবার সে খরচ করে পুরোহিত সম্প্রদায় আর স্থানীয় ক্ষমতাবান লোকজনকে খুশি রাখবার জন্য। হাস্যকর বোকামো। ক্ষমতার যুদ্ধে যারা তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে কোথায় একেবারে শেষ করে দেবে তা না, তাদের খুশি করবার নামে, নিজের জোটানো ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে তাদের হাতই শক্ত করা! আর তারপর দেখা যায় এদের দমিয়ে রাখতেই তার সব শক্তি খরচ হয়ে যাচ্ছে।

"যুদ্ধে বিজয়ী হলে এমনকি সৈনিকদেরও যথেচ্ছ লুঠের ভাগ দেয়া হয় এখানে। যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের যতটা প্রাপ্য তার থেকে অনেক বেশিমাত্রায়। এতে সৈন্যগুলো বলা বাহুল্য গোল্লায় যায়। আরামের জীবন পেয়ে যুদ্ধ-টুদ্ধয় আর কোনো উৎসাহ থাকে না তাদের। বিজয়ী দলের সৈনিকদের প্রত্যেককে কয়েকটা করে ক্রীতদাসও দেয়া হয়। তার ফলে, আজ যে মুখ বুজে, কোনো ভাবনাচিন্তা না করে হুকুম পালন করা সৈনিক, কাল সে হয়ে ওঠে তার ক্রীতদাসদের হুকুম দেয়া

মালিক। হুকুম দিতে গেলে ভাবনাচিন্তা করতে হয়। আর এইভাবেই সমাজের এই নীচু স্তরটাতে স্বাধীন চিন্তাভাবনার মারাত্মক রোগটা দেখা দেয়।

"তার ওপর জিয়াতে আরও অনেক কিছুই হয় যা লজিটেনিয়াতে কল্পনাও করা যায় । যেমন ললিতকলা বা চারুকলার সৃষ্টি। ফালতু কাজ সব। সময় আর শক্তির চূড়ান্ত অপব্যয়। লজিটেনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এইসব শিল্পকলার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের তো একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া উচিত, জিনাইটদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই। কিন্তু লজিটেনিয়া তো আর সমাজসেবার কাজ করে না, তাই ব্যাপারটা নিয়ে আমারও মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। এখানে এসেছি, কিছু নমুনা সংগ্রহ করব তারপর বিদেয় হব, ব্যস।

"তাহলে জিয়াতে এখন ঠিক কী ঘটছে? প্রত্যেকটা উপজাতির এলাকাতেই সমাজের নীচুতলার মানুষ ওপরতলার কাছে পুরো বশ মানতে তৈরি নয়। বাধ্যও নয়। কারণ তারা তাদের নিজেদের পরিবার, জিনিসপত্র, দাসদাসী, পোষা জানোয়ারুএই সবকিছু টিকিয়ে রাখতে চায়। সমাজের উঁচুতলায় লোকসংখ্যা অযৌক্তিকরকম বেশি। তারা আবার চুড়ান্ত আলসে, গোলগাল, আর আর্ট-এর বিষে জর্জরিত। ক্রীতদাসের সংখ্যা প্রচুর। স্বাধীন। গরিব মানুষদের যে খুদকুঁড়োটুকু জোটে, তাও তাদের জোটে না। সুযোগ পেলেই তাই তারা বিদ্রোহ করতে তৈরি হয়ে যায়। যে বসতির এমন ছন্নছাড়া দশা, তাকে তার পাশের উপজাতি একদিন না একদিন আক্রমণ করে বসবেই। লড়াই হবে। একদল ধ্বংস হবে। আর এই লড়াই চলতে চলতে একদিন জিয়ার গোটা সমাজটাই ধ্বসে পড়বে।

"কথা হল, নিজে নিজে এই ত্রুটিটা সেরে ওঠবার কোনো রাস্তা কি আছে এই গ্রহে? । যুক্তি বলছে, নেই। কারণ জিনাইটদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। আর ক্রমশ বেড়ে চলা সেই এই বিপুল জনসংখ্যাকে খাওয়ার জোগান দেওয়ার ক্ষমতা এই গ্রহের নেই। নিজেদের মধ্যে এই লড়াইটা তাদের অবধারিত।

"সেক্ষেত্রে লজিটেনিয়ার সভ্যতাকে জিয়ার ওপর জোর করে আরোপ করার কোনো উপায় আছে কি? অবশ্যই আছে। এই গ্রহের হিসেবে কয়েকশো বছর ধরে

লজিটেনিয়ার শাসনে যদি এদের রাখা যায়, একমাত্র তাহলেই এদের বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু লজিটেনিয়া এধরনের সমাজসেবার কাজ করে না। তাই জিয়ার ব্যাপারে আমরা নাক গলাব না, তার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। না তাকে আমরা কোনো সাহায্য করব, না তাকে ধ্বংসের পথে যাওয়া থেকে আটকাব। তার প্রধান কারণ তাকে বাঁচিয়ে রেখে লজিটনিয়ার কোনো লাভ নেই। জিয়া এমনই এক গ্রহ যার গ্রেট লজিটেনিয়াকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই...”

কম্যান্ডার থামল। এতক্ষণ একসঙ্গে এরকমভাবে কথা সে অনেকদিন বলেনি। কিন্তু তার প্রতিটি কথাই যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানসম্মত। লজিটেনিয়ার সমীক্ষা সফরগুলোর প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা এইরকম, ‘একজন কম্যান্ডারের প্রধান কাজই হল মহাকাশযানের সমস্ত কর্মীদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং তাদের কর্মদক্ষতা বজায় রাখা। আর এটাই নিখুঁতভাবে করবার জন্যই সে মেয়েটাকে এতক্ষণ ধরে এই কথাগুলো বলে চলেছে।

“এখন যাও।” আর কথা না বাড়িয়ে কম্যান্ডার বলল।

সাতাশ নম্বর কিন্তু দরজার দিকে এগিয়ে গেল না। উলটে সে সোজা কম্যান্ডারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠল, “আমি জিয়াতে থাকতে চাই।”

কোনো জবাব দিল না কম্যান্ডার। সাতাশ নম্বরের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়ে সে খেয়াল করল, একটা অ-কম্যান্ডারোচিত অসীম নিঃস্পৃহতা তাকে গ্রাস করছে। সে বলে উঠতে যাচ্ছিল, ‘থাকো তাহলে’ বা ‘থাকা বা না থাকার মধ্যে কোনো ফারাকই নেই আমার কাছে।

একরকম জোর করেই কথাগুলোকে গিলে নিল সে। তারপর ফের বলল, “এসো আমার সঙ্গে।”

সাতাশ নম্বরকে নিয়ে মাঝের করিডোরে বের হয়ে এল কম্যান্ডার। তারপর ডেক কেবিন, রান্নাঘর পেরিয়ে যানে ঢোকার মূল দরজাও পেরিয়ে গেল।

“ওঠো।”

“প্রথম তলা। নমুনা সংগ্রহ করে রাখার সব কুঠুরিই ভর্তি।”

"ওঠো।"

দ্বিতীয় তলায় এল ওরা। সাতাশ নম্বর কী অসম্ভব লঘু পায়ে হাঁটছে! জিয়ার মহিলারা এভাবে হাঁটে না, যদিও এই মুহূর্তে এতে কিছুই যায় আসে না।

সাতাশ নম্বর তার চলার গতি কমাল। আরেকটা দরজা সামনে। ওরা সেটা পেরিয়ে গেল। আরও একটা। ওরা সেটাও পেরোল। আবার একটা। এই তিন নম্বর দরজাটার সামনে এসে সাতাশ নম্বর হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কম্যান্ডার থমকে দাঁড়ালেন।

আর কোথাও যেতে হল না সাতাশ নম্বরকে। যে কুঠুরিটার সামনে সে আছড়ে পড়েছিল সেটার দিকে চোখ পড়েছে কম্যান্ডারের। কুঠুরিটা ফাঁকা। এমন অনেকগুলো কুঠুরিই ফাঁকা রয়েছে এখনো। সেগুলো ভর্তি করবার মতো সময়ও আর পাওয়া যাবে না। এইখানেই তবে একে আটকে রাখা যেতে পারে।

"ঢোকো।"

সাতাশ নম্বর ঘরে ঢুকতেই দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। এ দরজা ভেতর থেকে ভোলা একেবারেই অসম্ভব।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কম্যান্ডার দ্রুতপায়ে যানের এয়ার লকের সামনে চলে এল। অভিযানের মোটামুটি সব সদস্যই মহাকাশযানে রয়েছে। কম্যান্ডার পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সুইচটা টিপে ধরল।

"ককপিট কর্মীরা এয়ার লকের কাছে রিপোর্ট করো। সমস্ত ড্রোন আর যানবাহন ফিরিয়ে আনবার আদেশ দাও। যা চিহ্নিত নমুনা এখনো তুলে আনা হয়নি সেগুলো আর আনবার প্রয়োজন নেই। যেসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের মহাকাশযানে বোঝাই করে এমার্জেন্সি টেক অফ-এর জন্যে তৈরি হও।"

৭.

কুঠুরির মেঝেটা খরখরে, তবে একেবারেই ঠান্ডা নয়। এই কুঠুরিগুলোয় অজৈব পদার্থের নমুনা রাখা হয়। সাধারণ অবস্থায় যে তাপমাত্রায় তাদের পাওয়া যায় সেই তাপমাত্রাতেই সংরক্ষণ করা হয়ে তাদের। সাতাশ নম্বর দু-হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে

বসল। রাত সবে শুরু হয়েছে। সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। এই সময়টুকুর মধ্যে সবচেয়ে ধীরগতির আর সবচাইতে ভারী সাইবারনেটিক যানে চড়েও ও অন্তত কুড়িবার জিয়ার ওই শহরটাতে যাতায়াত করতে পারত।

নাহ। সব শেষ হয়ে যায়নি এখনো। সব শেষ হয়নি। কম্যান্ডারের এতই তাড়া ছিল যে সে ওকে তৃতীয় লেভেল অবধি নিয়ে যায়নি। ওর সৌভাগ্যই বলতে হবে। তৃতীয় লেভেলে নিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকত না। ভাগ্যিস কম্যান্ডারকে বোকা বানানোটা কঠিন হয়নি! ব্যাপারটা খানিক অবাক হবার মতোই বটে। এত সহজেই ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলা গেছে যে ওর মনে হচ্ছিল ওকে আগে থেকেই কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল যেন। এমনিতে কোনো সংগ্রাহকের পক্ষে তার কম্যান্ডারকে বোকা বানানো সহজ কাজ নয়। যখন চারজন সৈনিক ওকে তাড়া করেছিল, ওর মনে হয়েছিল ও লজিটেনিয়ান নয়, বরং জিয়ার একটা ছোট্ট মেয়ে! আর ওর ভেতরে উঁকি মারা সেই মেয়েটাই এখন চালাকিটা করল। আটক হবার জন্য যে ঘরটা ওর দরকার ছিল, ও সেটাই বেছে নিয়েছে। কম্যান্ডার ওর কৌশলটা বিন্দুমাত্র ধরতে পারল না। হ্যাঁ, ভেতর থেকে এ দরজা খোলা অসম্ভব ঠিকই কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ দুরস্থান, একটা মাল বইবার সাইবারনেটিক যান তার খুদে বুদ্ধিতেও ওটাকে খুলে ফেলতে পারবে।

দরজার বাইরে কিছু একটা খসখস আওয়াজ হল, কিন্তু ও যার জন্যে অপেক্ষা করছে তার আওয়াজ এইটে নয়। এটা খুব সম্ভবত ক্যাটারপিলার বেল্টে চলা হালকা কোনো আয়নাইজার। তবে মাঝে মাঝেই যে গম্ভীর গুনগুন শব্দগুলো উঠছে, সেগুলো মাল বইবার সাইবারনেটিক যন্ত্রনের ইঞ্জিনের। একটার পর একটা বেরিয়ে যাচ্ছে মহাকাশযান ছেড়ে। প্রথম দলটা চলেও গেছে। এতক্ষণে তারা পাহাড় ডিঙিয়ে শহরের আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, ‘শামুক গুলোর খোঁজে। সাতাশ নম্বর আর তিরানব্বই নম্বর দু’ জনে মিলে এক-একদিনে দু-তিনশো এরকম শামুক গোটা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে এগুলোকে দেখতে অবিকল জিয়ার একধরনের শামুকের মতো, কিন্তু এদের ভেতরে একটা করে আণুবীক্ষণিক

ট্রান্সমিটার বসানো রয়েছে। সেগুলো রাতের দিকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে কাজ করে। এছাড়া প্রাথমিক কিছু স্মৃতি সঞ্চয় করার ক্ষমতাও রয়েছে এদের।

যেসব নমুনা মহাকাশযানে নিয়ে আসা হবে তাদের প্রত্যেকটার গায়ে এক-একটা এই শামুক আটকে দেয় সংগ্রাহকরা। সেই সঙ্গে কোন নমুনা কত নম্বর ঘরে আর কী অবস্থায় সংরক্ষিত করা হবে সেই হুকুমটাও ঢুকিয়ে দেয় তার স্মৃতিতে। এতে কোনোরকম গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, তা সে যত তাড়াহুড়ো করেই নমুনাগুলোকে মহাকাশযানে ভোলা হোক না কেন।

এরপর সাইবারনেটিক যন্ত্রযানগুলোর কাজ সহজ। রাডারের সাহায্যে রাতের অন্ধকারেই শামুকদের ট্রান্সমিটারগুলোকে খুঁজে বের করে, নমুনাগুলোকে মহাকাশযানে। নিয়ে এসে নির্দিষ্ট ঘরে রেখে দিলেই হল।

কম্যান্ডার সাতাশ নম্বরকে দ্বিতীয় তলায় নিয়ে গিয়েছিল একটাই যুক্তিতে। সে জানে, অজৈব পদার্থের নমুনা সংরক্ষণ করার এই কুঠুরিগুলো তার অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সকালবেলা সাতাশ নম্বর যে একটামাত্র নমুনা চিহ্নিত করেছিল সেটা যে এই ঘরেই সংরক্ষণের জন্যে নির্দিষ্ট, আর সেইজন্যই যে সাতাশ নম্বর ওর সামনে এসে অমন আছড়ে পড়বার নাটকটা করেছিল, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

অতএব সাতাশ নম্বরের কাজ এখন শুধু অপেক্ষা করা কখন সাইবারনেটিক যন্ত্রযান এসে নমুনা রাখবার জন্য এ-ঘরের দরজা খুলবে। হয়তো তার জন্য সময় লাগবে অনেকটা। কে জানে! দাঁতে দাঁত চেপে সে তাই সুযোগটার অপেক্ষায় রইল।

ওপরে, নীচে, সামনে করিডর ু সবদিক থেকে যন্ত্রপাতির ঝনঝন আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রচণ্ড নাড়াচাড়ায় মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে গোটা যানটা। সে টের পাচ্ছিল, আশেপাশের কুঠুরিগুলোর দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে বারবার। করিডোর দিয়ে কেউ কোনো জিনিসকে খুব তাড়াতড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। সেটা দু' পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে যাচ্ছে। ধাক্কা খেতে খেতে যাওয়ার সেই ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজটা বাড়া-কমা করতে করতে একসময় একেবারেই মিলিয়ে গেল। বোঝা

যাচ্ছিল উড়ানের জন্য তৈরি হচ্ছে মহাকাশযান।

সাতাশ নম্বর মেঝেতে তার মাথা, হাতের তেলো, তার গোটা শরীরটাই চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এই এত আওয়াজের মধ্যে সে সাইবারনেটিক যন্ত্রযানের চলার আওয়াজ আলাদা করে চিনবে কী করে? দেরি হয়ে গেছে! হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক আগেই এ নিয়ে ওর ভাবা উচিত ছিল। সকালবেলা একবারও পিছু না ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে যে ছুটটা দিয়েছিল সে, সেটা মহাকাশযানের দিকে হবার বদলে তার উলটোমুখে দেয়া উচিত ছিল। আসলে, সেই মুহূর্তটায় ভেবেচিন্তে কোনদিকে যাবে সেটা ঠিক করবার বদলে ওর উচিত ছিল, বুকের ভেতরে বসে থাকা জিয়ার সেই ছোট্ট মেয়েটার কথা শোনা। কতবারই তো ও-মেয়ে তাকে ঠিকঠাক পথ দেখিয়ে দিয়েছে! শুধু সেদিন সকালেই, কেন কে জানে, মেয়েটা তাকে উলটোমুখে নিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যন্ত্রযানের দ্বিতীয় দলটা আর বেরোয়নি। ঘরে ঘরে জোগাড় করে আনা নমুনা ভরবার কাজও প্রায় শেষের পথে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় দুম করে একটা আওয়াজ হল। শব্দটা কানে যেতেই লাফিয়ে উঠে হাতদুটো দুলিয়ে, মাথাটা সামান্য পেছনে হেলিয়ে ছুট দিল সাতাশ নম্বর।

৮.

শব্দ-টব্দগুলোর দিকে কম্যান্ডারের অবশ্য নজর ছিল না কোনো। সময় কোথায়? তার সামনে তখন কন্ট্রোল প্যানেলে উজ্জ্বল লাল অক্ষরের সার ঝলসে উঠছে ঘনঘন। সব যন্ত্রপাতি মহাকাশযানে তোলা শেষ।

কন্ট্রোল রুমের দরজাটা দমাস করে খুলে গেল হঠাৎ। ধাতব মেঝের ওপর নখের শব্দ খরখর শব্দ উঠছে। তার মানে একশো চল্লিশ নম্বর যানে ফিরেছে।

যানের প্রধান উত্তোলক যন্ত্র চালু হয়েছে এবার। রকেট থ্রাস্টারের চাইতে এতে শক্তি খরচ হয় অনেক বেশি। কিন্তু উপায় নেই। কোনো গ্রহের জনবহুল মাটি থেকে রওনা দেবার সময় ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি রকেট থ্রস্টারের আগুন গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে

নিজেদের উপস্থিতির জানান দেয়া বে-আইনি। তবে একবার উত্তোলক যন্ত্রের টানে নিঃশব্দে বেশ খানিক উঁচুতে উঠে গিয়ে তারপর রকেট থ্রাস্টার চালানোতে সমস্যা নেই কোনো। নীচ থেকে দূর আকাশের গায়ে সেই আলোর খেলাকে গ্রহের বাসিন্দারা মেঘের কোলে বাজ বিদ্যুতের খেলা বলেই ধরে নেয়।

কন্ট্রোল রুমের দরজাটা ফের একবার দমাস করে খুলে গেল। যাক! ছাগল-দেড়ে তিরানব্বই নম্বর ঢুকেছে অবশেষে! ব্যস! এবার মহাকাশযান উড়ানের জন্য তৈরি।

কম্যান্ডারের ছটফটানিটা একটু কমে এল এইবার। ইন্টারকমের সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েও কী ভেবে হাতটা ফের পিছিয়ে নিল সে। নাহ, আগে টেক অফ। হতচ্ছাড়া গ্রহের চৌহদ্দি ছেড়ে তারপর বাকি সব কাজ।

"টেক অফ!"

হাঁকটা দিয়েই কম্যান্ডার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটেটরগুলোর সুইচ অন করে দিল।

জিয়ার পৃষ্ঠতল থেকে মহাকাশযানটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। যানের ভিউ স্ক্রিন চালু করে দিল কম্যান্ডার। সেখানে একটা বিশাল অন্ধকার গোলক তাদের পায়ের নীচের অন্ধকারে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছিল। গোলকটার ডানদিকে সমুদ্রের খুব আবছা একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দেখে মনে হবে জনপ্রাণীশূন্য একটা গ্রহ এইমাত্র ছেড়ে এল তারা।

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ল। দৃশ্যটা সাতাশ নম্বরকে দেখানো দরকার। ভালোই হবে ওর তাতে। জীবনের চিহ্নহীন ওই মরা অন্ধকার একবার নিজে চোখে দেখলে, জায়গাটা ছেড়ে আসবার জন্য বোধ হয় আর কোনো আক্ষেপ থাকবে না তার। থ্রটল টেনে ধরে মহাকাশযানের উড়ানপথকে গ্রহটার সঙ্গে সমান্তরালে বেঁধে দিয়ে কম্যান্ডার কন্ট্রোল রুম ছেড়ে চলে গেল, সেখানে হাজির বাকি কর্মীদের দিকে ফিরেও তাকাল না একবার। বড়ো বড়ো পায়ে দ্বিতীয় লেভেলে উঠে এসে সে নির্দিষ্ট দরজাটার সামনে দাঁড়াল।

"বেরিয়ে এসো সাতাশ। আর আটক থাকবার দরকার নেই। আমরা এখন

মহাশূন্যে।” দরজাটা খুলে ধরে বলে উঠল কম্যান্ডার। সাতাশ নম্বর একটুও নড়াচড়া করল না।

“জিয়াকে এখনও দেখা যাচ্ছে। আমাদেরকে দেওয়ার মতো কিছুই ওই কালো গ্রহটার নেই। যাও, গিয়ে দেখো।”

সাতাশ নম্বর উত্তর দিল না।

“আমি তোমাকে কন্ট্রোল রুমে যেতে হুকুম দিচ্ছি সাতাশ!”

তরুণীটির একটা পেশিও এতটুকু নড়ল না। তার হাত নীচের দিকে আর মাথা পেছনে হেলানো। কম্যান্ডার চৌকাঠ পেরিয়ে তার কাছে গেল।

“তুমি...” বলতে বলতেই মাঝপথেই থেমে গেল কম্যান্ডার।

সাতাশ নম্বরের মুখের মতো তার চোখের মণিদুটোও সাদা হয়ে গেছে! যেন সে -দুটোর কোনো অস্তিত্বই নেই আর।

কম্যান্ডার সন্তর্পণে তার কপাল ছুঁল, তার গলা, হাতের ওপর আঙুল বোলাল।

পাথর!

কম্যান্ডার অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা বোঝার কোনো উপায় তার কাছে নেই। তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা মেয়ে কীভাবে পাথরে বদলে যেতে পারে? নিঃসন্দেহে খুবই উদ্ভট ব্যাপার। পাথরের মূর্তির মতো রূপ নেয়া... সেটা সম্ভব। কিন্তু সত্যি সত্যি পাথরে বদলে যাওয়া...

৯.

অন্ধকারে তার দুটি হাত ছড়িয়ে দিল তরুণীটি। সূর্যোদয়ের আগে পাথর থেকে যদি হালকা অবলোহিত আলো বিকীরণ না হত তাহলে বোধ হয় ও গতকালের রাস্তাটা খুঁজেই পেত না, যেখান দিয়ে ওর ছাগল-দাড়িওয়ালা মনিটরের সঙ্গে ও গিয়েছিল আগের দিন! খাড়া চড়াই উঠে গেছে ওপরে, ছুঁচোলো পাথরের টুকরোতে ভর্তি পথ, থেকে থেকেই চপ্পলে সেগুলো ফুটে যাচ্ছে। সরু লিকলিকে কাণ্ডের সাইপ্রেস গাছগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তারা পাহাড় বেয়ে দৌড়ে

উঠে মহাকাশযানের কাছাকাছি চলে যেতে প্রস্তুত, যে মহাকাশযান রাতের অন্ধকারে চোরের মতো জিয়া ছেড়ে পালিয়েছে।

দু-পাশের এবড়োখেবড়ো দেয়ালগুলোর গায়ে হাতড়াচ্ছিল সে। খানিক বাদে দেয়ালের গায়ে একটা দরজার আভাস মিলল। ভেতর থেকে ফোঁপানি, কাতরানির আওয়াজ আসছে। নিশ্চয়ই কেউ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অন্য কারো ঘুম ভাঙিয়ে দেয়া ছাড়া এতে কারো কোনো ক্ষতি হয় না বিশেষ।

ওর সাদা জামা বেশ খানিকটা দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে ওকে যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে ওকে নির্ঘাৎ তাড়া করবে আর ও রাস্তা হারিয়ে ফেলবে, যা ও একেবারেই চায় না। খানিক বাদে, খুঁজতে খুঁজতে আগের দিনের সেই সরাইখানাটার কাছে এসে পৌঁছোল ও। গতকাল অনেক কষ্টে ওখানেই ওই বুড়ো লোকটাকে ফেলে পালিয়েছিল সে। তারপর খানিক এগিয়ে গিয়ে একটা খিলানের দরজা দিয়ে ও গলে চলে গিয়েছিল। তারপর বাকিটা পথ একাই গিয়েছিল।

একটু একটু করে ও গতকালের রাস্তাটা আবার খুঁজে বের করল। এই তো সেই লম্বা গাছের গুঁড়িটা! ওর ওপরে মেয়েরা জলের কলসি রাখে। এখান থেকে সে সরু একটা গলি ধরে পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছিল। জলজ ঘাসের তৈরি জাল নিয়ে যে ক্রীতদাস মাছ কিনতে যাচ্ছিল, তার সঙ্গেও ওর এখানেই দেখা হয়েছিল।

ক্রীতদাসকে দেখে ও ওর চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর একসময় টিলাটার চুড়োয় পৌঁছে ও লোকটাকে প্রথম দেখতে পায়।

লোকটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা অন্যান্য সব জিনাইটদের থেকে তাকে আলাদা। একটা ভাব দিয়েছে। মুখচোখ আলাদা করে তেমন বলার মতো কিছু নয়। সাতাশ নম্বরের সেসব মনেও নেই আর। শুধু লোকটাকে দেখে বুকের ভেতর উঁকি দেয়া ভালোলাগাটুকু মনে আছে। লোকটার জামাকাপড়ও খুব সাধারণ ছিল, এতটাই যে ওর কিছুই মনে নেই। একটা অদ্ভুত শান্ত দুঃখের আবরণে নিজেকে জড়িয়ে রেখে মাপা পদক্ষেপে সাতাশ নম্বরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল সে। অন্য জিনাইটদের মতো দু-চোখ দিয়ে তাকে গ্রাস করতে চায়নি। লক্ষ্যই করেনি তাকে।

পাহাড়ের মাথায় চড়ে লোকটা কী করছিল? সাতাশ নম্বর গতকাল সেটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন, যখন ও ভোর হওয়ার আগে হালকা ধূসর আলোয় আলোকিত আকাশটার দিকে তাকিয়ে দেখল, তখন বুঝল লোকটা পুবদিগন্তে উদীয়মান সূর্যটাকে দেখতেই পাহাড়ে উঠেছিল... ভোরের কোমল সূর্য!

গতকাল ও এসব কিছুই বোঝেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরপর লোকটাকে অনুসরণ করে গিয়েছিল সে। সমুদ্রতটের ধার ঘেঁষে সরু সরু গলিঘুজির গোলকধাঁধায় ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সাতাশ নম্বর বুঝতেই পারছিল না ওরা কোথায় যাচ্ছে, শহরের কেন্দ্রের দিকে, না তার উলটোদিকে। লোকটা একবারের জন্যেও তার চলার গতি বাড়ায়নি। ও ও ধীরেসুস্থে তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল। সেই করতে করতেই একটা অযৌক্তিক ভয় ক্রমশ ছেয়ে ফেলছিল ওকে। যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে যাবে। যে-কোনো মুহূর্তে! ও চাইছিল লোকটা আরও জোরে জোরে হাঁটুক। যদি ওর উপায় থাকত তাহলে ও লোকটাকে দৌড় করাত সেই মুহূর্তে। কিন্তু সে উপায় ওর কাছে ছিল না। তাই ওকেও আস্তে আস্তেই হাঁটতে হচ্ছিল। রাগ হচ্ছিল খুব ওর। শিশুসুলভ খামখেয়ালি রাগ। এই লম্বা, আঁকাবাঁকা পথের শেষে কী আছে কে জানে! নাছোড় একটা ভয় আর দ্বন্দ্ব ওকে। কুরে কুরে খাচ্ছিল সেই মুহূর্তে।

এখন ও নির্ভুলভাবে রাস্তা চিনে এগোচ্ছে। কোথায় কোন রাস্তায় বাঁক নিতে হবে, কোন চৌমাথায় যেতে হবে এই সবই ও জানে।

বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া আধো অন্ধকার গলিগুলোর ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে অবশেষে একসময় ও এসে পৌঁছোল কালকের সেই দরজাটার সামনে। পাথুরে দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা দরজা আর তাকে ঘিরে আইভি লতার ঝাড়। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর, কারণ এই গলির বাকি দরজাগুলো একেবারেই ছোটো ছোটো। এতই ছোটো যে একজন লম্বা জিনাইটকে মাথা নীচু করে ঢুকতে হয় তার ভেতর দিয়ে।

গতকাল ও বিনা বাধায় এই বড়ো গেটোটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পেরেছিল, কিন্তু এখন ওতে তালাবন্ধ, সম্ভবত ভোর হবার আগে খুলবে না।

সাতাশ নম্বর ওর উত্তোলক যন্ত্রটা চালু করে বাতাসে ভেসে উঠল। আইভি লতায় ছাওয়া দেওয়ালটা পেরিয়ে নিঃশব্দে এসে নামল ভেতরের উঠোনে। বাইরের রাস্তার থেকেও এখানে আরও বেশি অন্ধকার। তবুও ওরই মধ্যে শ্যাওলা-ধরা পাথরের কুয়োটা খুঁজতে ওর অসুবিধে হল না। শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে ও কুয়োর মুখের ঢাকাটা সরাল। তারপর নিজের বেল্টটা খুলে ফেলল। বেল্টে আটকানো আছে দুটো ছোটো চ্যাপ্টা বাক্স, একটা ট্রানসিভার আর একটা ব্যাটারি চালিত উত্তোলক যন্ত্র।

ছপ করে একটা আওয়াজ হল, যন্ত্রপাতি সমেত বেল্টটা জলের তলায় ডুবে গেল। ব্যস। এখন ওর কাছে আর লজিটেনিয়ার কোনো জিনিসই অবশিষ্ট নেই।

সূর্য এবারে উঠব উঠব করছে। এত তাড়াতাড়ি চারপাশ ফর্সা হচ্ছে যে কিছু বোঝার আগেই আরেকটা নতুন দিন শুরু হয়ে যাবে। পাখি ডাকতে শুরু করেছে, মুরগির ডাকও শহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে শোনা যাচ্ছে। সেই রহস্যময় লোকটা যদি আজকেও পাহাড়ের মাথা থেকে সমুদ্রের বুকে জিয়ার সূর্যোদয় দেখতে তাহলে এক্ষুনিই ও বাড়িটা ছেড়ে রওনা দেবে।

খুদে খুদে জানালাওয়ালা ছোটো বাড়িটার সামনে থেকে বাঁদিকে সরে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঘন ঝোঁপের ভেতরে লুকিয়ে পড়ল সে। গতকালও এইখানটাতেই লুকিয়েছিল সে।

আগের দিন এখানে এসেই ও টের পেয়েছিল, এই বাড়িটা একজন ভাস্করের কর্মশালা। পথঘাট, ঘরবাড়ি এইসবের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে লোকটা! বড়ো হতাশ হয়েছিল সে। যখন ও লোকটার পিছু নিয়েছিল তখন একটা ক্ষীণ আশা ছিল ওর মনে, হয়তো একে পর্যবেক্ষণ করে ও লজিটেনিয়ানদের সঙ্গে এই জিনাইটদের এতটা তফাতের কারণটার একটা আন্দাজ পাবে।

তফাতটা যে কী সেটা সে আগেই অনুভব করেছিল। জিনাইটদের প্রত্যেকেরই

প্রত্যেককে প্রয়োজন হয় কোনো না কোনো কারণে। লজিটেনিয়ানদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। সেখানে কেউ কারো ওপরে নির্ভর করে না। এখন অবধি কোনো লজিটেনিয়ান তার ওপর নির্ভর করেনি। সেও একইভাবে দ্বিতীয় কোনো লজিটেনিয়ানের ওপরে কোনো কারণে নির্ভর করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ওরা সবাই গ্রেট লজিটেনিয়ার অধিবাসী। একে অন্যের সঙ্গে যে সামান্য নির্ভরতার যোগসূত্রটা ওদের রয়েছে সেটাও নিতান্তই কেজো। লজিটেনিয়ার সেবার জন্য অভিজ্ঞ লজিটেনিয়ানদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞদের প্রশিক্ষণ নেয়া। ব্যস।

কিন্তু এখানে, এই জিয়াতে সবকিছুই আলাদা। এই ভিনগ্রহে পা দেওয়ার মুহূর্ত থেকে ও বুঝতে পেরেছে যে এখানকার অধিবাসীদের কোনো না কোনো কারণে পরস্পরের পরস্পরকে প্রয়োজন। ভরসা করবার জন্য, সঙ্গে চলবার জন্য তারা প্রতিমুহূর্তে উপযুক্ত সঙ্গীকে খুঁজে চলেছে। আর সেই সঙ্গী ও নির্ভরতাকে ইচ্ছেমতো বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও তাদের আছে।

সাতাশ নম্বর আরও বুঝেছিল যে ওকেও এদের দরকার এবং ওকে তাদেরই সম্পত্তিতে পরিণত করতে চাইছে তারা। কিন্তু কেন, তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু পথে ঘাটে বারংবার তাদের এই ইচ্ছেটার বহিঃপ্রকাশ সাতাশ নম্বরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলছিল ওর মধ্যে।

অথচ আগের দিন সকালে এই লোকটার সঙ্গে দেখা হবার পর তার কাছ থেকে মোটেও পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়নি ওর। হয়তো সে তার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি বলেই!

খানিক বাদে, তার পিছু করতে করতে সাতাশ নম্বর ভাবছিল এই লোকটাও যদি অন্য জিনাইটদের মতো হয় তাহলে কী হবে? ও কি ভয় পাবে? কথাটা মনে আসতেই ও খুব অবাক হয়ে খেয়াল করেছিল যে, একবিন্দু ভয় জাগছে না তার মনে। অন্যান্য জিনাইটদের দৃষ্টিতে যে লোলুপতা ও এই ক দিন দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তা এই লোকটার দৃষ্টিতেও কল্পনা করার চেষ্টা করেছিল সে এরপর। কিন্তু চেষ্টাটা করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পেরেছিল, সেটা এর প্রকৃতির সঙ্গে

একেবারেই বেমানান। এই জিনাইটের সৃষ্টি সারা দুনিয়ার শাসক হবার জন্যে। নম্র, খানিক খামখেয়ালি, ভালোবাসা যায়। হয়তো এই জন্যেই সবাই এর আধিপত্য স্বীকার করবে।

তারপর একসময়, তার পিছু পিছু এই উঠোনে এসে পৌঁছে, এই ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে জিনাইটটাকে কেবল দেখে গিয়েছিল ভিনগ্রহী সাতাশ নম্বর শিশুর সারল্য নিয়ে, কোনোরকম 'অশুভ' সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত হয়ে, এক অপ্রমেয় বিশ্বাসে স্থিত হয়ে। আর সেই বিশ্বাসে ভর করেই সে অবশেষে জানতে চাইল, কেন একজন জিনাইট আরেকজন জিনাইটের ওপরে নির্ভর করে? কেন তাদের একজনকে আরেকজনের প্রয়োজন হয়? আর সেই মুহূর্তে, তার অস্তিত্বের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন জিনাইটটার দিকে চোখ ফেলে নিজেকে বিশ্রীরকম অপ্রয়োজনীয় ঠেকছিল তার। জিয়ার বুকে একটা ভিনগ্রহী প্রাণী। তাকে কারো প্রয়োজন নেই এখানে।

সামনে, একেবারেই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। কিন্তু তাকে ডাক দেবার মতো সাহস জোগাড় করতে পারছিল না সাতাশ নম্বর। কিন্তু তবুও, জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি ও। লোকটার স্টুডিওর কাছেই আঙুরলতার ঝোপে তেমনি করেই লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়।

সেখান থেকে স্টুডিওর ভেতরটা দেখা যায়। তার মেঝেময় পাথরকুচি ছড়ানো। কালো পাথরের দেয়ালের সামনে সাদা ফুলদানি আর লালচে বেগুনি রঙের মাটি থেকে তৈরি জন্তুজানোয়ারের ছোটো ছোটো মূর্তি। আর ঘরটার একেবারে মাঝখানে হালকা রঙের সুতি কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি রয়েছে। লোকটা ততক্ষণে তার সেই স্টুডিও ঘরে ঢুকে এসেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কাপড় দিয়ে ঢাকা মূর্তিটার দিকে। মনে হচ্ছিল আবরণ সরিয়ে মূর্তিটাকে দেখার জন্যে লোকটা যেমন উদগ্রীব, তেমন আবার ভীতও। যেন এইটাই তাকে ঘিরে রাখা সেই শান্ত বিষণ্ণতার উৎস। তার মানে ব্যাপারটা এই! তার অধরা দেবীর মূর্তি! হাহ! মানব শরীরের অমার্জিত একটা প্রতিকৃতি...

লোকটা মাথা নীচু করে মূর্তিটার দিকে আরও এক পা এগোল, যেন নিজের এই সৃষ্টির দিকে তাকাতেও চাইছে না। তারপর কোনোদিকে একবারও না দেখে একটানে কাপড়টা সরিয়ে নিল।

মূর্তিটা কোনো দেবীর নয়! মূর্তিটা সাতাশ নম্বরের! যে জিনাইট রূপ ধরে এই গ্রহের বুকে নেমে এসেছে সে, পাথরের পাদানির ওপরে দাঁড়িয়ে শ্বেত মর্মরের মূর্তি হয়ে সে রূপটাই এখন তাকিয়ে রয়েছে মানুষটার দিকে।

লোকটা মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, তার রগ তখন মূর্তিটার পাদমঞ্চে ঠেকানো। তার মুখটা দেখা যাচ্ছিল খানিক। লোকটা কাঁদছে।

তরুণীটি যেন প্রবল এক ধাক্কা খেল। এ তার কাছে অবিশ্বাস্য। এক পা, এক পা করে ও পিছিয়ে এল। যে দুনিয়ার অংশ সে কোনোদিনই হতে পারবে না, সেখানে একটা লোক ওর পাথরের মূর্তির সামনে কাঁদছে! দৃশ্যটা দেখবার পর সেখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল না তার। সে লজিটেনিয়ার জীব। এই গ্রহের নিয়মকানুন, আচার আচরণ চিরকালই তার বোধগম্যের বাইরে থাকবে।

পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে মহাকাশযানে ফিরে এসেছিল সাতাশ নম্বর। নিজেকে এই গ্রহের বুকে একজন ভিনগ্রহী ভেবে কেন যে এত যন্ত্রণা হচ্ছে তার, কেন যে এখানে নিজেকে এত অসাড়, এত অপ্রয়োজনীয় ঠেকছে, কেন যে তার বুকটা হঠাৎ বিনা কারণে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, তার কোনো আন্দাজ তার কাছে ছিল না। লোকটার কাছে তার মূর্তি আছে। তাই তাকে আর তার প্রয়োজন নেই কোনো। এই উপলব্ধিটা কেন যে বারবার ছুরির মতো বিঁধে চলেছে তার বুকে, তা সে বুঝতে পারছিল না, আর তাতেই সে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ছিল। কাজকর্ম ফেলে মহাকাশযানে এসে পৌঁছে সটান নিজের কেবিনে এসেছিল সে। জিনাইট বা লজিটেনিয়ান্ কারো সান্নিধ্যই তখন ওর কাছে স্বস্তিদায়ক ছিল না, ও সম্পূর্ণ একা থাকতে চেয়েছিল।

কিন্তু একা থেকেও ও নিজেকে শান্ত করতে পারল না। কারণ ও যা দেখেছে সেটা অভাবনীয়। যে রূপ ধরে ও এই গ্রহের বুকে পা দিয়েছে, এক অজ্ঞাতপরিচয়

ভাস্করের স্টুডিওতে সেই রূপটার মূর্তি এল কেমন করে? ও তো মাত্র তিনদিন হল জিয়াতে এসেছে! ওই মূর্তি তৈরি করতে যে তিনদিনের অনেক বেশি সময় লেগেছে সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত।

তার মানে... ওই ভাস্কর ওর নয়, অন্য কারো মূর্তি গড়েছে? কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে এই সাদৃশ্যটা কী করে হল?

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, যখন মহাকাশযান থেকে কেউ জিয়াতে নামেনি, সাইকমরা তখন জিনাইটদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে এই মূর্তিটাকে দেখতে পায় আর সাতাশ নম্বরকে এর রূপ ধারণ করতে পরামর্শ দেয়?

নাহ, তা হতে পারে না। সাইকমদের ভুল হয় না। একটা মূর্তিকে জীবন্ত ভেবে সে-রূপ কাউকে ধারণ করতে বলতে পারে না তারা। জিয়ার মেয়েদের বাহ্যিক চেহারা-সংক্রান্ত যত তথ্য পাওয়া গেছে তার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে এক অল্পবয়সী আদর্শ জিনাইট রমণীর রূপ সৃষ্টি করেছে তারা সাতাশের জন্য। তবে অন্ধভাবে কোনো মেয়ের ছবি নকল করে তার রূপটা গড়া হয়নি। সেটা সাইকমদের কাজের পদ্ধতি নয়। বরং এখানকার মেয়েদের চেহারা-সংক্রান্ত তথ্যগুলো থেকে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো বাদ দিয়ে শুধু সঠিক। বৈশিষ্ট্যগুলোকেই একত্র করে গড়ে তোলা হয়েছে সাতাশ নম্বরের প্রস্তাবিত রূপ। সাতাশ নম্বর তাই জিনাইটদের প্রজাতির একজন আদর্শ তরুণী, মানে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে থাকলে একজন জিনাইট রমণীর যে চেহারাটা হবে সাতাশ নম্বরের চেহারাটাও ঠিক তাই। ঠিক যেমনভাবে একশো চল্লিশ নম্বর জিয়াতে পাওয়া যায় এরকম চমৎকার একটা কুকুর আর তিরানব্বই নম্বর করুণা উদ্রেককারী এক ভিখারি।

তার মানে ওই অজ্ঞাত ভাস্করও আদতে একজন আদর্শ জিনাইট নারীর মূর্তি গড়ছিল... সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে থাকলে একজন জিনাইট রমণীর যে চেহারাটা হবে...

কিন্তু... কেন? একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি দিয়ে সে...

ঠিক তখনই তরুণীটি লক্ষ করেছিল, সারা সকাল যে শামুকটা ওর হাতে ছিল

সেটা আর তার সঙ্গে নেই। সেটার স্মৃতিকোষে মহাকাশযানের দ্বিতীয় লেভেলের অব্যবহৃত একটা কুঠুরির নম্বর লাগানো ছিল। লোকটার বাগান থেকে কিছু একটা স্মারক জোগাড় করে নিতে চেয়েছিল সাতাশ নম্বর, আর তারপর, চলে আসবার আগে, একরকম নিজের অজান্তেই শামুকটাকে সে ছুঁড়ে দিয়ে এসেছিল মূর্তিটার শরীরে!

ঠিকই আছে। রাতে একটা স্বয়ংক্রিয় যান শামুকের সংকেত ধরে মূর্তিটাকে তুলে এনে দ্বিতীয় তলের ওই কুঠুরিটাতে ঢুকিয়ে রাখবে। কেউ ওদিকে নজর দেবে না। সামান্য একটা মাল রাখবার গুদামে উঁকি দেবার আগ্রহটাই বা হবে কার? শুধু সবার চোখের আড়ালে সাতাশ নম্বর একলা একলা সেখানে যাবে। নিজেকে দেখবে... নিজের মূর্তিকে... বুঝতে চাইবে, পাহাড়ের মাথায় জীবন্ত তাকে কেন না দেখে এমন উপেক্ষা করল ওই যুবক, অথচ স্টুডিওর নির্জনে তারই মূর্তির পায়ে মাথা গুঁজে কেন সে কাঁদে?

তাই হোক। পাথরের মূর্তিটা তোমার বেশি প্রিয় হল বুঝি? আমিও পাথর হব তবে। কোন গুণে আমার রক্তমাংসের চেয়ে ওই পাথর তোমার প্রিয়, যদি তা বুঝতে পারি।

কঠিন কিছু নয়। পোশাক-আশাকগুলো পালটে ফেলা, তারপর শরীরটাকে মর্মর-শুভ্র একটা রঙে বদলে নেয়া... এইবার... যদি তুমি দেখতে আমায়, বুঝতে তোমার গড়া, তোমার ভালোবাসার ওই পাথরের মূর্তির সঙ্গে আর কোনো তফাত নেই আমার...।

আর এই সময়েই কম্যান্ডার এসে দাঁড়িয়েছিল তার কেবিনের দরজায়। এই সময়েই কম্যান্ডার তাকে দেখে ফেলল। তারপর সাতাশের কাছে তার প্রশ্নের কোনো জবাব না পেয়ে লোকটা জিয়ার নিন্দামন্দ শুরু করে দিল।

আর যত বেশি যুক্তিজাল ছড়াচ্ছিল লোকটা, সাতাশ নম্বরের ভেতরে একটা ইচ্ছে ততই বাড়ছিল। জিয়াতেই থেকে যাবে সে। এই তার আসল জায়গা। তারপর, জিয়া যে কেন শীগগির ধ্বংস হয়ে যাবে সেকথা অনেক অকাট্য যুক্তি দিয়ে তাকে

বুঝিয়ে ছাড়বার পর কম্যান্ডার যখন তাকে তাদের সুদূর, মহান মাতৃভূমি লজিটেনিয়ার কথা শোনাচ্ছে, ততক্ষণে সে জানে, এই বিশ্বসংসারে আরও একটা জায়গা আছে যেখানে, যেখানে ও ঘর বানাতে চায়। সাতাশ নম্বর জানে যে ও কোনোদিনই পরিপূর্ণ একজন জিনাইট রমণী হয়ে উঠতে পারবে না। নিজের অজান্তেই কিছু না কিছু তফাত রয়েই যাবে। কিন্তু তবুও, ও তাইই চায়।

ওই বিষণ্ণ ভাস্করের কাছে যাবার জন্য, তার চোখের জলের পুজো পাবার জন্য নিজেকে মূর্তিতে বদলে নিতেও রাজি সুেহ্যাঁ, প্রাণহীন, স্থাবর একটা মূর্তি। যদি সে মূর্তিকে সে চোখ চেয়ে দেখে তাতেই তার পরম পাওয়া হবে।

কম্যান্ডার তখন নিজের মনেই বকবক করে চলেছে। গ্রেট লজিটেনিয়ার অধীনস্থ দূরদূরান্তের গ্রহদের কথা, অসীম মহাশূন্যের কথা। সাতাশ নম্বর মনে মনে হাসছিল এসব হেঁদো কথা শুনে। কম্যান্ডারের প্রতি ওর মনে তখন অবজ্ঞামাখা করুণা! কারণ ঠিক কোন স্বর্গীয় অনুভূতির ছোঁয়া পেয়েছে তার মন, সেকথা এ লোকটাকে সে বলতেও পারবে না, আর বললেও তা হৃদয়ঙ্গম করা এই লোকটার সাধ্যের বাইরে। একটা তুচ্ছ, প্রাণহীন বস্তু, যেটা প্রতিদিন ভোরবেলায় পাহাড় থেকে নেমে আসা এক বিশেষ জিনাইটের কাছে প্রয়োজনীয়, যার জন্য সে তার জীবন্ত প্রতিরূপকে দেখেও দেখতে পায় না, যার পায়ে সে চোখের জল ফেলে, সেই মূর্তিতে নিজেকে বদলে নিয়ে মানুষটার চোখের জলের অর্ঘ্য পাওয়াতে যে সুখ, আনন্দ আছে তা বোঝা কম্যান্ডারের পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্তত হাজারবার সাতাশ নম্বর এই এক দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করেছে... দিনের মধ্যে একবার একটা জিনিস, একেবারে ভোরবেলায়, ঢাকা দেওয়া কাপড়টা সরিয়ে লোকটা তাকে স্পর্শ করবে, কুচি কুচি পাথর ছড়িয়ে থাকা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসবে, লোকটার চুলগুলো তার শ্বেতপাথরের পাদমঞ্চ ছুঁয়ে যাবে...

বার বার এরকম অপরিচিত কল্পনায় ক্লান্ত হয়ে ও অপেক্ষা করছিল কম্যান্ডারের একঘেয়ে বকবকানি থামার জন্যে। কিন্তু কম্যান্ডার থামছিল না, সে বলেই যাচ্ছিল, বলেই যাচ্ছিল যেন এইসব কথাবার্তা সাতাশ নম্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে কম্যান্ডার যখন থামল তখন এই প্রসঙ্গ চিরতরে শেষ করার জন্যে ও বলল, “আমি জিয়াতে থেকে যেতে চাই।”

তারপরেই ওই ঘর, মহাকাশযানের উড়ে যাওয়ার আগের তুমুল কর্মব্যস্ততা, স্বাধীনতার জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং অবশেষে পালানো। পালাবার মুখে, কুঠুরির দরজা খুলে সেখানে সাইবারনেটিক যানের বয়ে আনা নিজের শ্বেতপাথরের প্রতিকৃতিটার দিকে একনজরও তাকানোর অবকাশ পায়নি সাতাশ নম্বর। তারপর পাহাড় পেরিয়ে সেই অন্ধকার গলিখুঁজিতে আসা, আর তারপর এই উঠোনে।

স্টুডিওতে ঢুকেই নরম একটা জিনিসের ওপর ওর পা পড়ল। নীচু হয়ে সেটা তুলে সে দেখে জিনিসটা মূর্তি ঢাকা দেওয়ার সুতির কাপড়টা। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। নিখুঁত চৌকো একেবার ধবধবে সাদা একটা পাথরের বেদি। তার ওপর থেকে মূর্তিটাকে শব্দহীন একটা আলট্রাসোনিক ব্লেড দিয়ে মাখনের মতো কেটে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের যানে।

বেদির ওপর উঠে দাঁড়াল তরুণীটি। এখন থেকে এটাই ওর ঠিকানা, ওর আশ্রয়। নিছক একটা প্রাণহীন মূর্তি হিসেবে। চিরদিনের মতো। ভোর থেকে শুরু করে সন্ধে অবধি ও এইরকমই প্রাণহীন, স্থাবর বস্তু হয়ে থাকবে। শুধু রাতে ও নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াবে, বাগানে যাবে, গাছ থেকে ফল পাড়বে, কনকনে ঠান্ডা জল তুলবে কুয়ো থেকে।

আশপাশ আরও পরিষ্কার হয়ে আসছে। সূর্য এখন বোধ হয় শহরের সবচেয়ে কাছের পর্বতশৃঙ্গর ওপরে আলো ছড়াচ্ছে। পাথরের দেওয়ালটার ওপাশের রাস্তায় কেউ একজন তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক অজানা, অবোধ্য ভাষায়। যে ভাষায় এখানকার স্থানীয় মানুষ কথা বলে এটা সে ভাষা নয়। ভিনদেশি কেউ হবে হয়তো!

আর দেরি করা যাবে না, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। মানুষটার সূর্যোদয় দেখে ফিরে আসবার সময় হল। তাড়াতাড়ি কাপড়টা দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিল ও। হাতদুটো নীচু করল, মাথাটা পেছনে সামান্য হেলাল, ঠিক মূর্তিটার মতোই। সারা

শরীর দিয়ে ও অনুভব করল যে দাঁড়ানোর এই বিশেষ ভঙ্গিমার সঙ্গে ও অভ্যস্ত। যাদের কাছ থেকে ও চিরদিনের মতো স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছে, তাদের সামনেও ঠিক এইভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল সে গতরাত্রে।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা ওর কাছে খুবই সহজ, কিন্তু এই সুতি কাপড়টার তলায় বেশিক্ষণ থাকলে দমবন্ধ হয়ে আসে। তবে উপায় নেই। ওকে এখন আক্ষরিক অর্থেই পাথরের মূর্তির মতো হতে হবে আর শরীরের একটা পেশিও একটুও না নাড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে। সেটা কেবলমাত্র একজন লজিটেনিয়ানের পক্ষে সম্ভব। আর শরীরের উষ্ণতা! হ্যাঁ, সেটাও কমাতে হবে। পাথরের মতোই ঠান্ডা হতে হবে তো ওকে! অসুবিধে নেই। শরীরকে নিয়ে এমনটা করাও লজিটেনিয়ানদের নাগালের মধ্যে। কিন্তু লোকটা এসে ওকে স্পর্শ করার আগেই ওকে এসব করতে হবে।

ছোটো ঘরটার দরজা এখনো বন্ধ। সাতাশ নম্বর আস্তে পাথরের মূর্তিতে বদলে গেল। শরীরের একটা পেশিও নড়ছে না ওর এখন। লোকটা এখন সমুদ্রতটের দিকে যাবে। হয়তো। কী দুঃখের কথা! একটিবার চোখ ভরে ওকে দেখতেও পেল না...

কিন্তু আজকে লোকটা সমুদ্রের দিকে যায়নি। সাতাশ নম্বর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে শরীরের তাপমাত্রা কমাচ্ছে তখন সবে। এমন সময় হঠাৎ লোকটা বড়ো বড়ো পা ফেলে স্টুডিওর ভেতরে ঢুকে এল। তারপর পাগলের মতো এক ঝটকায় এত জোরে কাপড়টা সরিয়ে নিল যে সাতাশ নম্বর বেদিটার ওপর টলমল করে উঠল একবার। আর তারপর নীচু হয়ে বসে ওর তখনও গরম থাকা পায়ের পাতায় নেমে এল মানুষটার উষ্ণ কামনাদীপ্ত ঠোঁট।

‘সব গেল!’ সাতাশ নম্বর ভাবল, ‘সবকিছু জলে গেল। আমার শরীরের উষ্ণতা ও টের পেয়েছে... এবার ও বুঝতে পারবে ওকে ঠকানো হয়েছে...

আমি...

তার পায়ে ঠোঁট ঠেকিয়েই লোকটা শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তীক্ষ্ণ চোখে

তার দিকে তাকিয়ে দেখছে সে। সব আশা শেষ। ধরা পড়ে গেছে সাতাশ নম্বর! একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শ্বেতপাথরের বেদি থেকে নেমে এসে যুবকের মুখোমুখি মাথা তুলে দাঁড়াল সে...

উত্তর-কথন

রাস্তার ডানদিকে উদ্ভট সব জন্তুদের মূর্তির সার। সেগুলো নানা রঙের জ্যাসপার কুঁদে তৈরি। জন্তুগুলোর মাথায় একাধিক শিং, তারা গুটিসুটি মেরে বসে আছে, একটার সামনের থাবা আগেরটার পেছনে তুলে দেয়া, তাদের চকচকে লেজের ডগাগুলো ওপরের দিকে উঁচু হয়ে রয়েছে। আকাশ পরিষ্কার, তবে মাঝে মাঝে খুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়া শুরু হয়েছে। বরফের মিহি গুঁড়োতে পথ ঢাকা, তার ওপর দু-জোড়া পায়ের ছাপ ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে গেছে বাঁয়ের দিকে।

"এদিকে।" পায়ের ছাপগুলোর দিকে ইশারা করে বীণা বলল।

সের্গেই বীণার হাত ছাড়ল, দু' জনে জেসপার পাথরের মূর্তিগুলোর ফাঁক দিয়ে গলে গেল। জায়গাটা পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে ভরা। বিশাল নানান রহস্যময় যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্রের ভাঙাচোরা টুকরো, মূর্তি, থাম এইসবের টুকরোটাকরা, প্লাস্টার ছাঁচ, মমির মতো স্টাফ করা মৃত পশুপাখি। আঙুরের লতায় এসে ঢেকে দিতে চাইছে। আবর্জনাগুলোকে। তাদের গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ।

"ভাবো একবার।" হাঁটতে হাঁটতেই সের্গেইয়ের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল বীণা, "এই সবকিছুই আমাদের গ্রেট লজিটেনিয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।"

"তবে এগুলোকে সংরক্ষণ করবার বন্দোবস্ত করা উচিত তোমাদের। প্রথমে প্রত্যেকটা জিনিসকে চিহ্নিত করে, তাকে বায়ুনিরোধক আবরণে ঢেকে তার ভেতরে, যে গ্রহ থেকে তাদের আনা সেখানকার আবহাওয়া তৈরি করা দরকার। সংখ্রক্ষণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত হবার পর না হয় প্রত্নবিদরা গবেষণা করে দেখবেন জিনিসগুলোকে।"

"সেসব বিশেষ কিছুই এখনও করে উঠতে পারিনি আমরা।" বীণা লাজুক মুখে

বলল, “দেখতেই তো পাচ্ছ অবস্থাটা...”

সের্গেই কোনো উত্তর দিল না। ভিনগ্রহ থেকে আনা জ্যাসপারের জানোয়ারের মূর্তি সংরক্ষণের চাইতে অনেক বেশি জরুরি কাজ থাকে একটা গ্রহে, সেকথা তার অজানা নেই।

“এসে গিয়েছি। দেখো দেখো...” হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে সের্গেইকে ডাক দিল বীণা।

রাস্তাটা সরু। পাশাপাশি দাঁড়ানো যায় না। পেছন থেকে এসে বীণার কাঁধ জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল সের্গেই। ঠোঁট আর গাল দিয়ে বীণার জলপাইরঙা মুখের উষ্ণতা নিচ্ছিল সে।

“কী সুন্দর, তাই না?” বীণা আবার বলল।

সের্গেই তাকাল। তার সামনে বরফের মাঝখানে কোনো উঁচু বেদি ছাড়াই শ্বেতপাথরের একটা মূর্তি দাঁড় করানো আছে। মূর্তিটা একজন পার্থিব নারীর। অপার্থিব রূপের আলোয় ঝলমল করছে যেন সে।

“এর নাম সাতাশ নম্বর।” বীণা বলল, “তোমার মনে পড়ছে?

“হতেই পারে না।” সের্গেই প্রতিবাদ করল, “এটা মানুষের মূর্তি। লজিটানিয়ানের নয়। তবে হ্যাঁ, এত সুন্দর, এত নিখুঁত আমাদের পৃথিবীর মেয়েরাও হয় না অবশ্য। স্বপ্নে কিংবা শিল্পীর কল্পনায় হলে অবশ্য...”

বীণা হাসিতে ফেটে পড়ল।

“না গো! এ সত্যি সত্যিই লজিটেনিয়ান মেয়ে ছিল। জাতে সংগ্রাহক। পুরোনো যুগে আমাদের গ্রহে এমন নানান সব সম্প্রদায় ছিল জানো তো? পৃথিবী গ্রহে সংগ্রহ অভিযান করতে গিয়ে ও এইরকম হয়ে যায়। যানের তার কম্যান্ডার, চার নম্বর, যতদূর মনে পড়ছে, সে-ই মূর্তিটাকে খুঁজে বের করে যানে করে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ওই থেকেই তো সবকিছুর শুরু। চার নম্বরের নেতৃত্বেই তো সে-যানের সবাই মিলে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে লজিটেনিয়ায়। পৃথিবীর মানুষের মতো লজিটেনিয়ানদেরও স্বাধীনভাবে ইচ্ছে মতন বাঁচবার অধিকারের দাবিতে লড়াই। এ

মূর্তিটা তাদের প্রয়োজন ছিল সে লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে, নিশান হিসেবে। তোমাদের পৃথিবীতে নিশান বলে কিছু আছে?”

এবার হাসার পালা সের্গেইয়ের।

“আছে তো। যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ জিনিস বয়ে নিয়ে যায় সৈনিকেরা। তবে লড়াই যখন হাতাহাতিতে নেমে আসে তখন আর ওর কথা কারো মনে থাকে না। আর লড়াই শেষ হবার পর নিশান দিয়ে সবচেয়ে দুঃখজনক কাজটা করা হয়। সেটা হল মৃতদেহকে ঢাকা দেয়া।”

“তুমি এত কিছু জানলে কী করে?” বীণা জিজ্ঞেস করল, “এসব কি পৃথিবীতে সত্যিই ঘটে?

“নাহ, পৃথিবীতে সেসব বহুকাল আগেই ঘুচে-মুছে গেছে। তবে অন্য অনেক গ্রহে এখনো... তুমি ভুলে যাচ্ছ কী করে যে আমি একজন নক্ষত্র-নাবিক? পাইলট?”

“নক্ষত্র-নাবিক! হুহ। গালভরা নাম।” বলতে বলতে বীণা ঘুরে তাকাল তার সের্গেইয়ের দিকে, “আমার কাছে ওর একটাই অর্থ, আমায় ছেড়ে বার বার উড়ে যাওয়া মানুষ।”

“এই...”

“চুপ করো।” আস্তে আস্তে বলল বীণা, “কথা বোলো না গো! একটু চুপ করে দাঁড়াই চলো দু’ জনে ওর সামনে।”

তারা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সেখানে তখন শুধু সূর্যাস্তের হালকা আলো, সফেদ আকাশ বেয়ে নেমে আসা ঝুরো তুষারের দল, শুভ্র বরফের মাঝে মাথা উঁচিয়ে থাকা শ্বেতপাথরের মূর্তিটা। পাতলা, ছিপছিপে কাঁধদুটো বীণার। সের্গেইয়ের শক্তিশালী হাতের আলিঙ্গনে ঢেকে গিয়ে তার হৃৎস্পন্দন সের্গেইয়ের শরীরকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

পেছনে পায়ের শব্দ উঠছিল। আরও কোনো জুটি হয়তো এসেছে মূর্তিটার সামনে একটুখানি দাঁড়াতে।

“ব্যস, আর নয়,” বীণা বলল, “চলো এবারে। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা

করছে।”

হাত ধরাধরি করে মূর্তিটার পাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তারা। খানিক এগিয়ে সের্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকাল ফের, “বীণা, লোকে এখনও এখানে আসে কেন?” সে জিজ্ঞেস করল।

ততক্ষণে অন্য একটি অল্পবয়সী জুটি মূর্তিটার সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে এসে, যেমনভাবে তারা দু’জন দাঁড়িয়ে ছিল খানিক আগে।

সের্গেইয়ের হাত বীণার কাঁধ জড়িয়ে নিল। তারপর একটু বাদে ফের সে একই প্রশ্ন করল বীণাকে, “লোকে এখনও এখানে আসে কেন?”

“ওই একটা প্রথা আর কী আমাদের। আর কিছু না।” খুব আস্তে আস্তে জবাব দিল বীণা।

ফের একবার সের্গেই মূর্তির সামনে এসে একে অন্যকে জড়িয়ে রাখা লজিটেনিয়ান জুটিটার দিকে ঘুরে দেখল। তারা তন্ময় হয়ে মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ বুকের গভীরে প্রথাটার কারণটা টের পেল সের্গেই। সামান্য কেঁপে উঠে বীণাকে জড়িয়ে ধরে তার কানে মুখ রাখল সে, “আমি একটা মুখ, আকাট মুখ। তা নইলে কেউ অমন প্রশ্ন করে?”

তার ঠোঁটদুটো বীণার ঠোঁটে জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের নিঃশ্বাস একে অন্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। বীণার এমনভাবে ভ্রু কোঁচকাচ্ছিল যেন সে কেঁদে ফেলবে এবারে। কিন্তু আসলে ও চুমুটাকে উপভোগ করছিল। খানিক বাদে ফের যখন চোখ খুলল ওরা, তখন মূর্তির কাছে ওরা দু’ জন আর পড়ে থাকা বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। একই সঙ্গে রোদও উঠেছে আর বরফও ঝরছে। ভারি সুলক্ষণ। বীণার মুখটা হাসিতে ভরে উঠছিল।

“একে বলে মাশরুম তুষার জানো তো, একই সঙ্গে রোদ উঠলে আর বরফ ঝরলে মাশরুম ভালো ফলে কিনা!”

“তোমায় বলেছে! একসঙ্গে রোদ উঠলে আর বৃষ্টি পড়লে তবে তো ভালো

মাশরুম গজায়! বরফ কোত্থেকে হবে?

"বোকারাম! এমন উদ্ভুট্টি যুক্তির কথা শিখলে কোথায়? এখানে?"

"উঁহু, শিখিনি। বানালাম। যাক গে, তোমার মাশরুম বরফ আর ঝরছে না।"

পেছনে আবার পায়ের শব্দ শুনতে পেল তারা। সাতাশ নম্বরের মূর্তির সামনে। আরেকটা জুটি এসে দাঁড়িয়েছে। "চলো, এবার যাই।" বীণা বলল।

"হ্যাঁ, সের্গেই সায় দিল, "কিন্তু ফ্লাইটের আগে আরেকবার এখানে আসব। হতে পারে পৃথিবীর জন্য ও কিছু বলে পাঠাতে চাইবে..." মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সের্গেই।

"সের্গেই," বীণা মাথা নাড়ল, "লেজেন্ড তো লেজেন্ডই হয়। মহাকাশে এত গ্রহ। থাকতে ও যে সত্যি সত্যিই পৃথিবীরই বাসিন্দা ছিল এ ব্যাপারে তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? জানো তো, সেই উড়ানটার কোনো প্রমাণই নেই। সশস্ত্র বিদ্রোহের সময়ে সমস্ত সংরক্ষণাগার পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সব পুরোনো তথ্য হারিয়ে গিয়েছে। রয়ে গেছে শুধু এই মূর্তিটা আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই কিংবদন্তি।"

"হয়তো তাই।" মাথা নাড়ল সের্গেই, "তবে আমাদের গ্রহেও এরকম কিছু গল্প আছে জানেনা! পাথরের সুন্দরীর ভালোবেসে মানুষ হয়ে ওঠা... পুরোটা মনে নেই যদিও। তাছাড়া এই যে মার্বেল দিয়ে মূর্তিটা বানানো, সেটা পৃথিবীতে প্রচুর মেলে। আর মেয়েটাও গড়নে পৃথিবীর মেয়েদের মতোই দেখতে তো! যদিও বড্ড বেশি সুন্দরী।"

"তবে এর উলটোদিকেও একটা শক্তিশালী যুক্তি আছে সের্গেই।" বীণার ঠোঁটদুটোতে দুষ্টুমিভরা একটা হাসি খেলা করে যাচ্ছিল, "জানো তো, আমাদের কিংবদন্তির সেই কম্যান্ডার 'চার' কী বলেছিল সেই গ্রহটা সম্বন্ধে? বলেছিল, একটা দেউলিয়া গ্রহ। গ্রেট লজিটেয়েনিয়াকে কিছুই দেবার নেই তার। তা তোমার কি মনে হয় তোমার অমন সমৃদ্ধ শক্তিশালী পৃথিবী গ্রহটার বিষয়ে ওকথাটা আদৌ খাটে?"

প্যাঁচে পড়ে মাথা নাড়ল সের্গেই, "আরে না। একেবারে না। হতেই পারে না, বুঝলে! নিশ্চয় অন্য কোনো ছোটোখাটো ফালতু গ্রহই হবে। মূর্তিটা অবশ্য এত

সুন্দর... তবে যাক গে। পৃথিবীর হতেই পারে না ওটা। কিছুতেই না।”

বীণা হাসছিল।

তুষারমানবের ডায়েরি

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের রাশিয়ার একটি আঞ্চলিক খবরের কাগজ 'ব্যানার অফ ভিক্টরি' তে খবরটা বেরিয়েছিল।

'হিটলারের বাহিনী যে চতুরতার সঙ্গে তাঁর বিমানবহরকে যুদ্ধে ব্যবহার করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দু দিন আগে, নবম ব্রিগেডের শিবিরের কাছে একেবারে অপরিচিত চেহারার একটা বিমান উড়ে আসে। বিমানের গড়ন একটু অন্যরকম ছিল, সম্ভবত অত্যাধুনিক কোনো ডিজাইনে তৈরি। বাহিনীর অগ্রিম ও মূল ঘাঁটি থেকে বিমানটিকে চিহ্নিত করবার পর তাকে আক্রমণ করা হয় ও তাতে বিধ্বস্ত বিমানটি ধীরগতিতে গোঁত্তা খেতে খেতে যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রু-এলাকায় নেমে পড়ে। গতকাল তুমুল অনুসন্ধান চালিয়ে আমাদের বহর ওই বিমানের কোনো হদিশ পায়নি। হয় ওটাকে কোনোভাবে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা আমাদের বোমারু হানায় সেটা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু বন্দি হওয়া ফ্যাসিস্টটার থেকে জানা যায়নি যে বিমানটার কী গতি হয়েছে।'

সামরিক বিদ্যালয়ের এক উপদেষ্টা ওই সংবাদপত্রের খবরের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বিমানবহর' গ্রন্থে এই বিষয়ে টিকায় লিখেছিলেন, 'বিশেষ অন্বেষণের পরেও ওই সংবাদের সততা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই।

ভলোকভ নামে এক প্রাক্তন স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রের জবানি

বর্তমানে আমি মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়য়ের একজন অধ্যাপক। গণিতশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি। অদূর ভবিষ্যতে 'অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'এর সদস্যপদ পাবার সম্ভবনা আমার প্রবল। আমার অনেক কাজই বিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত। খালি মার্লেই উলটো কথা বলেছিল; আমি নাকি আমার কাজে নতুন কোনো পথের দিশা দেখাতে পারিনি। মার্লে গণিতবিদ হিসেবে পৃথিবীর একদম প্রথম সারিতে।

স্কুলে আইনস্টাইন, গ্যালোয়া, নিকোলাই লোভাচিভাসস্কি প্রমুখ গণিতজ্ঞের সঙ্গে মার্লের অবদানের কথাও পড়ানো হয়। তবে আমি বিশ্বাস করি যে গণিতশাস্ত্রে মার্লের মতো নতুন পথের সন্ধান অন্তত আমার জীবদ্দশায় কেউ আর দেখাতে পারবেন না।

প্রায় সিকি শতাব্দী আগে, নোভোসিবিরস্কে স্নাতক স্তরের পাঠ নেবার সময় ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় আমি প্রাথমিক স্মরণশক্তির গাণিতিক মডেল শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। লেখাটা পড়ে আমার অনার্স সাবজেক্টের শিক্ষক অধ্যাপক দাভিদেস্কো আমাকে তুলোধোনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "একেবারে অপরিণত, ভুলভাল পদ্ধতি। সার্কাসে জোকারের লোক হাসানোর মতো ব্যাপার। তোমার উচিত মার্লের দলে যোগ দেওয়া। ও এইধরনের জগাখিচুড়ি জোকারের কাজ পছন্দ করে।"

মার্লে বিজ্ঞান জগতে যথেষ্ট সম্ভ্রম আদায় করে থাকলেও ওঁকে অপছন্দ করবার লোকের অভাব ছিল না। তার কারণও ছিল অবশ্য। এমন এক-একটা কাজ করে বসতেন ভদ্রলোক মাঝে মাঝে যেটা মোটেই তাঁর সুনামের সঙ্গে খাপ খেত না। কোনো সৌজন্যের ধার ধারতেন না। ভীষণ উদ্ধত আর চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং চূড়ান্ত অসামাজিক। কখনো নিজের তরফে কোনো ছাত্রকে কাজ করবার জন্য ডাকবেন না; যারা নিজে থেকে আসবে, তাদের মধ্যে থেকে উনি হাতেগোনা কয়েকজনকে বেছে নেবেন, আর বাকিদের সটান ভাগিয়ে দেবেন।

তবে এসব জানা সত্ত্বেও আমি একদিন ওঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে ধরে একরকম জোর করেই আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের কাগজগুলো ওঁর হাতে ধরিয়ে আমার কাজের সম্বন্ধে আমতা আমতা করে বলেছিলাম। উনি কোনো কথা না বলে বারান্দার বিশাল খোলা জানালার কাছে গিয়ে হাতের কাগজগুলো ওলটাতে লাগলেন। কিন্তু কোনোটাই ভালো করে দেখলেন না। তারপর ওতে আমার তৈরি যে অঙ্কের সূত্রটা নিয়ে দাভিদেস্কো আমাকে যাচ্ছেতাইভাবে অপদস্থ করেছিলেন, সেইটে নিয়ে খানিক কাঁটাছেঁড়া করলেন। তারপর মনে মনে খানিক বিড়বিড় করে

আমার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে বললেন, "তাহলে দাভিদেঙ্কো শেষমেশ তোমায় তাড়িয়েই ছাড়ল? অপরিণত! ভুলভাল! বেশ বেশ।" কথাগুলোর মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য আর শ্লেষের ভাব লুকোনো থাকছিল না। তারপর একটু থেকে ফের বলেন, "সূত্রটায় ত্রুটি আছে ঠিকই, কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে গবেষণার দিশা দেখিয়েছ মানতে হবে। আসলে, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় তোমার পথ তোমাকেই স্থির করতে হবে। এটাই বিজ্ঞান সাধনার মূল কথা। কাজ করতে গেলে ভুল হবে। তাই বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। ওই ভুলগুলোই তোমাকে সঠিক দিশা দেখাবে।"

আমার কাগজপত্রগুলো আমাকে ফেরত দিয়ে আর কোনো কথা না বলে উনি গটগট করে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন। খানিক পর ওঁর এক সিনিয়ার ছাত্র এসে আমায় জানিয়ে গেল, মার্লে আমাকে ওঁর কাছে কাজ করতে দিতে রাজি। আমি অবাক হয়ে গেলাম, উনি আমার নাম জানলেন কী করে? খানিক আগে কথাবার্তা বলবার সময় তো আমি নিজের পরিচয় দিতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর মনে হয়েছিল, হয় উনি আমার নাম ও কার্যকলাপ আগে থেকে জানতেন, না হলে নিজ উদ্যোগে আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি খুঁজে বের করিয়েছেন।

"আমার সঙ্গে কাজ করবার সিদ্ধান্তটা ভালো করে ভেবেচিন্তে নিয়েছ তো?" অনেকটা হুমকি দেবার ভঙ্গিতে কথাটা বলেছিলেন আমাকে মার্লে, "জেনে রেখো, আমার দলে যোগ দেওয়া অনেকটা সন্ন্যাস নেবার সামিল। হুঁ হুঁ, একেবারে মাথা মুড়িয়ে সন্নিসি হবার প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা নেবার মতো ব্যাপার।"

কথাটা ভুল বলেননি মার্লে। ওঁর বিভাগটা সত্যিই একটা মঠের মতো। অঙ্কশাস্ত্র এখানে ঈশ্বর, আর মার্লে হলেন তার প্রধান পূজারি। দিনরাত এখানে গণিতের সাধনা চলেছে। এখানে সপ্তাহান্ত বলে কিছু নেই। নেই দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম। এখানে আড্ডা মানে শুধুই বিষয়-সংশ্লিষ্ট তর্কবিতর্ক। লেকচার আর পড়ানোগুলো একেবারেই আর দশটা লেকচার বা পড়ানোর মতো নয়।

মার্লে প্রতিনিয়ত আমাদের ভেতরের জিজ্ঞাস্যগুলোকে আরও উস্কে দিতেন।

তবে তার পদ্ধতিটা মোটেই নরম-সরম ছিল না। বাইবেলে সেই যে আছে না, জ্বলন্ত ফার্নেসে লোকগুলো জ্বলছে কিন্তু পুড়ছে না, ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম হত। কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব কিংবা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের চলনের সূত্রগুলো পড়াতে পড়াতে মার্লে আমাদের একেবারে ধর্মযোদ্ধার তেজ নিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতেন।

সেন্ট্রিফিউজের তীব্র ঘূর্ণনের মতো শক্তিধালী সেই বৌদ্ধিক চাপ নিতে না পেরে অনেকেই ছিটকে যেত তাঁর বৃত্ত থেকে। কিন্তু আমি ছিটকে যাইনি। উলটে তার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আস্তে আস্তে। ওঁর সাহচর্যে দু'বছর ধরে আমি আমার তাত্ত্বিক বিষয়ের গভীর থেকে গভীরে ডুব দিয়েছিলাম একেবারে ওঁর আকস্মিক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

অনেকেই গুরুর আদর্শ চেলা' বলে আড়ালে আমাকে নিয়ে মজা করত। কিন্তু আমি সে-সব আদৌ গায়ে মাখিনি।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করত, "তুই এত এনার্জি কোথা থেকে পাস বল তো?"

"মার্লের এত শক্তির রহস্যটা কী? জানিস?"

"উদ্ভট জীব মাইরি! খায় তো কতকগুলো ঘাসপাতা। গরুমোষের জাবনা। আমি নিজে চোখে ক্যান্টিনে বসে ওইসব ঘাসপাতা চিবোতে দেখেছি। মাছ, মাংস দূরস্থান, কোনোদিন এক চামচে ক্যাভিয়ার পর্যন্ত খেতে দেখিনি। যদি এর এহেন এনার্জির উৎস জানতে কোনো কমিটি গড়া হয়, তারা কী খুঁজে পাবে জানিস? ও ব্যাটা নানান জাতের পাতা-লতা দিয়ে তৈরি কবিরাজি তেজবর্ধক গুলি খায় রোজ। অনেকেই বলে ওঁর বাড়িতে নাকি একশো বছর চলার মতো ওই গুলি রাখা আছে।"

আমি এসব কথার কোনো জবাব দিইনি। উলটে বলেছি, "খবর তো অনেক কিছুই রাখিস, কিন্তু কবিরাজি গুলি কোনো মানুষকে এতটা এনার্জি দিতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না।"

"আরে না না, তুই কিছু জানিস না, ওঁর কাছে বিশেষ জড়িবুটি আছে যেগুলো হিমালয়ের চূড়ায় পাওয়া যায়।"

“হিমালয়ের?”

“হুঁ হুঁ বাবা! ইয়েতির বাসা কোথায়? মাউন্ট এভারেস্টে! হ্যাঁ। মার্লে নাকি ওই এলাকার মানুষ। খুব ছোটবেলায় একদল ভূতাত্ত্বিক নাকি ওঁকে ওখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মানুষের আকারের হলে হবে কী, দেখিস না, কেমন খালি পায়ে বরফের ওপর হেঁটে বেড়ান? ওর পায়ের ছাপগুলো দেখেছিস? ঠিক ওই ইয়েতির মতো ধ্যাবড়া। পায়ের পাতার মাপ পায়ের অর্ধেকের বেশি। যদি উনি স্নো-বুট পরতেন তাহলে ছেচল্লিশ সাইজের জুতো বানাতে হত।”

আমি জানি মার্লে ন’ নম্বর জুতো পরেন। ঠিক আমার মাপের। এটা ঠিক ওঁর পায়ের পাতাগুলো একটু বড়ো। সেটার কারণও আমি জানি। সাঁতার। আমরা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে নিয়মিত সাঁতার কাটতাম।

তবে উনি যেখানেই যান, ওই ‘তুষারমানব’ নামটাও ওঁর পেছন পেছন তাড়া করে বেড়ায়। যদিও এই নামের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তলায় একটা পাতলা বর্ষাতি পরে, কোনো টুপি ছাড়া তুষারপাতের মধ্যে কেউ যদি খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, তাকে তুষারমানব নামের হাত থেকে কে বাঁচাবে?

নোভোসিবিরস্কে কাছের শহর আকাডেমগোরোদক। পুরোদস্তুর বিজ্ঞানীদের শহর। সেখানকার পুরোনো বাসিন্দারা শহরের নতুন অতিথিদের মার্লের সম্পর্কে বলতেন, “ও যদি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েও বরফের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, ওর কিচ্ছু হবে না। গায়ের চামড়া কী দিয়ে তৈরি কে জানে। ঠান্ডা ওর গায়েই ঠেকে না। মনে হয় এটা ওর কোনো জন্মগত গন্ডগোল। ওর গায়ের চামড়ায় বয়সের কোনো ছাপ পাবে না। ওর বয়স দেভিদেঙ্কোর সমান। দু’ জনেই প্রায় কুড়ি বছর আগে একসঙ্গে ইশকুল কলেজের পাট চুকিয়েছে। অথচ দেভিদেঙ্কোকে দ্যাখো! বিশাল ভূঁড়ি, মাথায় টাক। আর মার্লে? একেবারে তরতাজা। ঠিক যেন গোল কিপার লেভ ইয়াসিন। এখানে আসার পর থেকে ওর শরীরে কেউ কোনো বদল দেখেনি। একটা চুলও পাকেনি। চামড়ার কোথাও একটা ভাঁজ দেখতে পাবে না...”।

এটা ঠিক, ওঁর স্থির যৌবনকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখত।

“তোমার চিরযৌবনের রহস্যটা কী আমাদের বলবে, নাকি নিজের আত্মাটা ফস্তের কাছে বাঁধা রেখেছ?” মাঝে মাঝেই অনেকে মজা করে এই প্রশ্নটা ওঁকে ছুঁড়ে দিত। কিন্তু মজা ব্যাপারটা হয় উনি বুঝতেন না, অথবা উপভোগ করতে চাইতেন না। ঠান্ডা চাউনি ওঁর উত্তর হত।

যখন আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়, তখন কেউ সেরকম আর বোকা বোকা প্রশ্ন করে ওঁকে বিব্রত করত না। ব্যক্তিত্ব আর প্রজ্ঞার গুণে নিজেকে ততদিনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্য মাত্রায়। ছিপছিপে চেহারায়, পাকা গমের মতো রঙে উনি যেন প্রাচীন রোমান ঈশ্বর। মার্লের চেহারায় রাশিয়ানদের থেকে স্ক্যান্ডিনিভিয়ানদের সাদৃশ্য বেশি। ওঁর পদবি বিদেশি হলেও নামটা কিন্তু রাশিয়ান, নিকোলাই ইলিচ।

একদিন আমাদের পার্সোনেল বিভাগের এক কর্মী ওঁর এই মিশেল নাম রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

“বুঝলে, ওঁর নামটা পুরোটাই জালিয়াতি করে বানানো। মার্লে আর নিকোলাই ইলিচ, দুটোই! ওঁকে পাওয়া গিয়েছিল ৪৩-৪৪ এর যুদ্ধক্ষেত্রে। সারা গায়ে কালশিটের দাগ ভর্তি। একবিন্দু রাশিয়ান বা জার্মান বলতে পারত না। অঙ্গভঙ্গি করে তুতলিয়ে তুতলিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলত, ‘নিক... মার্লে... নিক... মার্লে।’

“প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন যে উনি বোধ হয় ফ্রান্সের নরমান্ডি-নেমান বিমানপপাতের বৈমানিক। কিন্তু ওঁকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানের আকাশে ওই বিমানবহর কোনোদিন ওড়েইনি। তাই ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার সময় ওঁর নাম লেখা হয়েছিল নিকোলাই মার্লে বলে। আর বাবার নামের জায়গায় যেই সার্জেন্ট ওঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে এসে বাঁচিয়েছিলেন সেই ইলিচের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।”

“ওঁর আত্মীয়দের কোনো খোঁজ করা হয়নি?” আমি জানতে চেয়েছিলাম।

“ভুলে যেও না তখন যুদ্ধ চলছিল।”

“যুদ্ধশেষে?”

“খোঁজ করা হয়েছিল। হাজারের বেশি ছবি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি।”

“কিন্তু ওঁর স্মৃতি তো অবিশ্বাস্য!”

“সেটা অনেকটাই নির্ভর করে কী বিষয়ে জানতে চাইছ। ওঁর অতীত, পরিবার বা বাসস্থানের কথা কিছুই বলতে পারেননি। এমনকি ভাষাটাও ওঁকে আবার শিখতে হয়েছিল। শোনা কথা, মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রাশিয়ান ভাষার অনেকটাই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। মাত্র একবছর লেগেছিল হাই স্কুল আর কলেজের পাঠক্রম আয়ত্ত করতে। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য নাম লেখান।”

“হাসপাতালে উনি কী ধরনের চিকিৎসা পেয়েছিলেন?”

“ওঁকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। ওইরকম অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন লোকের অতীতকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়াটা ডাক্তারদের কাছে ছিল বিস্ময়ের। মাত্র দু-বছরে অক্ষরজ্ঞান লাভ থেকে শুরু করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন অবিশ্বাস্য। কিন্তু উনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, অসম্ভবটাকে সম্ভব করা যায়। মাথায় একটা কালশিটের দাগ ছিল ওঁর। সেই চোটটাই ওঁর মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে আমূল বদলে দিয়েছে বলে চিকিৎসকদের ধারণা। চাইলে মার্লেকে জিজ্ঞেস করতে পারো।”

একদিন আমি সরাসরি এই ব্যাপারে মার্লেকে প্রশ্ন করেছিলাম।

“আপনার এই অসাধারণ স্মরণ ক্ষমতা কি সেই ছোটবেলা থেকে?”

মার্লে ঝটিতি জবাব দিয়েছিলেন, “ছোটবেলা? আমার ছোটবেলা শুরু হয়েছিল একটা সামরিক হাসপাতালে যখন আমার বয়স বছর সাতাশ কি তিরিশ।”

“কিন্তু মাথায় একটা কালশিটে কী করে মস্তিষ্কের স্মৃতির কোষগুলোর ক্ষমতাকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হল?”

উনি একটা বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, “দেশবিদেশের ডাক্তার-কবিরাজরা এই নিয়ে অনেক ভেবেছেন, কিন্তু কোনো হদিশ করে উঠতে পারেননি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আণবিক স্তরে স্নায়ুকোষের কাজকর্ম বুঝে ওঠবার মতো যন্ত্রপাতি

এখনো তৈরি হয়নি। তার থেকেও বড়ো কথা, যে বিস্ফোরণটার ধাক্কা এই নিকোলাই মার্লের জন্ম দিয়েছিল, তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের কিংবা সে প্রয়োগের ফলাফল মাপবার কোনো রেকর্ড নেই।"

সম্ভবত সেই প্রথম, শুধু আমার কাছেই মনটাকে খানিক খুলে ধরেছিলেন মার্লে। হয়তো আমার একাকিত্ব, তাঁর স্বভাবগত একাকিত্বকে কোথাও একটা স্পর্শ করেছিল।

কারণ, আমি তখন আকাঁদেমগোরোডোকে প্রথম বর্ষের ছাত্র। একটাও বন্ধু জোটাতে পারিনি তখনও। আমি ছোটবেলা থেকেই লাজুক প্রকৃতির। আর মেয়েদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতাম।

মার্লে একদিন আচমকা আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, "ভলোকভ, তুমি কারো প্রেমে পড়োনি? সবসময় তোমাকে একা দেখি?"

"স্যার, আপনিও তো..."

"আরে আমার কথা ছাড়ো, আমি একটা বুড়ো মানুষ।"

"স্যার, আপনি এতো লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনি ভালো করেই জানেন ইনা যতই উদাসীন হাবভাব করুক, আপনার প্রতি একটা আলাদা টান ওর আছে।"

"সে তো গ্রুপের বাকিও সবারই আছে। যে-কারো ভেতরে যে-কোনো ইমোশন জাগিয়ে তোলা আমার বাঁহাতের খেল হে! শুধু ওই উদাসীনতা ছাড়া।"

"আমি ঠিক সে অর্থে বলতে চাইনি প্রফেসর..."

"কিন্তু আমি ঠিক ওই কথাটাই বলেছি। আমাদের আয়ু খুব অল্প, যদি ঘরোয়া আনন্দেই মেতে থেকে জীবনের মেয়াদ শেষ করে দিতে চাও তাহলে আলাদা কথা। আর যদি বিজ্ঞান তোমার প্রেমিকা হয়, তবে তার প্রতিই অনুরক্ত থাকো। অন্য কিছুর জন্য তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না ভলোকভ।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা করিডোরে শুরু হয়ে এই অপ্রত্যাশিত আলোচনাটা চলেছিল প্রফেসরের বাড়ি পর্যন্ত। বাড়ির সামনে গিয়ে আমি ফের দাভিদেঙ্কোর গাল খাওয়া আমার সেই অঙ্কগুলো তাঁর হাতে গুঁজে দিতে তিনি হঠাৎ বললেন, "ভেতরে

এস ভলোকভ। কিন্তু খবরদার, গায়ের কোটটা খুলো না। আমি সকালবেলা জানালাগুলো খুলে রেখে গিয়েছিলাম। এই ঘরটা তোমার পক্ষে একটু বেশি ঠান্ডা।"

আমি শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলাম, "আপনি এখানে বসে কাজ করেন কী করে? বাইরে খোলা আকাশের নীচেও বোধ হয় এর চাইতে গরম।"

"সত্যি বলছি, হাওয়া না চললে আমি বাইরে বসে বরফের মধ্যে কাজ করতেই পারি। আসলে তো আমি একটা দানব তুষারমানব!" ঠোঁটের কোণে একচিলতে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে মার্লে বলেছিলেন।

টের পাচ্ছিলাম, ঠোঁটের কোণের ওই হাসিটা ছিল লুকোনো কষ্টের। আগে কখনো আমি ওঁকে হাসতে দেখিনি।

আমি সত্যিই খানিক অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

"আমি কিন্তু মজা করছি না প্রফেসর মার্লে। আমরা ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, আর আপনাকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে আপনার ঠান্ডা লাগছে।"

"এটা হল সেই বিস্ফোরণের ধাক্কার প্রভাব। আমার ত্বকের চরিত্রটাই বদলে গেছে। তা, তোমার কাগজপত্র কী বলছে?"

আমি আমার গাণিতিক সূত্রগুলো এগিয়ে ধরলাম। উনি এক ঝলক দেখে কী যেন ভেবে একপাশে রেখে দিলেন। স্পষ্ট ইঙ্গিত পরে দেখব'। কিন্তু কেন জানি না, আমি চলে আসতে চাইছিলাম না।

"প্রফেসর, আপনি যখন বিজ্ঞানের প্রতি অনুগত থাকার কথা বলছিলেন, তখন কি আসলে বিজ্ঞানীর কর্তব্যের ব্যাপারে..."

"হ্যাঁ। সেটা আমার বক্তব্যের একটা অংশ। যা করছি তার প্রতি সৎ থাকা। একেবারে গোঁড়া ধর্মান্ধের মতো সৎ। যার সেবা করছি তার জন্য ওই গোঁড়া ধর্মান্ধের মতোই প্রয়োজনে আত্মবলি দেয়া।"

'বড়ো বেশি আদর্শবাদ! আমি মনে মনে বললাম।

"ভীষণ আদর্শবাদী, না?" প্রফেসর বললেন।

আমি চমকে উঠলাম। আমি তো মুখে কিছু বলিনি, শুধু মনে মনে ভেবেছিলাম। তাহলে?

"আমি সবসময় আঁচ করতে পারি আমার প্রতিপক্ষ আমার সম্পর্কে কী ভাবছে।"

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম।

"তাহলে, তুমি ভাবছ আমি গোঁড়া আদর্শবাদী। তাই না? তোমরা নব্য যুবকরা একটা একেবারে আলাদা মনস্তত্ত্বের জীব, বুঝলে? তোমাদের চিন্তাভাবনাগুলো উদ্দাম, বেপরোয়া, সিনিক। তবে, বাঁচোয়া এই যে তুমি এদের মতো লম্বা-চুলো হিপি হয়ে কোনো বন্ধুর গিটারের সুরে দুর্বোধ্য গানও গাও না। তাহলে? নিজেকে ওদের ছাঁচে নাই বা ফেললে। যা সত্য, অলঙ্ঘনীয়, তা সবসময়ই অলঙ্ঘ্য। তুমি তাকে যেই নামেই ডাকো না কেন!"

আমার গবেষণা তখন জ্বণাবস্থায়। কাজটা শুরু করেছি সবে। এবারে এগিয়ে নিয়ে যাবার পালা। সেটা ছিল একটা রবিবার। এমনিতে রোববার রোববার স্কি করতে বেরোই। কিন্তু সেদিন তার বদলে একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় দূর থেকে দেখি আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক সহপাঠী ক্লিমুখেন মাতালের মতো টলতে টলতে আসছে। ও কাছে আসতেই চমকে উঠলাম। বরফভর্তি দস্তানা দিয়ে ও সমানে চোখের জল মুছছিল।

"তোমার যত নোটবই আছে এবার সব ছুঁড়ে ফেলে দাও।" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কাঁদতে কাঁদতে ও বলল, "সব পুড়িয়ে ফেললো। মার্লে মারা গেছেন।"

ওর কাছেই শুনলাম, সকালে স্কিইং করার সময় বাস স্ট্যান্ডের দশ-পনেরো মিটার দূরে মুখ থুবড়ে পড়েন প্রফেসর। মৃত্যুস্থলে ওঁর স্কি করার লাঠিদুটো বরফে গেঁথে ছিল। মার্লে কোনোদিন স্কি করার সময় জ্যাকেট-ট্যাকেট কিছু পরতেন না। এমনকি ওঁর লাল রঙের নাইলনের জামার কলারের বোতামটা পর্যন্ত খোলা ছিল। কিন্তু বরফে ঢাকা মুখটায় লেগে ছিল সুস্থ সবল পুরুষালি হাসি। ডাক্তাররা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে পৌঁছেও কিছু করতে পারেননি। এমনকি ওঁর যে কী হয়েছিল তাও বলতে

পারেননি।

মার্লে মারা গেলেন কী করে? তবে কি ওঁর হার্ট... সেটাই কি বিগড়েছিল! কিছুদিন আগে উনি এরকম একটা আভাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থ বলতে যা বোঝায় তা তো উনি কখনোই ছিলেন না! এমনকি সাধারণ জ্বর-সর্দিতেও কেউ ওঁকে ভুগতে দেখেনি। এই শহরের সব বিজ্ঞানীদের মতো ওঁকেও নির্ধারিত সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হত। কিন্তু কখনও ওঁর হৃৎস্পন্দনের চিহ্নে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েনি। ওঁর রক্তচাপ ও নাড়ির গতি সবসময় স্বাভাবিক থেকেছে। তাই পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সেনাইল আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস ও মস্তিষ্কে অকস্মাৎ রক্ত জমায় মৃত্যু স্ট্রোক এইসব দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম।

কোনো সন্দেহ নেই মৃত্যুর সময় প্রফেসার হয়তো তেমন কোনো ব্যথা-বেদনা ভোগ করেননি। ভোগান্তিহীন শান্তির মৃত্যু হয়েছিল ওঁর। কিন্তু সত্যিই কি ওঁর মৃত্যুটা সাধারণ ছিল? ময়নাতদন্তের রিপোর্ট গোপন রাখা হয়েছিল। মার্লের ব্রেন ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল নিউরোলজিক্যাল রিসার্চের জন্য। কিন্তু আদপেই ওটা নিয়ে কোনো নাড়াচাড়া হয়েছিল কি না, বা হলেও কে করেছিল বা তার রিপোর্টই বা কী, জানতে পারিনি। কে জানে কেন পুরো ব্যাপারটাই চেপে রাখা হয়েছিল।

বছরকয়েক আগে প্রফেসর মার্লের পোস্টমর্টেম টিমে থাকা এক ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে মার্লের শরীরে অনেক অস্বাভাবিকতা ছিল। বাইরে থেকে ওঁকে দেখতে একদম যুবকদের মতো দেখতে হলেও ওঁর ভেতরটা ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল। ওঁর হার্ট ভালো থাকলেও ভেইনগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। মেটাবলিজম ঠিক থাকলেও শরীরের অধিকাংশ গ্ল্যান্ড কাজ করছিল না। এছাড়া আরও একটা ডাক্তারি টার্ম উনি বলেছিলেন, যা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি মার্লের আসল রহস্য জানি।

মালেকে কবর দেবার সময় বহুকষ্টে চোখের জল চেপে রেখেছিলাম। সে সময় ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি আগামী দিনে কী ঘটতে চলেছে। আমার মনের ভেতর শুধু

মার্লের কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। চোখের সামনে ভাসছিল ওঁর মুখ। ওঁকে কোনোদিন দুঃখ করতে দেখিনি। দুঃখ করবেনই বা কীসের জন্য? ওঁর মনপ্রাণ জুড়ে বিজ্ঞান সাধনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওঁর শরীরের প্রতিটি কোষে জড়িয়ে ছিল বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। ওঁর কাছে ভালোবাসার একটাই সংজ্ঞা ছিল আর সেটা হল একজনের প্রতি অনুগত থাকা, আর সেই একজনও ছিল বিজ্ঞান।

ওঁর লেখা ১৬৮টি প্রবন্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ওঁর প্রতিটি তত্ত্ব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ওঁর অন্ত্যেষ্টির সময়ও জানতাম না যে জীবনের শেষ নিবন্ধটিতে যা বলেছেন, তার একক শক্তি ওই ১৬৮টি প্রকাশিত নিবন্ধ মিলে সৃষ্টি করতে পারেনি। আর এই প্রবন্ধটির খোঁজ মানব সমাজ পায় আমারই হাত ধরে। আর আমি প্রবন্ধটি পেয়েছিলাম স্বয়ং স্বর্গীয় প্রফেসর মার্লের কাছ থেকে! হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, স্বর্গীয় প্রফেসরের কাছ থেকে, আর সেটি এসেছিল সাধারণ ডাকযোগে।

ঘটনাটা একটু খোলসা করে বলি। মার্লের শেষকৃত্যের ঠিক দু-দিন পর, ডাকযোগে একটা মোটা প্যাকেট আসে আমার কাছে। প্যাকেট খুলতেই দেখি বেশ কয়েকটা মোটাসোটা নোটবই। উলটেপালটে দেখি নোটবইগুলোর চারটেতে ক্ষুদে গোটা গোটা অক্ষরে টানা লেখা। এই চারটেকে নোটবই না বলে ডায়েরি বলাই ভালো। আর একটা খাতা ভর্তি গাণিতিক সূত্রে। হাতে নিয়েই বুঝেছিলাম যে খাতাগুলো একদম নতুন। হ্যাঁ, আই কনফার্ম, প্যাকেটটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং মার্লে!

প্যাকেটের ওপর সেন্ডারের জায়গায় মার্লের নামে দেখে নোটবইগুলো হাতে নিয়ে আমার মনে একটাই চিন্তা এসেছিল। তবে কি মার্লে তাঁর মৃত্যুর দিনক্ষণ জানতেন? উনি কি আমাকেই ওঁর উত্তরসূরি ঠাউরে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অপ্রকাশিত কাজগুলো? আমি প্রথমেই ডায়েরিগুলো সরিয়ে রেখে তুলে নিয়েছিলাম গাণিতিক সূত্র লেখা খাতাটা।

প্রফেসর মার্লের প্রকাশিত গবেষণার বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাই না। এই

লাইনে সারা বিশ্বে খুব কম মানুষই আছেন যাঁরা ওঁর কাজের বিষয়ে জানেন না। বিগত পঁচিশ বছর ধরে তাঁর অবদানের কথা ভোলার নয়।

আমাকে পাঠানো নোটবইগুলোতে উনি শুধু অঙ্কই নয়, এর জ্ঞাতিগুষ্টির দল, যেমন জ্যোর্তিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও সাইব্যানেটিক্স নিয়ে পৃথিবীকে আসামান্য সব সূত্র উপহার দিয়ে গেছেন।

যদিও সাইব্যানেটিক্স বিষয়টি নতুন। এটি হল যন্ত্রকে প্রাণীর মনের কথা বোঝানোর উপায় বের করার গবেষণার একটা ধারা। ইউনিভার্স তথা স্পেস আর সাব-স্পেসের ঘূর্ণন ও তার ধাপ নিয়ে তিনি যা লিখে গেছেন তা শুধু এই শতাব্দীতেই নয়, আগামী শতাব্দীর কাছেও নতুন দিশা হবে।

কখন, কীভাবে যে তিনি এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করেছিলেন আর কেনই যে তিনি নিজে বেঁচে থাকতে এইসব কথা প্রকাশ করেননি, সব বলে গেছেন এই নোটবইগুলোতে। আর এমনভাবে লিখেছেন যে পড়তে পড়তে মনে হয় যেন উনি মুখোমুখি বসে বলছেন একের পর এক ঘটনা। একদিনে উনি লিখে শেষ করেছেন চার চারটে মোটা ডায়েরি। আর তার আগের রাতটা পুরোটাই কাটিয়েছেন অঙ্ক নিয়ে।

‘ভলোকভ, আমি তোমাকে আমার কিছু লেখা পাঠালাম। আমি নিশ্চিন্ত জানি তুমি যখন এগুলো পাবে, তখন আমি আর বেঁচে থাকব না। খুঁটিয়ে পড়বে, তারপর এইগুলো নিয়ে যা ভালো মনে হয় তাই কোরো। জেনে রাখো, এগুলো হল বিশ্বজোড়া সমস্ত দাভিদেঙ্কোদের উল্টোপাল্টা কথার উত্তর। শুধু তাই নয়, এগুলোই আমার একমাত্র প্রেমিকা, বিজ্ঞানের প্রতি আমার ভালোবাসার উপহার। ডায়েরির পাতায় পাতায় সব খুলে লিখেছি। আমার নিরামিষ ভোজনের কারণও বলেছি ডায়েরিতে।’

আজ পর্যন্ত কেউ জানে না এই ডায়েরিগুলোর কথা। সব আমার ড্রয়ারের এক গোপন খুপরিতে লুকোনো আছে। নোটবুকগুলোর প্রতিটি পাতার হাতের লেখা এমন সুন্দর, যেন। টাইপ রাইটারে লেখা। পুরো বিষয়টা এখনো গোপনই রেখেছি।

জানাব, নিশ্চয়ই জানাব। তবে তার আগে এগুলো আরও একবার পড়া দরকার। কিছু বিষয় আছে যা যতক্ষণ না প্রকাশের অবস্থায় আসে ততক্ষণ গোপন থাকাই ভালো।

প্রফেসর মার্লের নোটবই

নোটবই-১

'যেকোনো লোককে নিজের জন্মভূমি সম্পর্কে বলতে বললে সে কী বলবে? হয়তো সে আরম্ভ করবে মনের কোনায় ভেসে ওঠা একটি ছবি দিয়ে! আচ্ছা, ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে বলি। জীবনের শুরু কীভাবে হয়? প্রথমে যা দেখলাম তাই দিয়ে? যেমনি ধরা যাক, দোলনার ওপর ঝুঁকে থাকা একটা মানুষের মুখচ্ছবি দিয়ে? নাকি যা বোঝা যায় না এমন অবরুদ্ধ কান্না দিয়ে! আমার ক্ষেত্রে জীবনের শুরুটা হয়েছিল দু'বার। প্রথমটা আমার শিশুকালে। যার কিছুই আমার মনে নেই। কেউই তাঁর একদম জন্মের ঠিক পরমুহূর্তের কথা মনে করতে পারে না। কারণ সেই সময়কার স্মৃতি একদম শূন্য থাকে। বিলকুল জিরো। কিন্তু আমি আমার দ্বিতীয় জন্মের পরমুহূর্তের কথা একদম নিখুঁতভাবে বলতে পারি। সব মনে আছে আমার। যদিও আমার দ্বিতীয় জন্মের সময় স্মৃতির ভাণ্ডার মোটেই খালি ছিল না। আমার মস্তিষ্ক কোষ যে-কোনো প্রাণীর মতোই কাজ করছিল সে সময়। যেমন, কী করে খাবার খুঁজে বের করতে হয় বা কী করে বিপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়... আমার ব্রেন শব্দ ও দৃশ্যকে ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ করতে পারছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল কোনটা করা উচিত আর কোনটা নয়।

যখন চপ্পলের আওয়াজটা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসত, আমি বুঝতে পারতাম সাদা পোশাক পরা মহিলাটি আমার গা থেকে সরে যাওয়া কম্বলটা চাপিয়ে দিতে আসছেন। আমার পাশের টেবিলে বাসনপত্রের ঠনঠনানি শুনলেই বুঝতাম আমার জন্য কেউ খাবার আর চা নিয়ে এসেছে। যদিও তখন বুঝতাম না চা বা প্লেট কী। এই শব্দ বা জিনিস দেখিয়েই আমার দ্বিতীয় জন্মের প্রথমদিকে বাক্যালাপ চলত।

আমার দ্বিতীয় জীবনের প্রথম স্মৃতি হল একটি সাদা ঘর। যার কাঁচের জানালার বাইরে যতদূর দেখা যায় খালি ধপধপে তুষার, আর সেই ঘরের মাঝে দুটো বিছানা। তার একটায় মাথায় বিশাল পট্টি বেঁধে দিনভর শুয়ে ককিয়ে চলা একটা লোক। আর অন্যটায় স্নানের পোশাক পরে একটু পরপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকা পেল্লায় লাল মোচের কুতকুতে চোখের একটা লোক।

এই দ্বিতীয় লোকটাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। খুব খুশি হতাম লোকটা আমার কাছে এলে। আমি এখন লোকটার সবকিছু খুঁটিয়ে বলতে পারি। কিন্তু সে-সময় আমি জানতাম না মানুষ কী। জানতাম না গোঁফ, ঘর, বিছানা, পছন্দ কাকে বলে। আমি এসব শব্দই জানতাম না। কিন্তু শব্দ বা উচ্চারণের পার্থক্যগুলো ধরতে পারতাম। হাত-পা বা মুখের ভঙ্গি দেখে বেশ বুঝতে পারতাম সে কী বলতে চাইছে।

একদিন আমার খুব তেষ্টা পেয়েছিল। আমি একটা খালি গ্লাস বার বার ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে সাদা পোশাক পরা মহিলাটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম। আমি জানতাম সাদা পোশাক ও মাথায় রুমাল বাঁধা মহিলাটি জল বা চা দিয়ে যান।

ঠোঁটের কাছে আমার খালি গ্লাস বার বার তুলতে দেখে নার্সটি জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তেষ্টা পেয়েছে?”

“তেষ্টা পেয়েছে।” আমি নার্সের কথাটাই নকল করে বলেছিলাম।

খানিক পর নার্সটি চা নিয়ে এলে আমি গ্লাসটি ছুঁয়েই হাত সরিয়ে নিয়েছিলাম।

“গরম?” গোঁফওয়ালা লোকটা আমার রকম-সকম দেখে বলে উঠেছিলেন।

“গরম।” আমি লোকটির কথা হুবহু নকল করেছিলাম।

“আনা, এক গ্লাস জল নিয়ে এসো তো।” গুফো লোকটি নার্সটিকে বলেছিলেন।

নার্সটি জলভর্তি একটি গ্লাস আমার সামনে ধরেছিলেন। গ্লাসটা ঠান্ডা ছিল। আমি ঢকঢক করে গ্লাসভর্তি জল খেয়ে ফেলেছিলাম।

“জল।” লোকটা বলেছিলেন।

“জল।” লোকটার কথা আমি হুবহু নকল করেছিলাম।

"বুঝলে আনা, এ ছোকরাকে শেখাতে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

যদিও লোকটার কথাগুলো আমি আর বলে উঠতে পারিনি। কারণ অনেকগুলো শব্দ ছিল ওতে।

"অত নিশ্চিন্ত হয়ো না।" কটকট করে ফোকে কথা শুনিয়েছিলেন নার্সটি। যদিও কথা বলার ভঙ্গির জন্য ওই শব্দগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।

"একমিনিট দাঁড়াও।" লোকটি নার্সটিকে বলেছিলেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে নার্সের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, "আনা।"

তারপর নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, "ভাসিলি লিনোভিচ। বুঝতে পারছ? ভা-সি-লি লি-নো-ভি-চ..."।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তোতাপাখির মতো বলেছিলাম, "ভাসিলি লিনোভিচ।" তারপর নার্সের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "আনা।"

আনা হো হো করে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাসিলি হাসেননি। উনি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, "নিকোলাই, কোলয়া।"

তারপর ভাসিলি আমাকে ঘরের প্রতিটি জিনিসের নাম শেখাতে লাগলেন। জানালা, গ্লাস, কাপ, বিছানা... উনি প্রতিটি জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে ধৈর্য ধরে ধরে সেগুলোর নাম বলতে লাগলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সঠিকভাবে সেই জিনিসের নাম বলতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে পড়িয়েই চললেন।

একটু পরে উনি জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এটা কী?"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোতা পাখির মতো আওড়ে গেলাম, "এটা কী?"

"মাথা মোটা!" উনি রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, বুঝলে? আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম 'এটা কী?' তোমাকে বলতে হত 'জানালা।'

আমি খানিক বাদে সব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে শুরু করলাম। আমি

চটজলদি বুঝতে পারছিলাম কোনটা কী। জানালা, কাপ, চা। তখনও আমি নিজের স্মৃতিশক্তির দৌড়টা টের পাইনি। শব্দ শুনে বা চোখে দেখে অচিরেই বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ফারাক বুঝতে পারার এক সহজাত ক্ষমতা যে আমার মধ্যে রয়েছে তাও জানতাম না তখন। কিন্তু আমার শিক্ষক ঠিক চিনতে পেরেছিলেন আমার স্মৃতিশক্তির ক্ষমতাকে। আধঘণ্টার মধ্যে উত্তেজিত হয়ে তিনি ছুটেছিলেন ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার ছিলেন কমবয়সী। আমারই মতন। সব শুনে তাঁর চোখ কপালে উঠেছিল।

"কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে বন্ধু।" আমার কাঁধে হাত রেখে উনি বলেছিলেন। "অ্যামেনেশিয়া এত তাড়াতাড়ি ঠিক হয় না।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না! ওকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করো!" বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন ভাসিলি।

"তাহলে তুমি কথা বলতে পারছ, তাই তো?" ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন। "বেশ বেশ, তা তোমার কেমন লাগছে?"

আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। কারণ, ডাক্তারের বলা এই শব্দগুলো আগে আমায় কেউ বলেনি।

"তোমার কিছু লাগবে?"

"না।" আমি বলেছিলাম।

'লাগবে বা চাই' শব্দটা আমি চিনে গিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম 'হ্যাঁ' আর 'না'এর ফারাক।

"তোমার নাম কী?"

"কোলয়া।"

"ওঁর নাম কী?"

"ভাসিলি লিনোভিচ।"

"আর আমি?"

"ডাক্তার।" বেশ জোর দিয়ে বলেছিলাম। কারণ, আমি অন্যদেরকে ওঁকে 'ডাক্তার বলেই ডাকতে শুনেছিলাম।

সব দেখেশুনে ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"বলো তো এই ঘরে কী কী আছে?"

আমি ঘরের প্রতিটি জিনিসের নাম একেবারে দেখিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে বলছিলাম। ডাক্তার সব দেখেশুনে কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো জানালার বাইরে ওগুলো কী?

ভাসিলি যদিও আমাকে বরফ সম্পর্কে কিছু শেখাননি। তবুও আমি আমার শোনা ভাসা ভাসা স্মৃতির ওপর ভর করে ঠিক উত্তর দিয়েছিলাম।

"বরফ।"

"ভাবা যায় না!" ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। সম্ভবত দুর্ঘটনার আগের স্মৃতিগুলো ওর মনের ভেতর থেকে ভেসে উঠছে। বলো তো দেখি 'নিক মার্লে' কে?"

আমি বলতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম, বোমা পড়ে তৈরি হওয়া বিশাল গর্তের ভেতর থেকে আমাকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন আমি বিড়বিড় করে এই শব্দগুলোই নাকি বলেছিলাম।

আমার শিক্ষা চলছিল। গোটা হাসপাতালের লোক আমাকে শেখাতে উঠেপড়ে লেগেছিল। আরো খানিক সুস্থ হয়ে উঠতে আমাকে যেটা করতে হত তা হল, একবার করে রোজ সব ঘরগুলোতে ঢু মারা। দেখামাত্রই সব ঘর থেকে হইচই শুরু হয়ে যেত, "আরে কোলয়া নিকোলাই, এসো এসো।"

তার পরে প্রশ্ন "বাইরে গিয়েছিলে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"বরফের ওপর দিয়ে আবার খালি পায়ে হেঁটেছ?"

"খালি পা কী?"

"জুতো ছাড়া। এই যে এরকম বুট জুতো।"

"বুঝতে পেরেছিস।"

"বুঝতে পেরেছিস না। বলল, 'বুঝতে পেরেছি,' বলো বলো।"

আমি যে-কোনো জিনিস খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যাচ্ছিলাম। একবার শুনলেই তা স্মৃতিতে গেঁথে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার শিক্ষাটা পদ্ধতি মেনে না শেখানোর ফলে ঠিক ঠিক হচ্ছিল না। যাঁরা আমাকে শেখানোর চেষ্টা করছিলেন তাঁদের এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সেটাই স্বাভাবিক। তবে ঠিকমতো মাস্টারমশাই পেলে ভিনদেশি ভাষা শেখা খুবই সোজা, এতে প্রতিটি বক্তবকে বার বার মাতৃভাষায় মনে মনে অনুবাদ করে নেবার দরকার পড়ে না। কিন্তু যাই বলো, মাতৃভাষা সবকিছুর পেছনে নিঃশব্দে কাজ করে চলে। ভাষা শিক্ষা তো আসলে কতগুলো ধ্বনির সমষ্টি।

কিন্তু যে শিখছে তার যদি মাতৃভাষা বলে কিছু না থাকে? কিংবা শিক্ষার্থী যদি কোনো পশু বা পাখি হয়? আমার অবস্থাও তখন ছিল একটা তোতা পাখির মতো। যে শুধু নকল করতে পারে।

আমি ঠিক-ভুলের ফারাক করতে পারতাম না। কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল জানতে চাইলে হাসপাতালের অন্য রুগিরা হেসে উঠত। আমাকে শিশুভোলানো ছড়া শোনাত। আমি কিছু বুঝতে পারতাম না, কারণ ওই ছড়াগুলোতে থাকত অনেক নতুন শব্দ।

আমি তখনও জানতাম না ছড়া কী। আমি শব্দ শেখার চেষ্টা করতাম। প্রায়ই অবুঝের মতো বলে উঠতাম, "বুঝতে পারলাম না।"

একজন একবার ছোটো ছুরি দিয়ে আমাকে খোঁচা দিয়ে বুঝিয়েছিল ব্যথা কী। খোঁচা খেয়ে আমি ঝাঁকিয়ে উঠেছিলাম। জেনে গিয়েছিলাম ব্যথা কাকে বলে। লোকটি জানতে চেয়েছিল, "বেশি লাগেনি তো?

"বুঝলে, কাউকে কিছু দিয়ে আঘাত করা মোটেই ভালো কাজ নয়, তোমারও নিশ্চয়ই খোঁচা খেয়ে ভালো লাগেনি। ঠিক?

"যখন তোমার কিছু ভালো লাগবে না, সেটা 'খারাপ' আর যেটা পছন্দ করবে সেটা 'ভালো'। বুঝলে?"

আমার অভিধানে ভালো খারাপ কাকে বলে ঢুকে গেল, আমি ভালোমন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখলাম।

ঠিক দু'মাসের মধ্যে গড়গড় করে রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে শুরু করলাম। তারপর পড়তে শেখার শুরু। কয়েকদিনের মধ্যে হাসপাতালের লাইব্রেরিতে রাখা উশাকভ আনব্রিজেড-এর চার খণ্ডের রাশিয়ান ভাষার ডিকশনারি মুখস্থ করলাম। তারপর দশ খণ্ডের সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া প্রথম সংস্করণ শেষ করলাম।

যখন আমাকে শেখানোর পালা চলছিল তখনই আমার ক্ষতগুলো ঠিকমতো শুকোচ্ছিল না বলে আমাকে ফিল্ড হাসপাতাল থেকে রোস্তভ হাসপাতালে পাঠানো হল। এসময় থেকে আমার মধ্যে খানিক জটিলতা দেখা যাচ্ছিল। এই ঠিক আছি, পরমুহূর্তে আমি বেসামাল হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতাম। আমাকে সুস্থ করে তুলতে ডাক্তাররাও লড়ে যাচ্ছিলেন। নানারকম ওষুধ খাইয়ে ও অনেকরকম এক্সারসাইজ করিয়ে আমাকে ঠিক করে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল।

বই পড়ার পাশাপাশি দাবা খেলতে শুরু করেছিলাম। একদিনের মধ্যে দাবা খেলায় এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে কেউ দাবা খেলায় হারাতে পারত না। সে যত বড়ো খেলোয়াড়ই হোক না কেন! যদিও আমি দাবা খেলা দিন কয়েকের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে কারণটা আমি পরে বলব। ভাগ্য আমাকে দিয়েছিল এক অসাধারণ উপহার। সেই উপহারটা ছিল আমার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। এই স্মৃতির জোরেই দুনিয়াকে কাছে টানতে সমর্থ হয়েছিলাম। প্রথমে আমার এই স্মৃতি কাউকে খুব একটা অবাক করেনি। সবার কাছেই আমার এই চটজলদি শিখে নেওয়াটা ছিল একটা আলাদা ক্ষমতা। অনেকেই ধরে নিয়েছিল আমার দুর্ঘটনার আগের মেধা ও স্মৃতি আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।

আমার স্মৃতি নিয়ে প্রথমে মাথা ঘামান কামিননাস্কি। হাসপাতালে তিনিই আমার দাবা খেলার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। উনি সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধের

আগে অনেকের মতো উনিও ছিলেন এক অসামরিক ব্যক্তি, স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন।

একদিন কামিননাস্কির সঙ্গে দাবা খেলা নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি বেশ কয়েকদিন আগে একটা হেরে যাওয়া চালের কথা তুলেছিলেন। আমি দাবার বোর্ডে সেই হেরে যাওয়া খেলার প্রতিটি চাল খেলে দেখিয়ে দিলাম।

"সেদিনের প্রতিটি চাল তোমার মনে আছে?" তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "জানো কি, এটা অসাধারণ দাবাড়ুর লক্ষণ?"

আমি খানিক হামবড়া ভাব দেখাতে বলেছিলাম, "শুধু দাবার চালই নয়, অসুস্থ হবার পর থেকে যা যা পড়েছি সব হুবহু বলে দিতে পারি।"

মুচকি হেসে উনি বলেছিলেন, "যা পড়েছ তা হুবহু বলে যাওয়া অত সহজ নয়।"

"সত্যি বলছি।"

"কবিতা?"

"না না, সবকিছু।"

"বেশি বড়াই করা ভালো নয় কোলয়া। তুমি কী বোঝো 'সত্যি বলছি' কথার মানে কী?"

আমি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা শর্ট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়ার চতুর্থ খণ্ডটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "যে-কোনো পৃষ্ঠা থেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে, বই খুলে বলেছিলেন, "পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৩-তে কী লেখা আছে বলো তো।"

"কন্ট্রাকচার।" আমি বলতে শুরু করছিলাম। "পেশির স্থায়ী সংকোচন.."

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। বলো দেখি প্রথম প্যারার তিন নম্বর শব্দটি কী?"

"কমপ্লিমেন্টারি টিকিট।"

তিনি বইটি বন্ধ করে আবার হঠাৎ খুলে বলেছিলেন, "পৃষ্ঠা ৪৩৩-এর দ্বিতীয় শব্দ বলো।"

"কুন্দা সাইট।" আমি বলেছিলাম। "এস্তোনিয়ার কুন্দা নদীর তীরে আদিম মানুষদের বিশ্রামের জায়গা। পুরোটা বলব?"

"না, থাক।" এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন যে মনে হচ্ছিল কোনো অদ্ভুত ভিনগ্রহী প্রাণী দেখছেন। "তুমি এই বইয়ের দশটা খণ্ডের সবকটি থেকে এরকমভাবে বলতে পারবে?"

"পারব।"

"তোমার মাথাটা চুম্বকের মতো, যা পড়ো, যা শোনো তাই ওতে আটকে যায়। ভাবা। যায় না।" উনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন। "আমার মনে হয় না দুর্ঘটনার আগে তোমার স্মৃতি এরকমই ছিল। থাকতে পারে না। থাকলে এতদিনে তোমাকে নিয়ে বই লেখা হয়ে যেত। তোমার বর্তমান বিস্ময়কর মেমোরি দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত লাগার ফলে হয়েছে। তোমার মস্তিষ্কের কোষে কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছেই।"

খানিক চিন্তা করে আবার বলেছিলেন, "তোমার যা স্মৃতি বা মেধা, তাতে করে অনায়াসে তুমি হাই স্কুলের ডিপ্লোমা পেয়ে যাবে। অবশ্য সব বিষয়ে খানিক পড়াশুনা করতে হবে। তোমার অঙ্কের হাল কী?"।

"খুব একটা ভালো নয়।" খানিক লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলেছিলাম।

আমরা প্রথমে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিলাম। তারপর একের পর এক অঙ্ক করতে করতে আমরা ছুট লাগাচ্ছিলাম প্রথাগত গণিত শিক্ষার বাইরে। কিছুদিনের মধ্যে কামিনোস্কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন।

মাস খানেকের মধ্যেই কামিনোস্কি গিয়েছিলেন মস্কোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদীয় সভ্য সোসিনের সঙ্গে দেখা করতে। সোসিনকে কামিনোস্কি চিনতেন স্কুল থেকেই। কামিনোস্কি চাইছিলেন সোসিন আমাকে নিয়ে শীঘ্রই কিছু করুন।

সোসিনের হস্তক্ষেপে আমি অচিরেই আমি স্নাতক পরীক্ষায় বসেছিলাম এবং পরীক্ষার ফলাফল এত ভালো হয়েছিল যে সরাসরি গবেষণায় যোগ দিতে আমার আর কোনো বাধা ছিল না।

তার পরপরই একদিন আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয়ে কামিনোস্কি মারা গেলেন। আমি একা হয়ে গিয়েছিলাম। নিঃসঙ্গতা এসে ভর করেছিল আমায়। আমি এই নিঃসঙ্গতা নিয়েই প্রথম গবেষণা শুরু করেছিলাম। একাকিত্বই আমার নতুন জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

তখন আমার অবস্থাটা ছিল নির্জন গির্জার নিঃসঙ্গ যাজকের মতো। সবাই চলে গেছে, কিন্তু তিনি বসে আছেন উপাসনার ডালি নিয়ে। সাধারন মানুষ সময়কে এঅবস্থায় একটা বোঝা মনে করে, কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল আলাদা, আমি ছ' টি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। অসংখ্য বইয়ের লক্ষ লুখ পৃষ্ঠার আমার স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মাথায় সবসময় ঘুরত পিথাগোরাস আর নিউটনের কথা।

আমি এই দুই মহা ঋষির কর্মকাণ্ড বার বার বিভিন্ন কোণ থেকে পর্যালোচনা করেছি, আর আমার এই কাজের ধারাই আমাকে অন্যদের থেকে সরিয়ে রেখেছিল। আমি কারো 'কাছের' হতে পারিনি। আমার বিস্ময়কর স্মৃতি বা মেধা আমাকে অন্যদের থেকে দুরে সরায়নি। সরিয়েছিল অন্য কিছু। একটা ভয় বা বিতৃষ্ণা। মহিলা, মহিলাদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে আমি অন্যদের থেকে সরে থাকতাম। আমি কোনোরকম পোষা প্রাণী পছন্দ করতাম না। ঠান্ডা আমাকে কখনোই কাবু করতে পারেনি। কাউকে মাংস খেতে দেখলে আমার বমি পেত। কিন্তু তার থেকেও সাংঘাতিক একটা বিষয় আমাকে অন্যদের থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করত। আমি আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকা ব্যক্তির মন পড়তে পারতাম। ঠিক যেভাবে আমরা বই পড়ি। হাসপাতালে থাকাকালীন আমি অনেককেই, সে মুখে কিছু বলার আগেই তার মনের কথা জেনে উত্তর দিয়ে দিতাম, মন্তব্য করে বসতাম কেউ কিছু বলার আগেই। তারপর হাসিমজা করে ঘটনাটাকে হালকা করার চেষ্টা করতাম। আমি কারো মন পড়তে না চাইলেও ব্যাপারটা ঘটেই যেত। প্রশ্ন করার আগেই উত্তরটা দিয়ে ফেলাতে বিষয়টা প্রায়ই বিরক্তিকর দিকে চলে যাচ্ছিল। তাই আমি কম কথা বলে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া শুরু করলাম।

কিন্তু ভুলেও কাউকে অন্যদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার রহস্য প্রকাশ করিনি। করলে আমার কী অবস্থা হত? হয় মঞ্চে ভাঁড়ামো করতে হত, না হয় সার্কাসে ঠাঁই পেতাম।

শুধু একবার, একবার আমার মন পড়তে পারার কথা উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলেছিলাম হাসপাতালে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আসা এক গ্র্যান্ড মাস্টারের কাছে। আমি ওঁকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। আমি দশম চালের পর থেকে পরবর্তী চালগুলো নিয়ে উনি কী ভাবছেন আমি জেনে গিয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় আমি সরল মনে ওঁকে বলে দিয়েছিলাম কেন এবং কীভাবে ওঁকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। উনি প্রথমে বিশ্বাস করেননি। হোটেলে পৌঁছে আমি ১৪তম চাল পর্যন্ত পুরো খেলাটা আবার বোর্ডে খেলে দেখালাম।

"আপনি গজটা তিন নম্বর ঘরে তুলে মন্ত্রীকে খাইয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন।"

যদিও আমার কথা শোনার পর অবিশ্বাসটা ওঁর থেকেই গিয়েছিল।

"ঠিক। কিন্তু এটা তো একটা প্রাথমিক কৌশল। যে-কোনো ভালো দাবাড়ু বুঝে যাবে যে আমি কী করতে চাইছিলাম।

"কিন্তু যতই ভালো খেলোয়াড় হোক না কেন, আপনার পরের মতলবের কথা তার জানার কথা নয়। আপনি তখন অন্য চাল ভাবছিলেন।" আমি দুটো চাল খেলে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। "আপনি এই দুটো চাল ভেবেও দেননি। কারণ, মনে মনে আপনি আমার পরের পাঁচটা চাল কী হতে পারে ছকে নিয়েছিলেন। এই যে খেলে দেখাচ্ছি।" আমি বোর্ডে খুঁটি বসিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

"ঠিক ধরেছ!" বলে খানিক চিন্তা করতে করতে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করেছিলেন। তারপর আমার সামনে এসে চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। তোমার মধ্যে এক বিরল ক্ষমতা আছে। তুমি সহজেই গ্র্যান্ড মাস্টার হয়ে যাবে, তারপর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু সেটা দাবা খেলা হবে না, হবে জোচ্চুরি। যে-কোনো থিয়েটারের মঞ্চে নেমে তোমার এই বিরল

প্রতিভার খেলা দেখানোটাই ঠিক হবে। কিন্তু কোনোদিন দাবা খেলা উচিত হবে না। যদি খেলো সেটা হবে অনৈতিক, আন-এথিক্যাল।”

আমি চলে এসেছিলাম। উনি হয়তো আমাকে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ওঁর কথা ভুলিনি। সেদিনই দাবা খেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর কোনোদিন কারো কাছে আমার বিশেষ ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিনি।

আমার কোনোদিন কোনো মনের রোগ ছিল না। হলে এই বিষয়ে আমি টের পেতাম। কিন্তু আমার মনের ওপর আক্রমণ হত। হ্যাঁ, কেউ বা কারা আমার চিন্তার দখল নিতে চাইত। আমার মন নিয়ে নাড়াচাড়া চলত। আমি আর আমি থাকতাম না। প্রথম প্রথম এটা হত যখন আমি সম্পূর্ণ একা থাকতাম। কেউ ধারেকাছেও থাকত না। মাঝে মাঝে পড়াশুনা শিকেয় তুলে ঘুরে বেড়াতাম একা, দূরের কোনো শহরতলির নির্জন জঙ্গলে। যেখানে সম্ভবত কোনোদিন কোনো মানুষের পাও পড়েনি। হ্যাঁ, ঠিক। তাইগা পাইনগাছ ভরা জলাভূমিতে।

গরমকালে জঙ্গলের ঘন পাতার ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে-বসে আমি ভাবতাম উত্তর না পাওয়া নানা রহস্যের কথা। শহরের তাপ আমার সহ্য হত না। শহরের উষ্ণতা আমার চিন্তাগুলোকে মেরে ফেলত। থার্মোমিটারের পারা যত নামত, আমার চিন্তাগুলো তত ধারালো হত। থার্মোমিটারের পারা ওপরের দিকে উঠতে থাকলে আমার অবস্থাটা হত ভেঙে পড়া গাছের মতো। থেকেও নেই।

ভরা গ্রীষ্মে জঙ্গলের ছায়ায়, শিশির ভেজা ঠান্ডা ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটলে আমার গায়ের চামড়া যেন সজীব হয়ে উঠত, আর আমার চিন্তা করার ক্ষমতা বেড়ে যেত।

হঠাৎ করেই একদিন জঙ্গলের মাঝে একা একা ঘোরার সময় আমার মাথাটা টলে উঠল। কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল আমার ভাবনাগুলোকে। পরিচিত জঙ্গলটা অচেনা হয়ে উঠল। মনে হল যেন এখানে আমি আগে কখনো আসিনি। একটা অদ্ভুত অনুভূতি দখল নিল আমার মনের। মনে হল আমার

চারপাশে ঘিরে থাকা কোনো কিছুই এই পৃথিবীর নয়। আমি এসব চিনি না। কোনোদিন দেখিনি। মনে হল আমি যেন এখানে এক আগন্তুক, ভুল করে ঢুকে পড়েছি। ঠিক যেন নেকড়ে মানব মোগলি ঢুকে পড়েছে শহরে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল, কোনো কিছু চিনতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না। একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো কিছু যেন ঝলসে উঠে আমার মনটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল, জাগাতে চাইছিল। কিন্তু পারছিল না। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েছিলাম। পৌঁছে গিয়েছিলাম মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

হ্যাঁ, মারা যাইনি আমি। জ্ঞান ফিরতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। কত ঘণ্টা বা কত মিনিট ওই অবস্থায় ছিলাম জানি না। তবে সে না জানলেও তাইগার গাছের ডালপালার খোঁচা খেয়ে যে চোখদুটো যায়নি সে-ই ঢের। কেউ জানতেও পারেনি আমায় এই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা। তবে সবসময় একা নয়, অন্য কেউ কাছে থাকলেও এই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল।

আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে মস্কোর কাছের এক জঙ্গলে প্রথম এরকম হয়েছিল। সে-সময় আমি আর কামিনোস্কি জঙ্গলের মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। উনি পরে বলেছিলেন আমি নাকি মিনিট খানেকের মতো জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আমার হার্ট বিট, ব্লাড প্রেসার সব নর্মাল ছিল।

"আমার মনে হয় ডাক্তাররা তোমার এই জ্ঞান হারানোর বিষয়টা নিয়ে একটা ভুল কিছু ভাবছে কোলয়া। তোমার শরীরের ভারসাম্য ঠিক আছে। হয়তো তোমার ব্রেনে কিছু একটা ঘটছে। তুমি বলেছিলে তুমি কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো কিছু দেখতে পেয়েছিলে। সম্ভবত ওটা ছিল তোমার পূর্বের কোনো স্মৃতি।" নেকড়ে মানবের তুলনাটা উনিই টেনেছিলেন।

"বুঝলে কোলয়া, তুমি হচ্ছ গল্পের সেই মোগলি। প্রকৃতির জঙ্গল থেকে মানুষের অরণ্যে ঢুকে পড়েছ। তোমাকে আবার সবকিছু নতুন করে শিখতে হবে, বুঝতে হবে। সব প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। তুমি সেই মোগলির মতো স্মৃতি হারিয়ে ফেলা এক ব্যক্তি। তুমি জঙ্গল জীবনের কথা ভুলে গেছ। আচমকা জ্ঞান

হারিয়ে উলটোপালটা স্বপ্ন দ্যাখা, হতে পারে সেই স্মৃতি ফিরে আসার লক্ষণ। মোগলির উদাহরণ শুনে আমার উপর মনে মনে ক্ষেপে যেও না কোলয়া। আমি এখনো শেষ করিনি। তোমার স্বপ্নে দেখা জঙ্গল ধারেকাছে কোথাও নেই। কারণ, তোমার স্বপ্নের জঙ্গলে কোনো জন্তুর উপস্থিতি নেই। সেখানে কোনো মাংসাশী প্রাণী নেই। তাছাড়া ভেবে দ্যাখো, সেখানে কেউ ঠান্ডাকে ভয় পায় না।"

কামিনোস্কির বিশ্লেষণ একদম ঠিক ছিল। কারণ আমার মাথায় আঘাতটা আসতেই আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত কোনো জায়গার ছবি, কিংবা কোনো বই অথবা কানে আসত কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট কথোপকথন। সেগুলো হয়তো আমার অতীতের কোনো ঘটনারই ঝলক যা আমার মনের কোণে ফিরে আসার চেষ্টা করছে।

একদিন বাল্টিক সমুদ্রে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আচমকা আমার চোখের সামনের দৃশ্যগুলো সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, বাষ্পে ভেজা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলে যেমন হয় অনেকটা সেরকম। সমুদ্র সরে গিয়ে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল খাড়া পাহাড়ের গা। তাতে বেগুনি আর নীলের ছটা। কিন্তু সমুদ্রের যেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেখানে কোনো পাহাড়ই ছিল না। সমুদ্র কিনারায় ছিল শুধু পাইনগাছের জঙ্গল আর ধুধু বালির সাম্রাজ্যে শান্ত ঢেউয়ের আনাগোনা।

ঠিক তার একদিন পরে আমি পাকাপাকিভাবে চলে এসেছিলাম আকাডেমগোরোদক শহরে। সেখানে এক নামকরা বিজ্ঞানীর বাড়িতে আমার সম্মানে এক রিসেপশন পার্টি হয়েছিল। সেই পার্টিতে খাবার টেবিলে শেষপাতে ফ্যাকাসে হলদে রঙের একটা ডেসার্ট সার্ভ করা হয়েছিল। কিন্তু খাবারটার গন্ধ নাকে আসতেই আমার কেন জানি না মনে হয়েছিল এই খাবার আমি আগে খেয়েছি। কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম। যদিও আমার আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ ধরতে পারেননি যে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। শুধু আমার উলটোদিকে বসা আমার পরিচিত এক ডাক্তার ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন।

"কী ব্যাপার, খেতে খেতে আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে? সেই পুরোনো স্মৃতি-

স্বপ্ন আবার ফিরে এসেছিল নাকি?"

"ঠিক ধরেছেন।" আমি বলেছিলাম।

ঠিক মরা মানুষের হাতের মতো শক্ত করে আমার অতীত মাঝে মাঝেই আমার মনটা আঁকড়ে ধরত। বুঝতে পেরেছিলাম সহজে এই বাঁধন থেকে মুক্তি নেই। যদিও গত কয়েক বছর ধরে এই আক্রমণের বহরটা একটু একটু করে কমে আসছে। কিন্তু যখন আসে, তখন আসে হঠাৎ করে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সহসা।

গতবছরও ঠিক এরকম হয়েছিল শহরের এক মোড়ের মাথার বেঞ্চে বসা একদল বাচ্চা ছেলেমেয়েকে খেলতে দেখে। আমার কোনো সন্তান নেই, তাই অন্যদের বাচ্চাদের থেকেও খানিক দূরে থাকি। আমি বাচ্চাগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়েছিলাম। তখনই আমার মাথায় এল জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণতির কথা। মুহূর্তের মধ্যে আমার ব্রেনে একটা ঝটকা লাগল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এবার একটু বেশি সময় ধরে, যেটা সাধারণত হয় না। আমার অতীতের স্মৃতি খানিক ফিরে এসেছিল। যদিও সেটা অনেকক্ষণ ছিল না, কয়েক মিনিটের জন্য একটা ছবি ভেসে উঠেছিল আমার মনের ভেতরে।

যেভাবে আগেও এসেছিল। মেঘে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চারপাশ ক্ষণিকের জন্য আলোকিত করা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। না, আমি কোনো পাহাড়ের ছবি দেখিনি, দেখিনি কোনো দরজা বা চেয়ার টেবিলের ছবি। দেখেছিলাম এক মানুষের মুখ, যার সঙ্গে আমার ভীষণ মিল। দেখেছিলাম লাল পোশাক পরা এক মহিলা আমার দিকে পেছন ঘুরে বসে আছেন। মহিলার মাথার পেছনটা কামানো ছিল।

"তোমার খুশি হওয়া উচিত যে ছোকরা মাঝেমধ্যেই নাক লাল করে ফিরছে।" মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ কথা বলছিলেন। "এটা পুরুষত্বের চিহ্ন। দেখছ তো, আজকাল শুধু কন্যাসন্তানেরই জন্ম হচ্ছে। পুরুষের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমছে, আমাদের গ্রহ ধীরে ধীরে শুধু মহিলায় ভরে যাবে।"

আমি যে কথাবার্তা শুনেছিলাম তা রাশিয়ান ভাষাতে না হলেও তা যে রাশিয়ান ঘেঁষা ছিল, তাতে ভুল নেই। কারণ, কথাগুলো বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। অন্য

কোনো ইউরোপিয়ান ভাষা হলেও আমি ধরতে পারতাম। অজ্ঞান অবস্থায় শুনলেও ভাষার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মহিলাটি কী উত্তর দিয়েছিলেন শুনতে পাইনি। আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। আমি নিশ্চিত, ওই দৃশ্যগুলো ছিল আমার অতীতেরই অংশ।

কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক আবার একই ঘটনা ঘটেছিল। চোখের সামনে ঝলসে উঠেছিল আলো। না, এবার আমার মনের কোণে কোনো ছবি ভেসে ওঠেনি। শুনেছিলাম খানিক টুকরো টুকরো আলোচনার অংশ। দু' জন মানুষ কথা বলছিল। খুব আস্তে আস্তে। ঠিক যেন একই টেবিলে পাশাপাশি বসে কথা বলছে। দুটোই পুরুষ কণ্ঠ ছিল। তার একটি আমার খুব পরিচিত। আমি নিশ্চিত, এ কণ্ঠ আমি আগে শুনেছি।

"ওকে দিনরাত অঙ্ক শিখিয়ে চলেছেন কেন, যখন এই বিদ্যা কোনো কাজে লাগবে না? জানেন তো, এ-বিদ্যা আগেও কাজে লাগেনি, এখনও লাগছে না, ভবিষ্যতেও লাগবে না।"

"তুমি কী করে জানো?"

"সংখ্যা, খালি সংখ্যা দিয়ে গল্প। নাচের ভঙ্গি, শিকারের ভঙ্গি... সব সংখ্যা। আরও ঠিকভাবে বললে বলতে হয়, ভূতুড়ে সব সংখ্যা... বোঝো অবস্থা! খুব শিগগিরই আমাদের হাতেপায়ে আরো বেশি আঙুল গজাবে এত গোনাগুনি করতে।"

"হতে পারে। শুধু শুনে রাখো, বাঁচার উপায় কিন্তু ওই সংখ্যাতেই আছে।"

"বিজ্ঞানকে কে বাঁচাবে, যখন লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে আর গুটিকয়েক জন্মাচ্ছে?"

"সেই জন্যই কি তুমি শেখাতে বারণ করছ?"

"ঠিক বলেছেন। মানুন আর না মানুন, স্বাধীনতা হল বিজ্ঞানের ঠিক উলটো পিঠ। সমাজের প্রয়োজনে তাই আমরা কখনো সংখ্যা, কখনো যন্ত্র, কখনো বা নিছক বস্তুর দাস হয়ে পড়েছি।"

"আমার খুব খারাপ লাগছে, না, তোমার জন্য নয় অষ্টা, এই গ্রহটার জন্য।"

“আমি আপনার সঙ্গে একমত।”

শব্দগুলো হঠাৎই থেমে গিয়েছিল। যেই জগতের আভাস আমার কাছে আসছিল, তা ফিকে হয়ে গিয়েছিল ওই শব্দগুলোর মতোই। আমি জানতে পারিনি ওই পৃথিবীর কথা। বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারিনি ওই মুখগুলো বা শব্দগুলোর উৎস কী। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছিলাম, ওই সমাজের মানুষগুলো মোটেই সুখে ছিল না। বিষয়টা আমাকে মোটেই চিন্তিত করেনি। কারণ, আমি আর ওই সমাজের অংশ ছিলাম না। কিন্তু আমিও বর্তমান নিয়ে স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। প্রথম থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি বর্তমান জগতের সকলের থেকে আলাদা। ঠিক মোগলির সহ-বাসিন্দাদের মতো। জঙ্গলই তার সব ছিল। তার ধাত্রীভূমি, চারণভূমি... কিন্তু তবুও সভ্যতাই তাকে টেনে এনেছিল। আমারও মস্তিষ্কের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা আমার অতীত স্মৃতি আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইত সেখানে, যা নাকি আমার নিজস্ব ভূমি।

তাই যখন একাকী থাকতাম, তখন যন্ত্রের মতো কাগজের গায়ে লিখে চলতাম একটা প্রশ্ন'আমি কে?

কে আমি? কে, কে?

নোটবই-২

ওর হাঁটাটা ছিল অদ্ভুত। কোনোভাবেই ওই হাঁটার ধরনকে মেয়েদের হাঁটা বলা যায় না। ছোটো ছোটো স্টেপ নয়, বরং ঠিক উলটোটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে ছেলেদের মতো হাঁটত ও। আর হাসিটাও ছিল কেমন অদ্ভুত। মুখটা হাঁ করে মাথাটা পেছনের দিকে হেলিয়ে হাসত। হাসলেই চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইত। মাঝে মাঝেই আমার মনে হত ও যেন আমার প্রতিটি চলাফেরা লুকিয়ে লুকিয়ে ফলো করে। আর কিছু সিগারেট খেত বটে মেয়েটা। ফোঁকার স্টাইলটা ছিল বিজনেসম্যানদের মতো। লম্বা টান, তারপর ছুঁচলো নখের আঙুলের ডগায় টোকা দিয়ে পাক্কা চেন স্মোকারের ভঙ্গিতে ছাই ফেলা। ধূমপানের নেশাটা তাড়িয়ে উপভোগ করত।

আমিও একবার সিগারেট খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। মোটেই ভালো লাগেনি। মুখটা ভরে গিয়েছিল বিস্বাদে। স্মোক করে কী আয়েশ পাওয়া যায় বুঝতে পারিনি। এজন্য এ জন্মে আর ধূমপানের মজা টের পাওয়া হল না।

স্বীকার করছি, মেয়েটাকে একেবারেই বুঝতে পারিনি। আমাদের বয়সের ফারাকটাও মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল না। কম করে পঁচিশ বছরের বড়ো ছিলাম মেয়েটার থেকে। ও ছিল বছর কুড়ির ঝকঝকে তরুণী। যদিও ওঁর মধ্যে তরুণীর থেকে কিশোরীর উচ্ছলতাই বেশি ছিল।

প্রায়ই ও ভাবলেশহীনভাবে বলত, "আরে, তোমার ভাগ্য তো খুব ভালো। যুদ্ধের কতটুকুই বা দেখেছ! আমার বাবা আমাকে মস্কোতে থাকাকালীন তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কত গল্প বলেছেন। রাতে সব অন্ধকার হয়ে যাওয়া... অন্ধকারে সার্চিং লাইটের আকাশ কুঁড়ে ছোটাছুটি... বুঝলে, আমার বাবা যখন ছোটো ছিলেন, তখন আমাদের বাড়ির ছাদ বোমা পড়ে ভেঙে যেতে বাবা তার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিলেন।"

কোনো সন্দেহ নেই আমি ওর বাবার থেকেও বড়ো ছিলাম। যদিও আমার নবজন্ম হয়েছিল যুদ্ধের সময় দুর্ঘটনার ফলে। কিন্তু যতই আমার মনের নতুন জন্ম হোক না, আমার তো একটা ফুরফুরে, শক্তপোক্ত শরীর ছিল! কত বয়স ছিল সে সময় আমার শরীরের? পঁচিশ-তিরিশ? আর এখন? পঞ্চাশ অনেক আগেই পার করে এসেছি, ষাট ছুঁই ছুঁই বলা যেতে পারে। সত্যি তো মানতেই হয়। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কান পাতলেই শোনা যেত এক বুড়ো প্রফেসর আর এক ইয়ং স্কলারকে নিয়ে রসালো আলোচনা। যদিও আমি যে বুড়ো তা মানতে চাইত না মেয়েটি। বলত, "আপনি মোটেই বুড়ো নন প্রফেসর। আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেসকে ছাত্রেরা হিংসা করে। আপনি যেভাবে পাতলা পোশাকে কোনো টুপি ছাড়া শীতের সাইবেরিয়ার বরফে ঘুরে বেড়ান, তা কি কোনো বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব? আপনাকে টেক্কা দিতে ভিতালি ভলোকও ওজন কমানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। রোজ সকালে দেখি ব্যালকনিতে ব্যায়াম করছে।"

আমি বেশ বুঝতে পারতাম, ভলোকভের কথা বলে আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করত ও।

মনটাকে চাঙ্গা রাখার জন্য ও আমাকে প্রায়ই গাড়িতে করে ঘুরতে নিয়ে যেত। আমি প্রথমদিনই ওকে বলেছিলাম গাড়ির পেছনের সিটে বসার জন্য। কারণ, গাড়ি দ্রুত স্পিডে চললে পেছনের আসনই সবচাইতে সেফ। ও উত্তর দিয়েছিল, "যা হয়নি বা আদৌ হবে কি না তা নিয়ে অত ভাবার কী আছে? আপনি দারুণ গাড়ি চালান প্রফেসর।"

আমি ওর মন পড়তাম। একদম পরিষ্কার, কোনো ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। স্পষ্ট শুনতাম ও মনে মনে বলছে, 'আমি তোমার পাশে বসতে চাই। পেছনে নয়, সামনে নয়। তোমার পাশে। কেন বোঝো না আমার মনের কথা! তোমার পাশে থাকতে চাই সবসময়। গবেষণায়, গাড়িতে, তোমার হিমশীতল ঘরে... সারাজীবন। তুমি শুধু মনেই বুড়িয়ে গেছ, তাই বোঝো না আমার কথা।'

আমি বুঝতে পারতাম, ঠিকই বুঝতে পারতাম ওর মনের কথা। কিন্তু নিরুপায় ছিলাম। ঈশ্বর আমাকে অন্য পথের পথিক হতে পাঠিয়েছিলেন। আমার মনটা তৈরি করেছিলেন এমনভাবে যে সাধারণ বিষয় আমার মনে কোনো আঁচড় কাটত না। আমি যেন একটা মঠের প্রধান, জ্ঞানের ঝুলি আঁকড়ে বসে থাকা চামড়া কোঁচকানো মহাস্থবির। আর সে মঠের অন্য পূজারিরা সব এক-একটা জীবন্ত আত্মা। আর তাঁরা কেউই পূজাপাঠে অংশ নেওয়া সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী নন। যখন ওদের সমবয়সীরা নাচগানে মত্ত, তাঁরা তখন এখানে নীরবে গণিতের সাধনা করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, চিরাচরিত প্রথার অঙ্কের পথ তাঁরা ধরেননি। তাঁরা এমন ধারায় আঁক কষে চলেছেন যা নিয়ে আগে কেউ ভাবেনি। এ পথের শরিক হয়েছেন সম্মান বা খ্যাতির আশায় নয়, সমর্পিত প্রাণ হয়ে, ভালোবেসে, জ্ঞানের সন্ধানে। যেখানে কোনো ফাঁকি চলে না। লক্ষ্যে পৌঁছনোর কোনো শর্টকাট নেই। ঠিক সেই কবিতার পঙক্তির মতো:

আমাদের সাধনার সীমা নেই কোনো
সে অসীমে ভেসে ফিরি, উত্তরণ আশে

স্থির লক্ষ্য; তবু তাকে অপেক্ষায় রেখে
যদি মজি অন্য মোহে দিগভ্রান্ত হয়ে
আমি পরিণত হব আমিহীন বর্জ্যবিশেষে”

আমার ছাত্ররা হতাশা কী বস্তু জানে না। আমি ওদেরকে, আমার অংশ বলেই মনে করি, আর ওরাও ওদেরকে আমি বলে মনে করে। আমাদের মধ্যে কোনো প্রাচীর ছিল না, অন্তত অঙ্কের বেলায়। গণিত! গণিত আমার সব। আমার ভালোবাসা। মিষ্টি মেয়েটা একথাটাই বুঝতে পারেনি। অঙ্ক ছাড়া আর কিছুকে আমার মনপ্রাণ দিতে পারিনি।

সেদিন ওর সঙ্গে বেরোনোটা ঠিক হয়নি। যদিও শেষটা এমন কিছু খারাপ ছিল না। আমার কথাবার্তায় আরও নরম হওয়া উচিত ছিল। আরও সংযত হতেই পারতাম। খানিক বাপ-সুলভ ভাব দেখিয়ে আলোচনাটাকে হালকা করতে পারতাম।

“কখনো বিয়ে করেছিলেন প্রফেসর?”

প্রশ্নটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। শালীনতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হতে পারে ও কিছু ভেবে বলেনি। পরিবেশের গাম্ভীর্যটাকে ছিঁড়ে দিতে চেয়েছিল ও। ওর পক্ষে অভিনয় করাটা যে সম্ভব নয় সেটা আমি জানতাম।

“না, করিনি।”

“করেননি কেন?”

“সিগারেট লাইটারটা নিয়ে খেলা কোরো না ইনা।”

ওর হাবেভাবে বুঝলাম আমার ধমকটা ও গায়ে মাখেনি। তাই আবার বললাম, “বিয়ে করিনি, কারণ বিয়ে করার সময় ছিল না।”

কথাটার মধ্যে খানিক মিথ্যে ছিল। আমার সময়ের অভাব ছিল না, অভাব ছিল ইচ্ছের। কত কত সুন্দরী, শিক্ষিতা আর দয়াময়ী মহিলার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছে এত বছরে তার হিসেব নেই। কিন্তু কাউকেই জীবনসঙ্গিনী করার কথা ভাবিনি। ঠিক হাইস্কুলের পড়ুয়াদের মতো মনে মনে ভেবেছি, কোনটা ভালো! ভালোবাসা, না বন্ধুত্ব? আমি বন্ধুত্বকেই পছন্দ করেছি সবসময়। কোনো ভুলে নেই, আমি আমার

নিজের ইচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিইনি, কেউ যেন আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছিল। ঠিক যেন স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা। নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

"প্রফেসর, আপনি যখন ছোটো ছিলেন আপনার নাম নির্ঘাত 'কে' ছিল। ঠিক 'দ্য স্নো কুইন' সিনেমার বাচ্চাটার মতো। আপনার সেই সিনেমার কথাটা মনে আছে প্রফেসর, যেখানে শিশুটি বরফের ইট সাজিয়ে 'অনন্তকাল' শব্দটা বানিয়েছিল?"

"অনন্তকাল!" আমার মনে হয়েছিল আমিও যেন এইরকম কোনো শব্দ গড়েছিলাম কখনো, কিন্তু বরফের টুকরো দিয়ে নয়। সস্তামার্কা নভেলগুলোয় যেসব ফ্ল্যাশব্যাকের গল্প থাকে, ওই 'অনন্তকাল' শব্দটা শুনে ঠিক সেইভাবেই আমার মনে কিছু ভুলে যাওয়া

স্মৃতির টুকরোটাকরা ঝিলিক দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। যেন চেনা কোনো মুখ! শুধু, কোথায় তাকে দেখেছি সেইটে কিছুতেই মনে আসছে না। ঘুমন্ত স্মৃতি? হ্যাঁ। কখনো সেই 'অনন্তকাল' কে অন্য কোনো চেহারায় স্পর্শ করেছিলাম আমি। বড়ো শীতল সেই ছোঁয়া। আমার মত সহনশীল মানুষও সইতে পারিনি তাকে... কিন্তু কোথায়? কীভাবে? কেন? বারবার আমার মনে হচ্ছিল, কেবল চোখদুটো বন্ধ করে একটু ভাবলেই... একটু... প্রায় তাকে ছুঁয়ে ফেলা... নাঃ। মনে পড়ে না।

"প্রফেসর, প্রফেসর... আপনার কী হয়েছে? আপনি ঠিক আছেন?"

"ঠিক আছি ইনা। কাঁচ নামিয়ে দাও। জানালা খোলা রাখো প্লিজ।"

"আপনার ঠান্ডা লেগে যাবে যে? গাড়িটা একটু আস্তে চালান প্রফেসর!"

"ভয় পাচ্ছ?"

"না না, ভয় পাচ্ছি না। সামনে একটা বাঁক আছে, সেখানে রাস্তাটা আবার ভাগ হয়ে গেছে।"

"আমি জানি।"

মুখে সেসব বললেও ভেতরে ভেতরে আমি টের পাচ্ছিলাম আসলে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখের সামনে ভিড় করে ছিল পুরু কুয়াশার ভেতর দিয়ে যেমন দেখা যায় সেরকম আবছা আবছা কিছু দৃশ্য। বাঁকটার আগে আমার গতি

কমানো উচিত ছিল।

"ব্রেক মারুন প্রফেসার! ডানদিকে দেখুন!" চিৎকার করে উঠেছিল ইনা।

ও চিৎকার করছে কেন? চমকে উঠেছিলাম আমি। ওহ!

আবছা টের পেয়েছিলাম একটা ধীরগতির বিশাল ট্রাক এসে পড়েছে আমার গাড়ির সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ব্রেক কষেছিলাম। স্টিয়ারিংটা আরও, আরও অনেকটা ডানদিকে কাটানো উচিত ছিল। ট্রাকটাও আমাদের কাটানোর চেষ্টা করেছিল। কে যেন আমার মধ্যে বলে উঠেছিল, 'জোরে, আরও জোরে চালাও। সোজা আঘাত হানো তেলের ট্যাঙ্কে।'

আমি কি পারব না? পারতে আমাকে হবেই।

অনেক, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তুষারপাতের আবছায়ায় অস্পষ্টভাবে ট্রাকটার রেডিয়েটরটা ঝলসে উঠেছিল। এবার সংঘর্ষটা হবে। আর কিছু মনে ছিল না আমার।

চারপাশটা ভীষণ শান্ত। পৃথিবীর ওপর ভারশূন্য হয়ে উড়ে বেড়ানোর অনুভূতিটা অদ্ভুত। পৃথিবীটাকে লাগছে বাচ্চার হাতে ছোটো রাবারের বলের মতো। বলটা ঘুরছে, ঘুরেই চলেছে। বলটায় মাত্র দুটো রং। নীল আর সবুজ। না না, আরও রঙ দেখতে পাচ্ছি.. হলুদ, বাদামি। আরও রঙ... আকাশি... আরও, আরও রঙ... আমার স্বপ্নের নীল গ্রহ, অজানা, বহুদূরে।

"নামার জন্য প্রস্তুত হও।" আদেশ এসেছিল নেভিগেটরের কাছ থেকে।

কম্পিউটারের পর্দাটা জুড়ে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ।

"গ্রহটা তো পুরোটাই মেঘে ঢাকা। কোথায় নামব প্লটার?"

"পূর্বগোলার্ধে। মেরুবৃত্তের কাছাকাছি কোথাও। কিন্তু আমি সঠিক জায়গাটা এখনো হিসেব করে উঠতে পারিনি।"

হিসেব! হ্যাঁ, হিসেব কষাই আমার কাজ।

আমার সামনের প্যানেলে কম্পিউটারের বোতামের সার। ইন্ডিকেটর ল্যাম্প, আর মনিটর জুড়ে থাকা মেঘের ছবি। হ্যাঁ, আমি প্লটার। কোথায় নামব সেই সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব আমারই। এটাই আমার কাজ।

"নীচে কিছু একটা হচ্ছে!"

কম্পিউটারের পর্দায় মাঝে মাঝে ঝলসে উঠেছে পৃথিবীর বাদামী মাটি-কাদার ছবি। আমরা ঠিক ঝরনার জলের মতো মসৃণ গতিতে নেমে চলেছি ভূপৃষ্ঠের দিকে।

নীচে এবড়োখেবড়ো জমি। বিশাল এক গর্ত মাটির বুকে। আমি স্পিকারের ভলিউমটা বাড়িয়ে দিলাম। ছোটো কামরাটা গমগম করে উঠল জোরালো শব্দে। হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে যেন কেঁপে উঠল কেবিনটা। বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসছিল মানুষের আর্তনাদ।

মানুষ? আমি তখনো জানতাম না মানুষ কী।

একটা রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে রাস্তার ধারের গাছের আড়ালে কিছু মানুষকে ছোটাছুটি করতে দেখলাম। এক-দুই-তিন... পাঁচ.. সবকটাকে গুনতে পারিনি, তার আগেই ওরা লুকিয়ে পড়েছিল ঝোঁপের আড়ালে। সামনেই একটা বরফঢাকা পাতাহীন গাছের বন, একবারেই আমাদের জঙ্গলের মতো নয়।

পাতাঝরা অরণ্যের মাঝে ঘন সবুজরঙা কিছু কাঠামো। কিছু লোক নোংরা বরফের ওপর দিয়ে দৌড়চ্ছে, কিছু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বরফের ওপর। আমি কম্পিউটারের একটা বোতামে চাপ দিলাম। সামনের পর্দার ছবির ঔজ্জ্বল্য বেড়ে ছবি খানিকটা পরিষ্কার হল।

ছুটতে থাকা লোকগুলোর পরনে নোংরা হয়ে যাওয়া সাদা জ্যাকেট, অনেকেরই জ্যাকেটের নিচের দিকটা ছিঁড়ে হাঁটুর কাছে ঝুলছে। ওখান থেকেই আর্তনাদের শব্দটা ভেসে আসছিল। সেই শব্দটা আরও জোরালো হয়েছে।

একটা ধূসর রঙের ফিতের মতো নদী দেখতে পেলাম। নদীর ধারে সবুজরঙা পোশাক পরা মানুষের জটলা। নদীর ওপর একটা সেতু। কিছু মানুষ সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে এঁকেবেঁকে সেদিকে এগোচ্ছিল।

ওগুলো কী? কোনো গাড়ি? সম্ভবত তাই।

ওদের ছোটাছুটির কারণ বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কিছু তো ঘটেছেই! আবার সেই চিৎকার গমগম করে উঠল কেবিনের স্পিকারে, "আহ..."

বরফের ওপর দিয়ে ছুটন্ত মানুষগুলোর হাতে লাঠির মতো কিছু ধরা। ওগুলো কি অস্ত্র? ওরা ওই লাঠিগুলো আকাশের দিকে তাক করছে। আমাদের স্পেসশিপকে টার্গেট করছে না তো?

ছাড়া ছাড়া হালকা ঠনঠন শব্দ ভেসে আসছে। ঠিক যেন আমাদের যানের খোলসের ওপর নুড়ি-পাথর আছড়ে পড়ছে।

"মনে হচ্ছে আমাদের যানে আঘাত লেগেছে।" বলে উঠল সহকারী চালক।

"মারাত্মক কিছু কি?"

"না না, সাংঘাতিক কিছু নয়। কতকগুলো সীসের টুকরো। আমরাও কি গুলি ছুড়ব?"

"কেন? আমরা তো ওদের কাজে কোনো নাক গলাতে আসিনি।"

"কী বিষয়ে নাক গলানোর কথা বলছেন?"

"যুদ্ধে।"

"যুদ্ধ! এরা কোন স্তরে আছে?"

"সম্ভবত মাঝারি প্রযুক্তির স্তরে।"

"কীসের ওপর ভিত্তি করে একথা বলছেন?"

"যন্ত্রের ওপর। বিশ্লেষক যন্ত্র ভুল করে না। মনে হচ্ছে আমরা এখানকার কোনো। অন্তঃগ্রহ যুদ্ধের সময়ে এসে পড়েছি।"

"কারা কাদের সঙ্গে লড়ছে?"

"নিজেদের ইতিহাসের কথা ভাবো। আমরাও আমাদের গ্রহে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। এখন ঠিক করো কী করা উচিত। এইখানে নামা ঠিক হবে কি? মনে হয়

খুব একটা দেরি হয়ে যায়নি। এখনো যাত্রাপথ বদলানো যেতে পারে।"

“না, দেরি হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তা আর সম্ভব নয়। যাত্রাপথ নতুন করে সাজাতে সময় নেবে।”

“কত সময় লাগবে?”

“বেশি নয়, দুটো চক্কর।”

আমি চালকদের আলোচনায় অংশ নিইনি। শুধু মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিলাম। আমার কাজ শুধু কক্ষপথ, আর তার আবর্তনের হিসেব রেখে চালকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা। প্লটার হিসেবে আমার প্রয়োজন তখনই হয় যখন আমরা কোনো গ্রহের কাছে পৌঁছই। গ্রহে নামার আগে ফেরার পথের ছক কষে তা চালকের হাতে তুলে দিলেই আমার কাজ শেষ। চালক সেই ছকটা ঢুকিয়ে দেয় স্বয়ংক্রিয় চালকের যন্ত্রমস্তিষ্কে।

আমি চুপ করে দেখছিলাম নীচে হয়ে চলা ঘটনাগুলো। দেখছিলাম ঝলসে ওঠা আগুনের হলকা আর বরফ-কাদার ওপর দিয়ে ছুটে চলা মানুষের দল।

কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটছে, কেউবা আবার পড়েই থাকছে। পড়ে থাকছে অন্য কারো ওপরে, হাত থেকে ছিটকে যাচ্ছে অস্ত্র। কেউ বা অস্ত্র হাতেই পড়ে আছে। বরফের ওপর পড়ে ছটফট করতে থাকা অনেকেরই মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

পৃথিবীর মাটি দ্রুত উঠে আসছিল তলা থেকে সাদা, চারদিকে সাদা বরফের পাহাড়। খানিক বাদে সেই বরফের বুকে একটু ঝাঁকুনি খেয়ে সামান্য হড়কে দাঁড়িয়ে গেল

আমাদের যান।

অসাধারণ অবতরণ।

আমি অন্যদের দিকে তাকালাম। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। বাইরের তুষার প্রান্তে কী হচ্ছে দলের বাকি কারো তা দেখার সময় নেই।

বাইরের মানুষগুলো হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে কোথাও।

“আমি একটু বাইরে যাচ্ছি ন্যাভিগেটর।”

“কেন?” সে আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাল। এই গ্রহটা তার পছন্দ হয়নি।

“একটু কৌতূহল হচ্ছে।”

আমাদের গ্রহে প্রায় কেউই কৌতূহল দেখায় না। কারণ, কৌতূহল কখনোই কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ হতে পারে না।

“ঠিক আছে, যাও প্লটার, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু খুব সাবধান।”

আমি আমাদের যানের হ্যাঁচ খুলে বেরিয়ে এলাম। আমার পায়ের তলায় তাল তাল জমাট বাঁধা মাটি আর বরফের অসমান জমি। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু শরীরে কোনো অস্বস্তি বোধ করছিলাম না। নিঃশ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। ঠিক যেন আমাদের গ্রহ। মিহি তুষারের দানা ঝরে পড়ছিল অনবরত। আমাদের গ্রহে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যেরকম থাকে, অনেকটা ঠিক সেরকম। স্যাঁতসেঁতে আর উষ্ণ ঠেকে শরীরে। আমাদের গ্রহ এর থেকে অনেক অনেক ঠান্ডা। আমাদের গ্রহের অনেক জায়গাতে বরফই গলে না। এমনকি নিরক্ষরেখা অঞ্চলেও।

আমার ঠিক সামনে একটা গাছের ঝোঁপ। আমি খানিক দৌড়নোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পড়ে গেলাম। হাতদুটোয় নোংরা লেগে গেল। বরফে মাখামাখি হয়ে গেল হাতদুটো। একটা সরু গাছের গুঁড়িতে হাত ঘষে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম। গাছের নরম গুঁড়িটা কালচে আর সাদা ছালওয়ালা। ডালপালা মেলে ধরা গাছটায় একটাও পাতা বা কুঁড়ি নেই।

খানিক দূরে একটা লোক বরফে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। অনেক কষ্টে ওর শরীরটাকে ওলটালাম। শক্ত হয়ে যাওয়া শরীরে চোখের স্থির হয়ে থাকা মণিদুটো, তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

হঠাৎ, পেছনে থাকা মহাকাশযানের দিকে তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে কিছু একটা ছুটে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে পরপর দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ জেগে উঠল। গাছের ঝাড়ের আড়াল সেই বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারল না। ছিটকে পড়লাম মৃত লোকটার পাশে। খানিক পর যন্ত্রণায়

কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে বসলাম।

ছোটো থেকেই আমাদের কষ্ট সহ্য করার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা দেওয়া হয় হাসি কান্না প্রকাশ না করতে। নিজের অনুভূতিকে দমিয়ে রাখা তাই আমাদের রক্তে। নিঃশব্দে যে-কোনো পরিস্থিতির সামনে হতে আমরা তৈরি। কিন্তু এইরকম কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার শিক্ষা আমি পাইনি। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে আমি ছুটতে শুরু করলাম।

প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছিলাম আমি যেখানে আমার যানকে খানিক আগে ছেড়ে এসেছি। সেখানটা লক্ষ করে। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতেই বারবার হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম গাছপালায় ধাক্কা লেগে। আর তারপর ফের উঠে দাঁড়িয়ে মুখটা হাত দিয়ে মুছতে মুছতে ফের... আমার মুখে... কী লেগে আছে আমার মুখে? রক্ত, বরফ, অশ্রু? জানি না। মাথা কাজ করছিল না আমার। কারণ, পা দুটো তখন আমায় ছুটিয়ে আনতে আনতেই একেবারে হঠাৎ করে নিঃসাড় হয়ে গেছে। একটা বিরাট গর্তের কাছে এসে বজ্রাহতের মত থমকে দাঁড়িয়েছি আমি। ঐখানেই আমাদের মহাকাশযান নেমেছিল। মাত্রই কয়েক মিনিট আগে।

থমকে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোঝবার মতো কিছুই ছিল না। আঘাতটা আমার সব কিছু খুঁড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মাতৃভূমি, আমার বন্ধু-পরিজন...

ন্যাভিগেটর ঠিকই বলেছিল। আমার কৌতূহল দেখানো উচিত ছিল না। আমার উচিত ছিল না এই অজানা গ্রহের মাটিতে একলা পা দেওয়া। মহাকাশযান ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। তাই আমার বন্ধু-স্বজনদের মধ্যে কেবল আমি একলা বেঁচে গিয়েছি। একলা... একটা সম্পূর্ণ অচেনা গ্রহে... অভিশপ্ত নির্বাসনের জীবন...।

তবে সে নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার অবসর তখন আমার নেই। এখানে টিকে থাকতে নিজেকে তৈরি করতে হবে। অসাড় আঙুলগুলো দিয়ে কোনোমতে শরীর থেকে মহাকাশচারীর পোশাকটা খুলে বরফের গভীরে সেটাকে চাপা দিয়ে রাখলাম আমি। আমার ভিনগ্রহের অস্তিত্বের শেষ প্রমাণ। এইবার খানিক আগে দেখা সে মৃত

সৈনিকের কাছে গিয়ে তার পোশাক খুলে নিলাম। খাকি রঙের প্যান্টের কোমরে একটা বেল্ট বাঁধা। একই রঙের কোটের বোতামগুলো পিতলের। ফিতেহীন জুতোজোড়া অস্বস্তিকর রকমের উঁচু ও রদ্দি মালে তৈরি। কোটের তলায় পরে থাকা লোকটার সাদা জামাটা বরং অনেক পরিষ্কার ও নরম। লোকটার খাকি প্যান্টের তলায় আরও একটা গোড়ালির দিকে লেস দেওয়া সাদা মোলায়েম প্যান্ট পরা ছিল। আমি মৃত লোকটার সব পোশাকগুলো একে একে পরে ফেললাম।

আমাকে এখন যে করেই হোক আমাদের অবতরণ স্থান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। ধরা পড়লে ওরা প্রশ্ন করতে ছাড়বে না। ওরা আমাদের আকাশযান দেখেছে ও তাতে গুলি ছুঁড়েছে।

বরফের ওপর সবুজ গাড়িগুলোর চলার শুয়োপোকার মতো দাগ ধরে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটতে লাগলাম। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের গলার চিৎকার আর ছুটোছুটির শব্দ। এই গ্রহের প্রাণীগুলো দেখতে হুবহু আমাদেরই মতো। ওদের কাছে। গেলে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাওয়া যাবে। সুযোগটা নেওয়া উচিত।

কিন্তু নিজের পায়ে হেঁটে তাদের কাছে যাওয়া আর হল না আমার। কয়েক পা এগোতেই শিসের মতো একটা শব্দ ভেসে এসে আমার সামনে আগুনের গোলা হয়ে আছড়ে পড়ল। আমার গায়ে সরাসরি আঘাত না লাগলেও আমি ছিটকে পড়লাম। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল...

আমার চোখেমুখে কেউ জলের ছিটে দিচ্ছিল। চোখ খুলে তাকাতেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম।

"চোখ খুলুন প্রফেসর, প্লিজ চোখ খুলুন। হা ঈশ্বর, আর সহ্য করতে পারছি না।" কেউ আমার মাথাটা দু-হাত দিয়ে খানিক উঁচু করে রেখেছিল। আমি জানতাম ওটা কার হাত। কিন্তু তখনও আমার আতঙ্কের ঘোর কাটেনি। খানিক আগে দেখা দুঃস্বপ্নটা তখনও পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি আমায়। কিন্তু... ওটা কি সত্যিই স্বপ্ন ছিল? না। স্বপ্ন নয়। আমি নিশ্চিত, ও আমার অতীত জীবনের আরো একটা ঝলক।

আমার নিজের কাছেই অধরা থেকে যাওয়া নিজের বেশ কিছু রহস্যকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে এই ঝলকটা। প্রফেসর মার্লে হিসেবে আমার পুনর্জন্মের রহস্য এবার আমার কাছে পরিষ্কার। প্রফেসর মার্লের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এই পৃথিবীতে। ছিল একজন প্লটার। নামহীন, আশ্রয়হীন, মাতৃভূমি-চ্যুত এক অন্যগ্রহের বাসিন্দা।

সেই বিস্ফোরণের পর স্মৃতিহীন হয়ে জেগে ওঠবার সময়টার মতই, এই মুহূর্তেও আমি আমার নিজের গ্রহ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না। কখনো কিছু টুকরো টুকরো আলাপ, ধোঁয়াটে কিছু ছবি আর একটা নিষ্ঠুর গ্রহের কিছু অস্পষ্ট আভাসের স্মৃতি থেকে থেকে আমি আমার অতীত সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। অতীতের সেই জগৎটা আমার থেকে বহুদূরে। ধারণাতীত, অজানা কোনো গ্রহ।

কিন্তু আমি কখনোই সেই গ্রহে আর ফেরার তাগিদ অনুভব করিনি। এই পৃথিবীতে বাস করতে করতে আমি অতিথি থেকে এই গ্রহেরই সন্তান হয়ে গিয়েছি। নিজেকে সঁপেছি পৃথিবীর সেবায়। আমার স্মৃতি, আমার মেধা সব আমার পৃথিবীর ভাইদের প্রতি উজাড় করে দিয়েছি। যদিও মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে না-দেখা লড়াই চলে। কিন্তু আমি সবাইকে শুধু ভালোবাসতেই শিখেছি। যদিও অনেক সময় এই ভালোবাসা প্রতিদানহীনই হয়েছে।

না, আমি সময়ের আগে ছুটিনি। আমি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি হইনি। শুধু একজন অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত হয়েই থেকেছি। কিন্তু যদি আমার অতীত ফিরে আসত? আমি যদি আবার প্লটার হয়ে যেতাম? আমি আমার প্লটার জীবনে অর্জিত জ্ঞান ওদের বিলিয়ে দিতাম। 'প্রতিভাধারী' তকমা অর্জনের কোনো ইচ্ছেই ছিল না। না বর্তমান জীবনে, না মৃত্যুর পরে। আমি শুধু জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছি, আর এই জ্ঞান। আমার ছাত্রদের বিলিয়ে দিতে চেয়েছি। বিশেষ করে ইনা বা ভিতালির মধ্যে।

আমি ওর ফ্যাকাশে আতঙ্কিত মুখটা দেখেছিলাম। দেখেছিলাম সেই ভয়ার্ত মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা।

“ঘাবড়িও না ইনা, আমার সব হাড় আস্ত আছে।”

“চলুন আপনাকে ধরে আগে গাড়িতে নিয়ে তুলি। সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। শুধু গাড়িটা খানিক তুবড়েছে।”

“অনেক ধন্যবাদ ডিয়ার।” কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম।

“আমি হেঁটে যেতে পারব। বেঁচে তো আছি! সেটাই বড়ো কথা।”

নোটবই-৩

ব্যাপারটা সাধারণ। আমাদের ল্যাবরেটরির সে বছরের বাজেটের অনুমোদন ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে তখনো আসেনি। তবে সেটা এমন কিছু ভয়াবহ ব্যাপার নয় আদৌ। দু-একদিন বা এক সপ্তাহের মধ্যে বাজেট পাস হয়েই যেত। সেজন্যে তাড়াও তেমন কিছু একটা ছিল না। কিন্তু কোনো কারণে বাজেট পাস হওয়ায় আমি খানিক অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক বাচ্চাদের মতো। কী হবে! কী হবে! অনুমোদন পাবে তো? সুস্থির হয়ে কোনো কাজই করতে পারছিলাম না। এখানকার লোকজনের স্বভাবটাই এমন। সবকিছুতেই একটা ঘোঁট পাকিয়ে তোলা চাই ওদের।

আবার ‘ওদের!’ এই ‘ওদের,’ ‘ওরা’ শব্দগুলো মাঝেমধ্যেই আমার মনের গভীর থেকে হঠাৎ করেই লাফ মেরে বেরিয়ে আসে। ঠিক যেন পায়ের পেছনে লুকিয়ে থাকা বিড়াল-বাচ্চা। আচমকা পায়ে মুখ ঘষে ভয় ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু ‘ওরা’ মানে কারা? এ গ্রহের সাধারণ মানুষজন? আমিও তো একজন সাধারণ মানুষই। আমার আচরণ, চিন্তাভাবনা... আমি তো পৃথিবীবাসী, কোনো ভিনগ্রহের জীব নই! তাহলে লোকজনের ব্যাপারে ভাবতে গেলেই হঠাৎ হঠাৎ এই ‘ওরা’ ব্যাপারটা চলে আসে কোত্থেকে?

কথায় বলে, অতীত কাউকে ছেড়ে দেয় না। আমি সবসময় আমার অতীত থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার হৃদয়হীন অতীত আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। অতীতের আবছায়া জগত আর বর্তমানের চেনা দুনিয়া, এই দুই আলাদা জগতের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি যেন আমি। কথাটা হয়ত অদ্ভুত শোনাবে খানিক,

কিন্তু আমি সত্যিসত্যিই গুলিয়ে ফেলছি আজকাল, আসলে আমি এই দুইয়ের মধ্যে কোন জগতের বাসিন্দা।

তবে ভাগ্য ভালো, আমার ইচ্ছেশক্তিটা খুব জোরালো। সে-ই আমায় ঠিক রাস্তায় ধরে রাখে। বলে, 'যেখানে আছি, যার আলো হাওয়া ভোগ করছি, চিন্তা করছি, বেঁচে আছি... সেটাই আমার জগৎ। পুরোনো দুনিয়াটাকে নিজের বলে দাবি করবার আর পথ নেই কোনো।

অতীত যেন টুকরো টুকরো স্মৃতির ভাঙাচোরা খণ্ডে ভরা একটা ক্যালাইডোস্কোপ। আমার স্মৃতি ও বিস্মৃতির অন্ধকারের গভীরে এলোমেলো ছড়ানো। স্থানকালের নির্দিষ্ট অক্ষের বাইরে। কখনো কি ওই রঙিন টুকরোগুলোর সবক' টাকে হাতের মুঠোয় আর ধরতে পারব আমি? জানি না। এখন অবধি শুধু একটা টুকরোকেই ঠিকমত নাগালে আনতে পেরেছি, একটা শব্দ। বজ্রাক্ষরে লেখা। 'আগন্তুক!

"আগন্তুক! প্রফেসর, তার মানে বর্হির্বিশ্বের প্রাণী পৃথিবীতে এসেছিল। কী বলেন?"

"হ্যাঁ, তার মানে ওইটেই হয়। কিন্তু আপনারা সাংবাদিকরা একে আবার কাগজের হেডলাইন বানাতে যাবেন না। কেন না এখনও কেউ এদের দেখা পায়নি।"

"আপনি নিজে কী, প্রফেসর?"

"আমি আবার কী? ক্ষ্যাপাটে বুড়ো এক মাস্টার, যার ডিপার্টমেন্টের বাজেট এখনও পাশ হয়নি। ওইসব এলিয়েন-টেলিয়েন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। আমার মাথায় খালি একটাই চিন্তা, আমার প্রোজেক্টটা ভালোয় ভালোয় শেষ হোক।"

না, এধরনের কোনো সাক্ষাৎকার আদপেই ঘটেনি। ঘটবেও না। আচ্ছা এমন একটা ইনটারভিউ যদি সত্যিই হতো? আমার কথা শুনে ইনা কী বলত? কী আর বলবে? মাঝেমাঝেই আমার কথাবার্তা শুনে যা বলে সেটাই, "পাগল নাকি?"

নাঃ। আমি পাগল টাগল নই। শুধু একটু ক্ষুধার্ত। আমি জানি, একবাটি ওট আর আমার সেই নিরিমিষ খাবার নিয়ে ঠিসিঠাট্টা করবার জন্য একগুচ্ছের পণ্ডিত আমার অপেক্ষায় আছে।

কে জানে আমার এই নিরামিষ খাবার কারণ কী। এই অভ্যাস সম্ভবত আমার এখানে জন্মায়নি। যে গ্রহ থেকে এখানে এসেছিলাম সেখান থেকেই নিরামিষ খাবারের অভ্যাস নিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা, আমার ফেলে আসা গ্রহের সব বাসিন্দারাই নিরামিষাশী? নাকি এখানকার মতই, সেখানেও কেবল অল্প কিছু পাগলাটে লোক ঘাসপাতা খায়? কে জানে! তবে সেটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হলে তো ইনার কথার জবাবে আমাকে সায় দিতে হবে!

“প্রফেসর মার্লে, আচ্ছা বলুন তো ড্যান্ডেলিয়ন না ডেইজি কোনটায় ক্যালরি বেশি? ক্যান্টিনে এসে বসতেই এক পণ্ডিত এসে চোখ মেরে জিজ্ঞেস করল।

“জানি না। এসব কোনোদিন চেখে দেখিনি। খানিক ওটমিল, জেলি আর দই পাব?”

“আহা অবশ্যই অবশ্যই। জানেন কি প্রফেসর, আমেরিকাতে একটা আলাদা গোষ্ঠী আছে নিরামিষাশীদের?”

“হ্যাঁ জানি, আমি ওই গ্রুপের একজন অনারারি মেম্বার। সার্টিফিকেট আছে। দেখবেন?”

সারাটা দিন বেশ ঝামেলায় কেটেছে আজ। ক্লান্ত ছিলাম। নার্ভাসও লাগছিল। দাঁড়াতে গেলে টলছিলাম একটু একটু। বুঝতে পারছিলাম বুড়ো হয়ে পড়ছি। বাড়ি গিয়ে একটা লম্বা ঘুম দেয়া খুব জরুরি আমার। চোখের সামনে কুয়াশার একটা পর্দা নেমে আসছিল আমার। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল সবকিছু।

“আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে প্রফেসর? চলুন আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাই।”

“না না, আমি ঠিক আছি। একুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেই সুস্থ হয়ে যাব।”

চোখের সামনের কুয়াশাটা পাক খেয়ে ঘন হয়ে উঠছিল আমার। চারপাশে সবকিছু দুলছিল। যেন ঘন মেঘের ভেতর দিয়ে একটা প্লেনে চেপে উড়ে যাচ্ছি। হালকা একটা দুলুনি শরীরে। চারপাশের কিছুই চোখে পড়ে না। আস্তে আস্তে চারপাশের সমস্ত শব্দ মৃদু হয়ে এল। প্রথমে মিলিয়ে গেল ক্যান্টিনের গুণগুণ শব্দ। তারপর একে একে চারপাশের টেবিলগুলো থেকে কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ। আর তারপর হঠাৎ সেই আঁধার ঘেরা, দোলায়মান নৈঃশব্দের ভেতর থেকে একটা কথার টুকরো ছিটকে এল আমার কানে।

"একটা বই পড়ছি বুঝলে? দুর্দান্ত বই। ছাড়তে পারছি না। বইটার নাম 'হেড হান্টার্স।' তোমরা কেউ পড়েছ বইটা?"

আমি উত্তরটা শুনতে পাইনি। কিন্তু আমার চোখের সামনে ঝলসে উঠেছিল একটি দৃশ্য। পরিষ্কার। ঠিক 'ইজভেস্তিয়া'র মস্কোর অফিসগুলোর মাথার নিয়ন আলোর বোর্ডগুলোর মত ঝলমলে, স্পষ্ট। কিন্তু দেখা দিয়েই হারিয়ে গিয়েছিল সেটা। তারপর দেখেছিলাম গভীর নীলাভ অন্ধকারের বুক থেকে বিশাল বড়ো, হলদেটে কিছু একটা ভেসে উঠছে। সমুদ্র?

"জঙ্গল এসে গেছে। এখানেই নামব আমরা।"

মেঘের গণ্ডি থেকে নেমে এসে দিগন্তবিস্তৃত জঙ্গলের ওপর চক্কর খেতে লাগল আমাদের হেলিকপ্টারটা।

"এখানেই কোথাও হবে জায়গাটা।"

"কী করে বুঝলে?"

"মেমোরি ইউনিটটা অন্তত এযাত্রা ঠিকঠাক কাজ করেছে হে। এখানেই এসেছিলাম শেষবার।"

আমরা দশজন আছি হেলিকপ্টারে। প্রত্যেকের পরনে সবজে উর্দি। সবার মাথায় স্বচ্ছ ভাইসর লাগানো হেলমেট। হাতের অস্ত্রগুলো আকারে অনেকটা পৃথিবীর অস্ত্রের মতো, তবে তার থেকে অনেক শক্তিশালী। নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ

করতে পারে। মুশকিলটা হল আমরা যাদের ধরতে এসেছি তাদের কাছেও ঠিক এরকমই অস্ত্র আছে। ওরা অস্ত্রগুলো জুটিয়েছে এক শিকারির কাছ থেকে। এখন কারা আগে কাদের ধরে সেটাই দেখার। হয় মারো, নয় মরো।

"লোকগুলো শয়তানের মত চালাক হয়ে উঠেছে।"

"ওদের কাছ আর কী আশা করো? এদের জান্তব ইন্সটিঙ্কটগুলো ফিরে এসেছে। ওটাই এদের আত্মরক্ষার অস্ত্র।"

"ওদের স্বভাবটা এরকম হল কী করে?"

"কন্ডিশনড রিফ্লেক্স হে। নেহাত বাঁচবার তাগিদ।"

"আরে সেটা তো সবাই চায়। আমরা চাই না?" কথাগুলো আমরা কেউই মজা করার জন্য বলছিলাম না। তাই একে অন্যের কথা শুনে আমরা কেউ হেসে ওঠিনি। একটা ভয়ংকর লড়াইয়ে নামার আগে আকাশ থেকে আমরা সবাই শিকারি বাজের মতো চারপাশটা দেখছিলাম। আমরা ঠিক সৈনিক না হলেও কাজটা অনেকটা সৈনিকেরই মতো। আমরা একটি পুলিশের দল, যাদের কাজ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উত্তর অংশ নিয়ন্ত্রণ করা।

আমরা নামছি। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে আমাদের। যে জায়গায় ওই শয়তানের দল ঘাপটি মেরে আছে বলে খবর, সেটা এখান থেকে খুব একটা দূর হবে না।

হেলিকপ্টারটা মাটিতে নেমে খানিক ঝাঁকুনি খেতে খেতে গড়িয়ে কতকগুলো বড়ো গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে গেল। গাছের গুঁড়িগুলো এমন চকচক করছিল যে যেন মনে হচ্ছিল কেউ ধরে ধরে এক-একটাকে পালিশ করেছে। গাছের মাথাগুলো রাজমুকুটের মতো ঝকঝক করছিল। ওতে সূর্যের আলোর বেশিরভাগটাই আটকে গেলেও পাতার ফাঁক দিয়ে খানিক সূর্যের আলো যা মাটিতে পৌঁছচ্ছিল তাতে যথেষ্ট তাপ। আমরা রয়েছি দক্ষিণ গোলার্ধে। ঘাসগুলো কার্পেটের মতো নরম। জঙ্গলের খানিক ভেতরে, বড়ো গাছের নীচের ঘাসগুলোর আকৃতি আবার অন্যরকম। অনেক লম্বা ওগুলো। একেবেঁকে ছড়িয়ে গিয়ে গাছের শেকড় আর ঝরা পাতাগুলো

জড়াজড়ি করে ছবি এঁকে রেখেছে। যেন। নানা রঙের ছোঁয়ায় এ এক অদ্ভুত বাগান। ঘাসের ঝোঁপের মাঝে ইতিউতি উঁকি মারছিল বাদামি মাটি। ঘাস আর মাটিকে মাকড়শার জালের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে গাছের শিকড়।

"হেলিকপ্টার পাহারা দিতে কাকে রেখে যাব?"

"কাউকে রাখার দরকার নেই। ভয়ের কী আছে? ওরা এটা ধ্বংস করতে পারবে না।"

"কিন্তু এটাকে নিয়ে তো উড়ে যেতে পারে?"

"ওরা এতদিনে হেলিকপ্টার ওড়ানোর কায়দা ভুলে গেছে।"

"সত্যি? ভেবে দেখো। অস্ত্রের ব্যবহার এরা ভোলেনি কিন্তু!"

"ভোলেনি, কারণ গুলি চালানোটা ওদের নিয়মিত রপ্ত করতে হয় নিজেদের রক্ষা করার জন্য।"

আমি ছিলাম দলের নতুন সদস্য। মনে হল একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা এই জঙ্গল থেকে ওদের তাড়াতে চাইছি কেন? ওরা কি কিছু ক্ষতি করছে?"

"আরে সভ্যতার চাপে প্রায় সব জঙ্গলই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। টিকে থাকা অবশিষ্ট এই ঘাস আর গাছগুলোকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাসায়নিক বস্তু থেকে বানানো খাবার খেয়ে খেয়ে হাজারো রোগের জন্ম হচ্ছে। এই ঘাস, গাছের পাতা আর শেকড় থেকে যে খাবার তৈরি হয় সেটাই শুধু প্রাকৃতিক। এগুলোই পারে আমাদের সুস্থ রাখতে। আমাদের মতো ওদেরও ঠিক একই খাদ্য চাই যা আমরা খাই। তাই ওদের নজর এই জঙ্গলের দিকে।"

"কেন?"

সবাই হেসে উঠল।

"নইলে তো একে অন্যকে মেরে খেতে হয়! মানে ধরো, আর কোনো খাবার নেই। তাহলে বেঁচে থাকতে লোকজনকে একে অন্যের মাংস খেতে হবে। কিন্তু শুধু মাংস মানে প্রোটিন খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না, শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিনের

জন্য শাকসবজিরও দরকার। তাছাড়া ঝোল ছাড়া তোমার মাংস খেতে কি ভালো লাগবে?”

একে অন্যের মাংস খাওয়া সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পুরোপুরি নিষিদ্ধ, কিন্তু ওর বাইরের রিজার্ভেশান এলাকাগুলোয় সবই ওই কাগজে কলমে। কেউই এসব আইনের বুলি মানা হচ্ছে কি না দেখতে যায় না। নজরদারি করাটা অসম্ভব। অসহ্য গরম, ধুলো আর লাইলাক রঙের পাহাড় চারপাশে। হাজারো সমস্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে মানুষ শহর ছেড়ে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে তার আওতার বাইরের রুক্ষ এলাকাগুলোতে। বিশেষ করে যারা শহুরে পরিবেশে আর নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না তারা। আর, এই শহরভীতি রোগটা তাদেরই ধরেছে যারা শারীরিকভাবে শক্তপোক্ত। এরাই পালিয়ে এসে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব এলাকায়। নিজেদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে আর বেঁচেও থাকছে। পুরোনোকালের লুপ্ত জন্তুদের মত এরা একে অন্যকে শিকার করে।

“না! এদের আমরা মারব না। এমনিতেই মরবে এরা।” কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। কাজেই আমরাও এদের মারি না। কেবল আমাদের হাতে থাকা জঙ্গল

এলাকাগুলোয় এদের কোনো দল এসে ঢুকলে তাড়া করে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে। বের দেওয়া হয়। সে-রকম একটা অভিযানেই আমাদের এখানে আসা।

জঙ্গলের শুকনো ঘাসের ওপর পা দিয়ে মাড়ানোর ছাপ স্পষ্ট। ঘাসগুলো পায়ের চাপে এমনভাবে নুয়ে গেছে যে ওরা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পায়ের চাপে শুয়ে পড়া ঘাসের সার মাথা ঝুঁকিয়ে এগিয়ে গেছে জঙ্গলের ঘোর অন্ধকারের নীচে। আর ওখানেই লুকিয়ে আছে বিপদ।

“ওরা যে-কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে।” বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর। “ওরা ঝোঁপের আড়ালে এমন নিঃসাড়ে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে যে, একটা পাতাও নড়বে না। ওরা গাছের মাথায় লুকিয়ে থাকলেও টের পাবে না। সুযোগ

পেলেই বোঝার কোনো সুযোগ না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।”

ইন্সপেক্টর আর তাঁর দলের কাছে পলাতকদের তাড়া করে বেড়ানোটা একটা পেশা। আর এটা সেই পেশাদারিত্ব প্রমাণের এক উত্তেজনাময় মুহূর্ত। কিন্তু আমি ওদের মধ্যে কেন? শুধু কৌতূহলের বশে!

“এই কৌতূহল দেখানোটা তোমার সবচেয়ে বড় বোকামি।” অষ্টা অনেক আগেই আমাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল, “এই গলদটা শোধরানো দরকার।”

কিন্তু আমি আমার এই কৌতূহলের গলদ শুধরাতে চাইনি। আমার মনে হয় কৌতূহলই বেঁচে থাকার রসদ।

মাটিতে নেমেই আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিলাম কোনো পাতা মাড়ানোর শব্দ শোনা যায় কি না। গাছের ফাঁক দিয়ে নড়াচড়ার চিহ্ন দেখার চেষ্টা করছিলাম। মাথার সামনে ঝুলতে থাকা গাছের ডাল অতি সন্তর্পণে সরিয়ে নুইয়ে থাকা ঘাস লক্ষ করে এগোচ্ছিলাম। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বেজে উঠল শিসের শব্দ, গাছের ওপর থেকে ঘাসে বোনা দড়ির ফাঁস নিঃশব্দে নেমে এল আমাদের গলা লক্ষ করে।

“সবাই কাছাকাছি থাকো।” ইন্সপেক্টর চাপা গলায় বলে উঠলেন। “আঙুলগুলো যেন সবসময় বোম ছুঁয়ে থাকে।”

বুঝলাম উনি আমাদের হাতিয়ারের কথা বলছেন। আমাদের এই বন্দুকের এক-একটা বোতামে চাপ দিলে বেরিয়ে আসে এক-একটি রশ্মি। আর এই রশ্মি মুহূর্তে নিয়ে আসে বেদনাহীন মৃত্যু। কিন্তু ওরাই যদি আমাদের আগে দেখে ফেলে, তাহলে?

অষ্টা আগেই আভাস দিয়েছিল, “ওরাই আমাদের দলের খোঁজ আগে পাবে, তারপর ওরা তাই করবে যেটা আমরা ওদের আগে খোঁজ পেলে করতাম। হয়তো তার থেকেও আরও মারাত্মক কিছু করবে। অনেকদিন ধরে ওরা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে, জঙ্গলটা ওরা আমাদের থেকে অনেক ভালো চেনে।”

সম্ভবত এই জঙ্গলটাকে কেউই ভালো করে জানে না। ঠিক ততটুকুই জানে, যতটুকু খাবার ও শিকার করতে গিয়ে চেনা সম্ভব। আমারাও জঙ্গলটা জানতে খুব

একটা উৎসাহ দেখাইনি। জঙ্গল থেকে পাওয়া জিনিসগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছি।

নিঝুম রহস্যময় জঙ্গলটা জনশূন্য। পায়ের নিচে নরম ঘাস থাকায় আমাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। সবাই ঘামে ভেজা হাত দিয়ে যে যার অস্ত্রগুলো আঁকড়ে ছিলাম।

"ওরা যদি পালিয়ে যায়," বললেন ইন্সপেক্টর "তাহলে ওদের খুঁজে বের করে তাড়াতে তাড়াতে অনেক লোকের প্রাণ যাবে।"

তখনও পর্যন্ত আমাদের দু-পক্ষের কারোই কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তার থেকেও বড়ো কথা ওরা আদপেই এখানে আছে কি না আমরা নিশ্চিন্ত নই। না কোনো শব্দ, না কোনো নড়াচড়ার আভাস। তাহলে কি ওরা অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে? বাতাসও স্তব্ধ হয়ে আছে। পুরো জঙ্গলটা যেন এক বিশাল নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত হলঘর। বিশাল গাছগুলো যেন ওর ছাদ, আর গুঁড়িগুলো এক-একটা থাম। বছরের পর বছর ধরে একাকী চুপটি করে টিকে আছে।

আমাদের দলের যিনি সবার আগে ছিলেন, তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

"কী হল?"

"মনে হচ্ছে আমরা জায়গাটা পার হয়ে এসেছি।"

"ঠিক বলছ তো?"

"হ্যাঁ, আমরা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি।"

"ভুল দিকে আসিনি তো?"

"না, না। তা নয়।"

"তার মানে ওরা এখান থেকে সরে পড়েছে।"

"মনে হয় না। ওরা এখানেই আছে এবং আশেপাশেই লুকিয়ে আছে।"

"কী বলতে চাইছ?"

"ওরা গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকলে খুঁজে পাবে না। ক্যামোফ্লেজিংয়ে ওদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। আমরা সেই ক্ষমতাটা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু ওরা সেই দক্ষতাটা শুধু ধরেই রাখেনি বরং আরও পটু হয়ে উঠেছে।"

“ওরা যে-কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।”

“কিন্তু ওরা যদি আগে আমাদের হদিশ পায়?”

যদিও প্রশ্নটা খানিক বোকা বোকা ধরনের ছিল, কিন্তু ঝানু পুলিশ কর্তাটি উত্তর দেবার আগেই একটা কালো কিছু বাতাসে ঝলসে উঠল। একটা আর্ত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে নিঃসাড় হয়ে গেলেন উনি। ফালা হয়ে যাওয়া গলা থেকে রক্তের লাল স্রোত বেরিয়ে এল।

“মাটিতে শুয়ে পড়ো।” কেউ একটা চাপা গলায় বলে উঠল।

আমি একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে মাটিতে লেপটে গাছটার শিকড়ে গালটা চেপে রাখলাম। মনে পড়ে গেল অষ্টার সেই ছাড়া ছাড়া কথাগুলো, “তুমি এর আগে কখনো মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখোনি। মৃত্যুকে যেরকম বলে জানো, আসলে তা মোটেই সেরকম নয়। তাই মৃতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকাই ভালো।”

আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলাম না। সহকর্মীর প্রাণহীন দেহটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম খানিক। দেহটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে নামতে একটা গাছের শিকড়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠে হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

এটাও কি একটা অদ্ভুত রহস্যময় কল্পনা ছিল?

না, ছিল না। ওরা ছিল। আমি ওদের দেখতে পেয়েছিলাম, নগ্ন বাদামি শরীর। লম্বা চুল, আর দাড়িভর্তি মুখ। খানিক লতাপাতা কোমরে জড়ানো। ওরা আমাদের অস্ত্রের নাগালের বাইরে গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে ছিল। আমাদের উচিত ছিল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে ওদের আরও কাছে আসতে দেয়া। কিন্তু আমাদের দলের একজন অধৈর্য হয়ে তাঁর রশ্মি বন্দুকের বোতামে চাপ দিল। গাছের পাশ দিয়ে রশ্মিরেখা ঝলসে উঠল। সামনে থাকা কয়েকটা গাছের গুঁড়ি নিঃশব্দে দো-ফালা হয়ে লতাপাতার বাঁধনে আটকে ঝুলতে থাকল শুন্যে। মাথা উঁচু করে থাকা অন্য গাছগুলো কেটে যাওয়া গাছগুলোর মাথাকে আকাশের দিকেই ধরে রাখল।

এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটল, অথচ জঙ্গলে তার কোনো রেশ টের পাওয়া গেল না। ঠিক একই নিস্তব্ধতা টিকে রইল। যেন কিছুই হয়নি। গভীর নিস্তব্ধতা গায়ে মেখে জঙ্গল একইভাবে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার ভেঙে দিল জঙ্গলের নিস্তব্ধতা। লম্বা একটা শ্বাস টানার শব্দ আচমকাই শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল। টের পেলাম খানিক আগে বন্দুক থেকে রশ্মি ছোঁড়া সহযোদ্ধাটি আর বেঁচে নেই।

আমরা বোকার মতো কোনো আড়াল না নিয়েই ছুটতে লাগলাম। সবার সঙ্গে আমিও ছুটেছিলাম। আমার মুখ ঘাম আর চোখের জলে মাখামাখি হয়ে ছিল। ফাঁদে পড়া বুনো জন্তুর মতো আমরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। ঝানু শিকারির দল আমাদের ঘিরে রেখেছে। পালাবার পথ নেই।

আচমকা মাথার পিছনে একটা আঘাত পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে। প্রায় অচেতন হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে কেউ কথা বলে উঠল। আর এই গলার আওয়াজটা আমার সঙ্গীদের কারো ছিল না।

"এটাকে নিয়ে কী করব? এখনও বেঁচে আছে।"

"চলো ওকে গাড়িতে নিয়ে তুলি।"

"মেরে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়!"

"ঘাবড়াচ্ছ কেন? ওদের চারজন খতম। একে বাঁচিয়ে রাখলে ওদের খানিক ঠেকিয়ে রাখা যাবে।"

"তাহলে?"

"তাহলে আবার কী? ভাগব এখান থেকে। এটা ওদের অঞ্চল, ওদের জঙ্গল। আমরা যদি ওদের একজনকে জ্যান্ত ছেড়ে দিই তাহলে ওরা মনে করবে আমরা এই জঙ্গল ছেড়ে যেতে রাজি। এটা একটা ট্রিক, বুঝলে?"

ওরা আমাকে তুলে নিয়ে এগোতে লাগল। আমি দুলতে দুলতে টের পাচ্ছিলাম আমার মাথার ওপরকার ঘন সবুজ চাঁদোয়া ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসছে। আমার

দৃষ্টি ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছ। জানালার কাঁচের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত ঝরে চলা বৃষ্টির জলের মধ্যে দিয়ে আবছায়া কিছু দেখার মতো দেখার চেষ্টা করছি। অস্পষ্ট দৃষ্টির মতো আমার কানে এল ছাড়া ছাড়া কিছু কথা। গলার আওয়াজ একেবারে নতুন।

"আমাদের অ্যাম্বুলেন্স ডাকা উচিত।"

"কেন? এর আগেও তো এরকম কত নিয়ে গিয়েছি। গাড়িতে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। উরির গাড়ি আছে।"

"ভলোকভকে ডাকব?"

"না না, ওর থেকে ইনাকে ডাকা ভালো।"

এক, দুই... এক, দুই... ঠিক বাচ্চাদের দোলানোর মতো তালে তালে ওরা আমাকে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু নিয়ে চলেছে কোথায়? আমি আছিই বা কোথায়?

আমার চেতনা এক জগৎ থেকে আরেক জগতে গোঁত্তা খাচ্ছিল। এক, দুই.. এক, দুই... ঠিক যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম। লম্বা লাঠির তলায় একটা ছোট্ট গোলক। কাজই হচ্ছে এ-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দোল খেয়ে যাওয়া। মৃদু হিসেব করা দুলুনি। মনের আনাগোনা চলছে জগতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। যেন একটা অতিকায় সমুদ্রনীল ঘরের মাঝখানে ঝুলে থাকা আমিএক পেণ্ডুলাম। দোল খেয়ে চলেছি তার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে... অতীত... বর্তমান...অতীত...

অর্থাৎ ঝটকাটা তখনো পুরোপুরি কাটেনি আমার। সেই মুহূর্তটাকে মনে করতে গিয়ে এখন খেয়াল হচ্ছে, সেটা হিমশীতল কুয়াশায় মোড়া একটা নীলচে রঙের বিশাল ঘর। কুয়াশা, আরও একটা ইঙ্গিত যে সবকিছু মনে পড়েনি তখনও আমার! শুধু কিছু কথাবার্তা... সেই অজ্ঞতার কুয়াশা পেরিয়ে এসে ঘা মারছিল আমার কানে।

দু' জন লোক কথা বলছে, আর আমি তাদেরই একজন। আর এই অন্যজনের আওয়াজ খুব পরিচিত।

"আমি তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম যে শেষটা ভালো হবে না।

চারজন মৃত। এতেও কি তোমার শিক্ষা হয়নি?”

“ওরা কি জানত অভিযানের পরিণতি কী হতে পারে?”

“অবশ্যই জানত। শত হলেও ওরা পুলিশ। কিন্তু তুমি জানতে কি?”

এই বিষয়টা নিয়ে ওড়ার আগে অনেকবার আমরা আলোচনা করেছিলাম। এখন সে বলতেই পারে যে আমার ভাগ্য খুব ভালো আর আমি খানিক শিক্ষা পেয়েছি।

“কী বলতে চাইছ অষ্টা?”

“উপেক্ষা। রিজার্ভেশনে লোকজন কীভাবে বাঁচে, কী খেয়ে বাঁচে সেগুলোকে আর দশজননের মত উপেক্ষা করতে পারছ না তুমি কেন? আরে আমাদের মরবার অনেক আগেই তো ওগুলো মরে ভূত হয়ে যাবে। তাহলে ওদের নিয়ে এত কৌতূহল কেন তোমার?”

“আমরা ওদের ওই জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছি কেন?”

“কারণ ওই জঙ্গলটা আমাদের দরকার।”

“ওই লোকগুলো কোন আদর্শের জন্য শহর ছেড়ে রিজার্ভেশনের ঐ ভয়াবহ জীবনে চলে যাচ্ছে? কেন অষ্টা?”

“আমরা ওদের দেখা পাই না, তাহলে কেন ওরা এমন করছে সে নিয়ে ভাববার দরকারটা কী তোমার?”

“এত ভয় থাকতেও কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই লোকে ছুটছে ওই নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। কীসের লোভে? সেইজন্যই ওদের নিয়ে ভাবছি।”

“এতই যদি জানার শখ তবে ওদের জিজ্ঞেস করো। ওদের সঙ্গে নিরস্ত্র অবস্থায় একাকী দেখা করো। ওরাই তোমাকে উত্তর দেবে।” অষ্টার জীর্ণ গলাটা খরখর করে উঠল, “তা না চাইলে বলল, আমিই তোমাকে বলে দিচ্ছি। হতে পারে এতে করে তোমার খানিক শিক্ষা হবে।”

পেন্ডুলামটা দুলছিল নিঃশব্দে। তার সোনালি বল চারপাশে কত না আবছায়া বর্ণময় স্মৃতির প্রতিফলন ছড়িয়ে যায়! কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি। ধরেও ধরতে পারি না

আমি তাদের পুরোপুরি। সময়ের কঠিন অঙ্কে বাঁধা দুলন্ত পেণ্ডুলাম, স্মৃতির মধুর সুর ছড়ায়, ছাড়া ছাড়া টুকরো টুকরো সুর,

"এটাই অনিবার্য ছিল, বুঝলে? সময় থেমে থাকে না বা উলটোদিকে চলে না। আমরা সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, আর কোনোদিন সেটা করতেও পারব না। আমরা একটা জায়গার কিনারায় থমকে আছি, আর এগোনোর উপায় নেই। সামনে একটা প্রাচীর। তারপর একটা গহ্বর, যাকে বলে পাতাল, নিঃসীম শূন্য। বেছে নাও কোনটা ভালো। এটা হতে পারে এই পাতালের ওপর দিয়ে একটা সেতু তৈরি করে এগিয়ে যাওয়া, বা ওই প্রাচীরের মধ্যে একটা গর্ত করে তার ভেতর দিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু কেন? কোনো কারণ নেই। এর জন্য অনেক শক্তি লাগে যা আমাদের নেই। কথাগুলো শুনতে ভয় লাগছে? আমরা একটি মরতে বসা সভ্যতা। কোনো কিছুর প্রতিবাদ করাটা সোজা। তবে শেষটা দু-পক্ষেই এক, মৃত্যু।

বিভিন্ন সময়ে অনেকরকমের প্রতিবাদ হয়েছে আমাদের জীবনযাপন নিয়ে। অনেকবার হয়েছে। অধিকাংশ প্রতিবাদই হয়েছে অতীতে ফিরে যাবার জন্য চেষ্টার পথে। প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার শিশুসুলভ আকুতি। প্রাচীনযুগের বাসিন্দাদের মত আদিম স্বাধীনতার শখ। স্বাধীনতার চাহিদা।

কিন্তু কিছু হয়নি। বরং তথাকথিত সভ্যতারই জয় হয়েছে। কেন জানো? কারণ সভ্যতা যত এগোয় তত আমরা প্রকৃতির থেকে, আদিমযুগের সরল জীবন থেকে দূরে সরে যাই আর ততই অসম্ভব হয়ে ওঠে সেই জীবনটায় ফিরে যাওয়া।

তবে আদিম যুগের পূর্বপুরুষের আত্মারা সবসময়েই টিকে থাকে আমাদের মধ্যে। তাদের অস্তিত্ব হারায় না। আণবিক শক্তির আবিষ্কার হল, মহাকাশে উড়ে যেতে শিখলাম, প্লাজমা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম... তখনও ছিল, আর এখন, যখন সেই সবকিছু ফের একবার ভুলতে বসেছি আমরা, তখনও সে আত্মারা রয়ে গেছে। ফের মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে তারা।

"আসলে আদিম হল আধুনিকতার উল্টোটা। আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য সমুখগতি। আর আদিমের বৈশিষ্ট্য পশ্চাদগমন। প্রথমে এরা দু' একটা ঘাসের শিসের মত

শহরের সীমানার বাইরে এদিক ওদিক মাথা তোলে। তারপর এদের সংখ্যা বাড়ে ক্রমশ। উইঢিবির মত জড়াজড়ি করে থাকা আদিম জীবন, মারামারি, ড্রাগ, মহামারীতে মাছির মত মরতে থাকা, আবার মাছির মতই জন্মানো অজস্র নিষ্কর্মার দল। আলস্যের পূজারি। চিন্তা করে না। নড়ে না। কারণ চিন্তা না করে বেঁচে থাকাটা অনেক সোজা। হামাগুড়ি দিয়ে একটা গুহায় ঢুকে যাও অন্ধকার নামলে। খিদে পেলে পাশের লোকটাকে মেরে খেয়ে নাও।

আর এই করেই দক্ষিণের পাথুরে মরুর বুকে ঐ জন্তুর মত লোকজনের দলগুলো দেখা দিয়েছে। সমাজের বাইরে, আইনের বাইরে, সভ্যতার চৌহদ্দির বাইরে থাকা একদল জন্তু। এই হল এদের শহরভীতি রোগ। আমরা এদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোয় ঢুকে আসতে দেখলেই তাড়াই। আমাদের সভ্যতাকে এরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। তাহলে তার আওতার বাইরে নিজেদের রাস্তায় এরা মরুক বাঁচুক আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না...”

কানের কাছে বাজতে থাকা কথাগুলো হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল ঝকঝক করতে থাকা সোনার গোলাটাও। জোরালো আলোর রশ্মিগুলো বুজে গিয়ে চারধার আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চোখের সামনে আর নীল দেওয়ালটা নেই। সেটা বদলে গিয়ে হয়ে গেছে বেগুনি আর তাতে রুপোলী তারা ঝিকমিক করছে। জানালার বাইরের জমাট বাধা কুয়াশা আবার ফিরে এসেছে। সেই জানালা, যে জানালা প্রায় সবসময় ভোলা থাকে। তার মানে আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। ছেলেরা আমাকে ঘরে নিয়ে এসেছে। ওদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ভলোকভ ওর টেবিলে বসে, ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে একমনে লিখে চলেছে। মাথাটা খানিক তুলল। ওর ঠোঁটগুলো নড়ছে। হিসেব করছে, নাকি কিছু ভাবছে? এতক্ষণে ওর নজরে এসেছে যে আমার হুঁশ ফিরে এসেছে। ওর মুখটা হাসিতে ভরে উঠল।

“কেমন লাগছে, প্রফেসর মার্লে?”

"মোটামুটি। আর সবাই কোথায়?"

"এই আধঘণ্টা খানেক আগে বেরিয়ে গেছে। আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, আমি তখন খানিক হিসেব কষছিলাম। ইনা দোকানে গেছে। আপনার রেফ্রিজেটার তো একদম খালি। আপনার উচিত অন্তত খানিক কড়াইশুটি বা স্কোয়াশ রাখা। সেটাকে একদম আন্টার্কটিকার মতো ফাঁকা করে রাখা মোটেই কাজের কাজ নয়।" উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা গলিয়ে নিয়ে ভলোকভ বলল, "যাই, ইনা কী করছে দেখে আসি। সম্ভবত ও খানকতক বাঁধাকপি কিনেছে, ওগুলো নিয়ে আসি গিয়ে, ততক্ষণ আপনি শুয়ে থাকুন। আমরা তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।"

ভলোকভ চলে যেতে আমি চোখ বুজেছিলাম। মনে করছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য কী দেখেছি। এই মুহূর্তের ঘটনাটাগুলো আমার অতীতের খানিক তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে যে আমি ভেজিটেরিয়ান ছিলাম, আর ভেজিটেরিয়ান ছিলাম আমার নিজের গ্রহের সেই কঠোর জীবনযাপনের প্রয়োজনে।

সামনের দরজাটা বন্ধ। পাশের হলঘর থেকে কথা বলার শব্দ ভেসে আসছে। কেউ জুতো খটখটিয়ে বারান্দা পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

ওটা ছিল ইনা। রান্নাঘরে ঢুকে ওর মাস্টারমশাই অর্থাৎ আমার জন্য খাবার বানাচ্ছে। না, মাংস দিয়ে কোনো লোভনীয় খাবার নয়। গাজর আর বাঁধাকপি কোঁচানো সেদ্ধ। এই নিয়ে না দিন সেই একই মেনু। আমি ওদের মুখ দেখতে পেয়েছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার আমার চেতনা ডুবে গিয়েছিল কুয়াশার আড়ালে।

নোটবুক-৪

আমার জ্ঞান হারানোর দশাটা এখন ঘন ঘন ফিরে আসছে। আর যত দিন যাচ্ছে, জ্ঞান হারালেই আমার অতীত ভীষণভাবে দখল নিতে শুরু করেছে বর্তমানের ওপর। পরিষ্কার হয়ে আসছে সবকিছু! আর এই দৃশ্যগুলো এক-একটা ইট হয়ে উঠে আমার মনের দেওয়ালটাকে আরও উঁচু করতে করতে লোকের সঙ্গে আমার

দূরত্বটা বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু, দূরত্ব বাড়লেও, 'মোগলি' ততদিনে মানুষের ছোঁয়া পেয়ে 'মানুষ' হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে ফেরত যাবার আর কোনো উপায় ছিল না ওর। হয়তো, ফেরত যাবার পথ থাকলেও ও আর যেতে চাইত না। যে দুনিয়া তাকে জন্ম দিয়েছিল সেখানে ফিরে গেলে সে কী দেখবে কে জানে! নরখাদক পিথেকেনথ্রোপসের দল? নাকি, অকেজো জ্ঞানের বোঝা নিয়ে পাথরের বুকে ফসিল হয়ে যাওয়া একদল পণ্ডিত জীব? সে জানত না। জানবার আর কোনো আগ্রহও অবশিষ্ট ছিল না তার।

কিছুদিন আগের কথা। আমি লন্ডনে এক ম্যাথমেটিক্যাল সিম্পসিয়ামে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে উপস্থিত সবাই যার যার মতো করে কমিউনিকেশন (যাকে ইনফর্মেটিকও বলা যায়) বিষয়ে এক-একটা আলাদা আলাদা তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করছিল। সে-সময় সিম্পোসিয়ামের অধিবেশনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আমি বিজ্ঞানী বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে পিকাডিলিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে চারপাশে চোখ চালাতে চালাতেই ভাবছিলাম, যদি এই গ্রহটাও কোনো যুদ্ধবিগ্রহের বালাই ছাড়া বেড়ে উঠতে পারত তাহলে, সম্ভবত একদিন সে-ও ছায়াপথের সুদূরে আমার নিজের গ্রহের সভ্যতার স্তরে পৌঁছে যেতে পারত। বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর! আর তার বৃদ্ধি হয় না। বৌদ্ধিক সুখ বা সৃজনশীলতার উষ্ণতা সেখানে হিমায়িত হয়ে গেছে। আমার ডাকনামটি সার্থক! তুষারমানব! 'দ্য অ্যাবোমিনেবেল স্নোম্যান! কারণ যে শীতল, মুমূর্ষ সভ্যতার গ্রহের সন্তান আমি সেখানে শুধু জলই নয়, তার বাসিন্দাদের হৃদয়ও হিমায়িত হয়ে গিয়েছে বহুকাল।

সিম্পসিয়ামে চল্লিশ বছর বয়সি অধ্যাপক কিংসলে তাঁর বক্ত...তায় দাবি করলেন, বিজ্ঞানের গবেষণার আর বেশি না এগোনোই ভালো। কারণ নতুন তত্ত্ব সবসময়েই কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

আমি যেন তাঁর বক্তব্যে আমার গ্রহের সেই বৌদ্ধিক চিরতুষারের শীতল স্পর্শ অনুভব করেছিলাম।

কিংসলে রাদারফোর্ডের উদাহরণ দিচ্ছিলেন। বলছিলেন রাদারফোর্ডের পরমাণু

গবেষণার ফল হয়েছে জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি। "শুধু পরমাণু গবেষণা নয়," কিংসলে জোর দিয়ে বলছিলেন, "ইতিহাস বলে, যেকোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই যে-মুহূর্তে বড়ো আকারে কাজে লাগাবেন, সেই মুহূর্তেই তা থেকে সভ্যতার সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে।"

কথাগুলোর বৌদ্ধিক দৈন্য সে-মুহূর্তে আমাকে চমকে দিয়েছিল। আর তারপর, একেবারে হঠাৎ করেই মনে হয়েছিল, আচ্ছা, আমার গ্রহের মানুষজনও হয়তো এই পথেই ভেবেছিল!

উত্তরটা অবশ্য সভায় বসে কোনো জ্ঞান হারানোর মুহূর্তে ফিরে পাওয়া স্মৃতির ঝলকে আমার কাছে আসেনি। সে-জবাব আমি পেয়েছিলাম পরে। মস্কো ফিরে আসার পর দুই বিজ্ঞানীর প্রবন্ধ পড়বার পর।

একজন আমেরিকান প্রফেসর। না কিংসলে নন, তবে বৌদ্ধিক চিরতুষারের ছোঁয়াচ তাঁর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন বিজ্ঞানের উন্নতি অনেক সময়ই মানবজাতির স্বার্থবিরোধী। তিনিও প্রায় কিংসলের মতো একই যুক্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ভবিষ্যতে মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে বলে সওয়াল করেছেন।

আবার আর এক রাশিয়ান বিজ্ঞানী এইসব যুক্তিকে আত্মহত্যার সামিল বলে বলেছেন। চতুরভাবে যুক্তি আর উদাহরণ সাজিয়ে সাজয়ে তিনি দেখয়েছেন, বিজ্ঞানের প্রতিটি অগ্রগতি মানুষের জীবনে মঙ্গলই এনেছে।

এরপর একদিন হোটেলের বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ফের অজ্ঞান। হয়ে যাই। সেই অবস্থায় আমার মনে ভেসে উঠেছিল আমার নিজের গ্রহের আরও একটি খণ্ডস্মৃতি ু আমার অতীত গ্রহের বাসিন্দাদের ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে আরো একটি পদক্ষেপের দৃশ্য। এযাত্রা দৃশ্যটা ছিল ভীষণ জীবন্ত। ঠিক যেন ঘটনাগুলো ঘটে চলেছিল আমার চোখের সামনে।

.আমার বয়স তখন তিরিশ হবে। নতুন মহাকাশ অভিযানে আমি সুযোগ পেয়েছি প্লটার হিসেবে। তিনশো বছর বন্ধ থাকার পর প্রথম মহাকাশযাত্রা। (আমি এই

অঙ্কটা করছি পথিবীর সময়কে ভিত্তি করে, কারণ আমার বর্তমান রূপ আমাকে অন্যভাবে হিসেব কষতে দেয় না।)।

এটা জানতাম, তিনশো বছর আগে গ্রহ ছেড়ে বের হওয়া আমাদের শেষ মহাকাশযানটি ফেরত আসেনি। মাঝের সময়ে নতুন করে কোনো মহাকাশযান তৈরিও হয়নি, আর মহাকাশ চর্চাও বন্ধ ছিল। কোনো গবেষণাও হয়নি, হয়নি মহাকাশযাত্রার জন্য কাউকে প্রশিক্ষণ দেওয়াও। ছিল কিছু পুরোনো অবজারভেটরি, আর ছিল কিছু বন্ধ করে দেওয়া মহাকাশযান তৈরির স্বয়ংক্রিয় কারখানা।

কয়েকজন শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওইসব কারখানার কয়েকজন কর্মীদের রেখে তাদের সহায়তায় গোপনে স্ফটিকের মধ্যে সংরক্ষিত তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করত। আমি ওদেরই একজন ছিলাম।

একদিন জানতে পারলাম যে নতুন করে মহাকাশযাত্রা হচ্ছে আর আমি প্লটার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। নির্বাচনের পর থেকে সবাই আমাকে প্লটার বলেই ডাকত।

"ভয় পাচ্ছ না তো প্লটার?"

"না!"

"কয়েক শতাব্দী ধরে কোনো মহাকাশযান কিন্তু তৈরি হয়নি।"

"তৈরি হয়নি তো কী হয়েছে? আমরা কি মহাকাশযান বানাতে ভুলে গিয়েছি? আরে, এটাকে তো সেই পুরোনো নকশা ধরেই বানানো হয়েছে।"

"বানাবার জিনিসপত্রগুলো জোগাড় হল কী করে?"

"অনেক মালপত্র গুদামে পড়ে ছিল। তাছাড়া মহাকাশযান বানানোর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক ঠিক কাজ করছিল। কয়েকজন পুঁদে লোককেও পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা, ওরাই এই ভেলকিবাজিটা দেখিয়েছে।"

"কিন্তু মনে রেখো, এই মহাকাশযানটা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।"

"উড়তে উড়তে পরীক্ষা করে নেব!"

সন্ধে বেলা টিমটিম করে জ্বলতে থাকা অবজারভেটরির ভেতরকার হালকা

আলোয় প্রশ্নকর্তার মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

"তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরসূরি।" ওর কথায় বিদ্রুপের কোনো লেশ ছিল না।

"পূর্বসূরিদের রোমান্টিকতা তোমার মধ্যে পুরোপুরি আছে। বন্ধু, তুমি অনেক দেরি করে জন্মেছ।"

আনন্দে আমার মন নেচে উঠলেও আমি চুপ করে ছিলাম। জানি ও যা বলছে, প্রাণের ভেতর থেকেই বলছে।

"ভেবে দেখো হয়তো এই মহাকাশযান আর কখনোই ফিরবে না। হতে পারে আমরা দেখব ওড়ার সময়ই ধ্বংস হয়ে গেল এ যান। চাইলে নাও যেতে পারো এ যাত্রায়। তোমাকে কেউ বদনাম দেবে না। কেন ছুটছ এই নিশ্চিত মৃত্যুর পিছনে? কাটিয়ে দাও না বাকি জীবনটা আমাদের সঙ্গে।"

"না।"

শীতল ভোর কেটে গিয়ে আরো একটা বরফঢাকা সকাল শুরু হল। আমি যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি আমার থেকে বছর সাত-আটের বড়। আর কয়েকবছর মাত্র বাঁচবেন উনি। কারণ, আমাদের গড় বয়স তো মাত্র চল্লিশ।

"প্লটার, তুমি কি জানো যে কোথায় যাচ্ছ?"

"অন্য কোনো গ্রহে।"

"সে গ্রহের স্থানাঙ্কের হিসেব করেছ?"

"একটা হিসেব করেছি।"

"আমি একবার দেখতে চাই। তোমার মনে আছে?"

আমি দূরের সৌরজগতের ছবিটা দেখেছিলাম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীও ছবিটি দেখেছিলেন, কারণ হলঘরের বড়ো সাদা অংশে ছবিটি স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করছিল।

"গ্রহটিকে খুঁজে বের করো।"

আমি যে ছবিটি দেখেছিলাম, সেটি ছিল সোভিয়েত মহাকাশচারীদের তোলা

অনেকটা পৃথিবীর ছবির মতো। নীল সমুদ্র। তার মাঝে মহাদেশগুলোর স্বতন্ত্র রূপরেখা। আফ্রিকার পরিচিত আউটলাইন।

সেই সময় আমি জানতাম না যে আমার কী করা উচিত। এই গ্রহের শারীরিক রূপ আমার কাছে অজানা ছিল। কিন্তু তাও এ-গ্রহ আমাকে টানছিল।

আমার রকম দেখে জ্যোতির্বিদ মৃদু হাসছিলেন।

"বিশাল ছায়াপথ তোমাকে ডাকছে, তাই না? আমার মধ্যেও সেই একই অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে। আর বছর তিনেক হয়তো বাঁচব। এই বয়সে কেউ আমাকে মহাকাশযাত্রায় পাঠাবে না।"

"কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো মহাকাশযাত্রা হয়নি। কেন জানতে পারি?"

"তুমি স্ফটিক তথ্যভাণ্ডার থেকে জেনেছ কেন এবং কখন থেকে বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়েছিল, স্পেশালাইজড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সব কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তথ্য ভরে রাখার স্ফটিক আঁধার তৈরি। ...শুধু তোমার আমার মতো কিছু পাগল নীরবে অতীতের বিজ্ঞানের কবর ঘেঁটে গিয়েছি।"

"আর কবর ঘেঁটেই খুঁজে পেয়েছি আমাদেরই মতো অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকা প্রাণীর গ্রহের সন্ধান।"

"আমি যখন সব বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলতে ডাকা কাউন্সিলের মিটিংয়ে গিয়েছিলাম, তখন মিটিংয়ের মাঝেই হেসে ফেলেছিলাম। মিটিংয়ে বলেছিলাম, 'সব ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে চাও ফেলো, কিন্তু হতেও তো পারে ঠিক আমাদের মতোই কোনো গ্রহ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও আছে। সেটাকে খুঁজলে হত না?' ওরা কী উত্তর করেছিল জানো? বলেছিল আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে, ভিন্নগ্রহীদের বুদ্ধির প্রয়োজন। নেই। তবে পরিষদের ওই সভা তখনই সবকিছু ধ্বংস না করার পক্ষেই রায় দিয়েছিল।"

কথা বলার মাঝেই জ্যোতির্বিদের পেছন থেকে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এক লম্বাচওড়া মানুষ এসে হাজির হলেন। লোকটা আমার থেকেও লম্বা। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন। ভদ্রলোক আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন নীরবে মাথা নাড়িয়ে

বললেন, “কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন কোরো না।”

আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়িয়ে মনে মনে বলে উঠেছিলাম, ‘আমি শুধু শুনে যাব।’

“আমাদের প্রায় সবারই বয়স তিরিশ পার করেছে, মাথার ওপর মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ঘুরছি।” উনি বলে উঠলেন।

“মাত্র দশ বছর ধরে আমরা এই কাজটা করছি। কিন্তু কিছু লোক এই দশ বছরের কাজটাকেও গুঁড়িয়ে শেষ করে ফেলতে চায়। বিগড়ে দিতে চায় এই গবেষণাটাকে... আর কিছু লোক আগামীকাল শেষদিন হতে পারে ধরে নিয়েও নতুন কিছু খুঁজে পাবার আশায় এই গবেষণাটা চালিয়ে যেতে চায়। তুমি এই দ্বিতীয় দলের লোক, আর আমি তোমার কাজে খুশি। আমি তোমার গণনাগুলো দেখেছি, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে তুমি হিসেব কষেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে মহাকাশযাত্রায় যাচ্ছ।”

কিন্তু আমি বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসলাম। “তিনশো বছর ধরে কোনো যান মহাকাশে যায়নি। তাহলে এমন কী হল যে পরিষদ মত পালটে মহাকাশ অভিযানকে অনুমতি দিল?”

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হাবভাবে বুঝলাম, একজন প্লটারের এই ধরনের প্রশ্ন করার অধিকার নেইুএইধরনের প্রশ্ন শঙ্খলাভঙ্গের সমান। কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখ দেখে মনে হল, হয় তিনি আমার কথা শোনেননি, অথবা এই শৃঙ্খলাভঙ্গকে তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি। বললেন, “আমি পরিচালন কাউন্সিলের অষ্টম ব্যক্তি অষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি। বিজ্ঞান। চর্চা চলবে কি চলবে না, সে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী উনিই। আমাদের সভ্যতার মৃত্যু যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে সেকথা ওঁকে ভালো করেই বুঝিয়েছি। মৃত্যুর ফলে যা সামান্য জনসংখ্যা কমছে তা প্রায় কিছুই নয়। চল্লিশ বছর আয়ু। কিন্তু ধ্বংসের আসল কারণ, সবকিছুই উদাসীনভাবে নেয়া। আমি ওকে বলেছিলাম মৃত্যুর ভয়ে কুঁকড়ে থাকার ভাবটাকে কি ছুঁড়ে ফেলা যায় না? এখনও তো অন্য মনের কয়েকজন আছে। তাদের নিয়ে অন্য গ্রহের খোঁজ কি করা যায় না? জানেন কি, আমাদের শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদেরই মতো একটি গ্রহের খোঁজ

পেয়েছেন, আর আমাদের মহাকাশচারীরা এই গ্রহের সন্ধানে যাবার জন্য প্রস্তুত?

" 'আমাদের মহাকাশচারীরা সত্যি টিকে আছে নাকি?' অবাক হয়ে উনি জানতে চেয়েছিলেন।

"আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'প্রজন্মের পর প্রজন্মের ধরে কয়েকজন নিঃশব্দে তাঁদের জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে এসেছে। এইরকম জ্ঞানধারী প্রায় তিরিশ জন আমরা টিকে আছি। এখনও আমরা একটা লড়াই দিতে পারি।"

আমার মনে হচ্ছিল ক্যাপ্টেন নয়, আমিই যেন এক কাউন্সিল মেম্বারের সঙ্গে তর্ক করে যাচ্ছি। খানিক মুচকি হেসে বলেছিলাম, "ওঁকে বোঝাতে পেরেছিলেন?"

"না। ওঁর ফ্যাকাশে চোখ সে কথাই বলে দিচ্ছিল। উৎসাহ হারানো একটি লোক। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওঁর মনোভাব। তবে আমাদের মতো কয়েকজন বিদ্রোহী বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিকে ঝেড়ে ফেলার এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাননি ধুরন্ধর লোকটা। বেশ বুঝেছিলেন, ওঁর অসম্মতি আমাদের মতো মনস্ক লোকের সংখ্যা আরও খানিক বাড়িয়ে দিতে পারে। বাড়িয়ে দিতে পারে জেদ। কিন্তু সম্মতি দিলে এই সংখ্যাটা বাড়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মহাকাশযান যদিও-বা ওড়ে, তা উনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত ফিরে আসবে না। আর যদিও-বা আসে, তখন দেখা যাবে..."

কাউন্সিলের এই অষ্টম ব্যক্তিটি ছিলেন আমারই বাবার ছাত্র। আর এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এটা ভালোই জানতেন। উনি বললেন, "অষ্টা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। না না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। উড়ান হবেই। প্রয়োজন হলে তুমি আমার কাছ থেকে যা জেনেছ তা বলতে পারো।"

...চোখের সামনে ঘন কুয়াশাটা আবার নেমে আসছে। আজকাল আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমার দরজার সামনে অজস্র শুকনো পাতা ঝরে পড়ে কার্পেট বানিয়ে রেখেছে। লম্বা, চৌকোনা বিভিন্ন আকৃতির শুকনো পাতাগুলো হাওয়ায় ভেসে যেন পেন্সিলের ডগার এক-একটা চলমান রেখা হয়ে ছুটে যাচ্ছে একপ্রান্ত

থেকে আরেক প্রান্তে। একটা বিরক্তিকর গলায় কারো ঘোষণা শুনতে পেলাম, "অষ্টার সঙ্গে এখনই দেখা করো প্লটার।"

অষ্টার গলার স্বর শুনতে পেলাম। বহুবার শোনা সেই কণ্ঠস্বর। অষ্টাকে দেখতে কিন্তু আমার থেকে বেশি বয়স্ক লাগে না।

"আমার আর একবছর বাঁচার বাকি।" সে বলে উঠল, "সিগন্যাল পেতে শুরু করেছি।"

"কী সিগন্যাল?"

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়! সিক্সথ সেন্স প্রবলভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। বেশ বুঝতে পারছি। আমার মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালক ধমনীগুলো সরু হয়ে রক্তচাপ বেড়ে চলেছে। না, সাধারণ কোনো রক্তচাপ নয়, আরও কিছু ঘটছে। আমার চিন্তাগুলো আরও দ্রুত ও পরিষ্কার হচ্ছে। সুস্পষ্ট হচ্ছে অনেক কিছুই। আমার সিদ্ধান্তগুলো আরও ধারালো হচ্ছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত ঘণ্টা বাজবে। কয়েক ঘণ্টা ধরে সবকিছু দ্রুত চরমে উঠবে, তারপর সব শেষ..."

"জানি, আমার বাবার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।" আমি সরাসরি বললাম। ওঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয় না। যদিও ওঁর হতাশ মনোভাবের জন্য আমরা কোনোদিনই বন্ধুর মতো মিশতে পারিনি।

"তুমি জানো তোমায় কেন ডেকেছি?"

"না।"

"তোমাকে এই কথা বলার জন্য ডেকেছি যে, তুমি আমার আগে মরবে।"

"আপনি সম্ভবত' শব্দটা যোগ করতে ভুলে গেছেন।"

"না, আমি 'নিশ্চিত' শব্দটা যোগ করতে ভুলে গিয়েছি।"

আমি চুপ করে রইলাম। না, ভয় পেয়ে বা সম্মান দেখাতে নয়। জানতাম তিনি যা বলছেন তার ব্যাখ্যাও দেবেন।

"জানো তো, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগে।"

উনি এমনভাবে বললেন যাতে মনে হল, এটাই হবার ছিল আর ঠিক তাই

হয়েছে। নির্লিপ্ততা ওঁর প্রতিটি কথায় প্রকাশ পাচ্ছিল।

"মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে। যদি টিকে থাকো, তোমাকে নিজের মহাকাশযান নিজে বানিয়ে নিজেকেই গতিপথ হিসেব করে একাকী ফিরে আসতে হবে।"

"আমি হিসেব কষে রেখেছি।"

"আমি জানি না তোমার হিসেব কতটা ঠিক, যদিও তুমি একজন গণিতজ্ঞ। একদম বাপ কা বেটা।"

"আপনিও তো ঠিক তাই।"

"হ্যাঁ, আমিও তোমার বাবার যোগ্য শিষ্য ছিলাম, কিন্তু সব ভুলে গিয়েছি।"

"আপনি কি খুশি?"

"কী আসে যায়! প্রায় সব যন্ত্রগণক ভেঙে ফেলা হয়েছে। কে আর তোমার হিসেব ঠিক কি না যাচাই করবে? কার বা আগ্রহ আছে জটিল সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে চর্চার? সংখ্যা নিয়ে চর্চার উৎসাহ আছে শুধু গাণিতিক খেলায় উৎসাহী কিছু পাগল আর নয়তো তোমার মতো কিছু ক্ষ্যাপার মধ্যে। ভাগ্যক্রমে এদের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে।"

"ভাগ্যক্রমে? সেই জন্যেই কী আপনি মহাকাশযাত্রার অনুমতি দিয়েছেন?"

"একদম ঠিক। তোমার সহযোদ্ধা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঠিকই বুঝছিলেন। তবে আমি তোমার জন্যই অনুমতি দিয়েছি। আমি জানতাম ছায়াপথে ঘুরতে ঘুরতে তুমি একদম চিন্তার শীর্ষে উঠে যাবে। যে ভাবনার ঊর্ধ্বে আর কারো পক্ষে ওঠা মুশকিল।"

"ধন্যবাদ অষ্টা।"

"এগিয়ে যাও, আশা করি আমি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি।"

না, অষ্টার ভুল হয়েছিল। অবশ্যই ভুল হয়েছিল। আমি আমার জ্ঞানের শিখর ছুঁয়েছিলাম ছায়াপথের কোথাও নয়। মহাকাশে পৃথিবীর পথে উড়তে উড়তেও নয়। সে শিখরে পৌঁছেছিলাম অনেক অনেক পরে নোভোসিবিরস্কে শহরের কাছে আকাডেমগোরোদকের এক তুষারস্নাত কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আমার জানালা খোলা

ঘরে।

আমি মাঝে মাঝেই আমার মৃত্যুমুখী গ্রহের কথা ভাবি। একটা এত উন্নত সভ্যতা নষ্ট হল কী করে? আমার গ্রহের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান আমার এত কম যে, এর উত্তর খুঁজে পাইনি। আর জানলেই বা কী করতে পারতাম? আমি নিজের জীবনের কথাই খুব সামান্য জানি।

পৃথিবীতে আসার পর আমি সবকিছু বুঝতে শিখেছি। শক্লোভস্কি, ব্রেসওয়েল এবং ভন হর্নারের রচনায় আমি উৎসাহিত হয়েছি। জেনেছি মহাবিশ্বে সম্ভাব্য সভ্যতার মৃত্যুর কারণ। মানসিক আর শারীরিক অবক্ষয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি অনীহা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে উন্নত গ্রহের বাসিন্দাদের। অষ্টার কথা ধরলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি বিতৃষ্ণাই আমার গ্রহের সভ্যতার মৃত্যুর কারণ।

আমি চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচব কি? ওটাই তো আমার মাতৃ-গ্রহের গড় আয়ু? সম্ভবত বাঁচব, কারণ পৃথিবীর জীবমণ্ডলের অদ্ভুত বাতাবরণই আমাকে টিকিয়ে রাখবে।

কোনো সন্দেহ নেই আমার দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেঁচে থাকার তাগিদেই একই চরিত্রের গ্রহের সন্ধানে ছিলেন। তবে আমি আমার গ্রহে আমাদের গড় আয়ুর থেকে অনেক কম সময়ই ছিলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়েছিল আমাদের গ্রহে যে বয়সে এটা অনুভূত হয় তার এক দশকেরও বেশি পরে।

“আপনার রক্তচাপ কিন্তু অনেক বেশি।” লন্ডন থেকে ফিরে নিয়মমাফিক শারীরিক পরীক্ষার পর বলেছিলেন আমার ডাক্তার। “আপনার হার্টও খানিক টলমল করছে। কিছু একটা করতে হবে মনে হচ্ছে। আপনার কি খানিক অস্বস্তি লাগছে?”

“অদ্ভুত অনুভূতি ডাক্তার।”

“অদ্ভুত, মানে কীরকম?”

“আমি আমার আমার প্রতিটি রক্তবাহী ধমনীকে অনুভব করতে পারছি। বুঝতে পারছি রক্তের চলাচল।”

“শিরা আঙুলের ডগা দিয়ে চেপে ধরে তো?”

"না, মাথায়।"

"মানে একটা চেপে ধরা অনুভূতি?"

"না। মনে হচ্ছে যেন রক্ত আমার ব্রেনে অনেক অনেক শক্তি জুগিয়ে চলেছে। আমার চিন্তাগুলো যেন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে... কী করে বোঝাব? অনেক অনেক যুক্তি তথ্য আমার মাথায় ভিড় করে আসছে। কোনো ভাষাতে আমি আপনাকে এর ব্যাখ্যা দিতে পারব না। কিন্তু এটা বলতে পারি আমি অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে পারছি, কাজ করতে পারছি অনেক বেশি।"

"তাহলে তো ভালোই বলতে হয়।"

"জানি না।" আমি বললাম। "ঠিক যে কী ঘটছে আমি তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।"

"আমরা একটি এনসেফালোগ্রাম করব।"

আমি আর ডাক্তারের কাছে ফিরে যাইনি, কারণ আমি জানতাম আমার মধ্যে ঠিক কী ঘটছে। অনেক আগে অষ্টা আমাকে বলেছিল, একেই বলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। চিন্তাশক্তির সুতীব্র বৃদ্ধি। যখন শেষ ঘনিয়ে আসে তখন এটা হয়। তার মানে আমাকে এই অবস্থার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আমাকে এই গ্রহের ঋণ চুকিয়ে যেতে হবে। এই গ্রহ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, দ্বিতীয় জীবনে শিখিয়েছে আমাকে অনেক কিছু।

প্লটারের চিন্তাগুলো প্রফেসর মার্লের মস্তিষ্কে আরও ঘন ঘন ধাক্কা মারছিল। সম্প্রতি এক সম্মেলনে বক্ত...তা দিতে গিয়ে হঠাৎ সব ভুলে উত্তেজিত হয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে ছুটে গিয়ে সব জটিল অঙ্ক কষতে শুরু করেছিলাম। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সবাই। কেউ কোনো কথা বলেনি। শুধু একজন বলে উঠেছিলেন, "আমরা কিছু বুঝতে পারছি না প্রফেসর মার্লে।"

"সব ভুলে যান। আমি এখন কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না।" আমি তখন প্লটারের মানসিক রাজ্যে বিচরণ করছিলাম।

"না!" লাফিয়ে উঠেছিল জেদি ভলোকভ। "আমরা সব লিখে রাখছি, আপনি

পরে ব্যাখ্যা দেবেন। শুধু বলুন ওই চিহ্নটা কী?" একটা ব্যাসচিহ্নিত বৃত্তকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিল।

আমার মধ্যে দিয়ে প্লাটার উত্তর দিয়েছিল, "এটা মহাশূন্যের স্থানাঙ্কের স্বতন্ত্র চরিত্রের প্রতীক। অসীম মহাশূন্যে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন আমাদের চেনা ধারণা দিয়ে বিচার করা যায় না।"

আমার তখন কিছু ব্যাখ্যা করার সময় ছিল না। শুধু চাইছিলাম প্লাটারের সব জ্ঞান নিংড়ে বের করে নিয়ে আসতে। টের পেয়েছিলাম আমার সামনে বাকি শুধু একটা হিমশীতল দিন ও রাত। জানতাম পরদিন সকালে সব শেষ হয়ে যাবে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, আলো জ্বালাবার পালা। আমি টেবিলের সামনে বসে উন্মাদের মতো কাজ শুরু করলাম। টেলিফোন, দরজায় খটখটানি কোনো কিছুতেই সাড়া দেইনি।

খোলা জানালা দিয়ে গোধূলির আলোয় হাওয়ায় ভেসে বরফের কুচি ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরে। আনোদান থেকে আলো ছড়িয়ে ছিল শুধু আমার নোটবুকের ওপর।

এই প্রথম মার্লে পৃথিবীকে শোনাতে চলেছেন এক আজগুবি গল্প। এটাই তাঁর শেষ রাত। তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো পৌঁছে গেছে শেষ পর্যায়ে। সুদূর ছায়াপথের এক অজ্ঞাত প্লাটার পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রকাশ করতে চলেছেন গণিতের অনেক গোপন বিষয়, যা তিনি তাঁর বাবার কাছে শিখেছিলেন আর জেনেছিলেন গোলাকৃতি এক স্ফটিকের তথ্য ভাণ্ডার থেকে, যা পৃথিবীর সমগোত্রীয় এক বহুদূরের মৃতপ্রায় গ্রহে নষ্ট হয়ে গেছে।

কাল সকালে সব শেষ হতে চলেছে। ভালো লাগবে যদি সব শেষ হয়, গ্রামের কাছের কোনো স্কিইংয়ের ঢালে। লোকে বলে গণিতজ্ঞ গাললাইসেরও এরকম দশা হয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন পৃথিবীর সন্তান। যাই হোক, কাল কী হবে নিশ্চিত করে বলা যায় না।

প্রফেসর ভলোকভের পোস্টস্ক্রিপ্টাম

আমি ওঁর প্রাক্তন স্নাতক ছাত্র ভলোকভের চোখ দিয়ে ভূমিকাটি লিখলাম।

প্রফেসর মার্লের নোটবই যদি কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহলে লোকে এভাবেই পড়বে। কিন্তু প্রফেসর মার্লের পোস্টস্ক্রিপ্টাম বা লেখার শেষে দেওয়া ফুটনোট কখনোই ছাপা হবে না।

প্রফেসর মার্লের এই গণনাগুলো নিয়ে একাডেমি অফ সায়েন্সে আমার অনেক ঘষারাঘুরির পর এগুলো নিয়ে গবেষণার জন্য গণিতের একটি নতুন শাখা খোলা হয়। কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ মার্লের ডায়েরি পড়ার সুযোগ পায়নি। এমনকি ইনা, যার সঙ্গে

পরে আমার বিয়ে হয়েছে, সেও নয়।

কেন? কারণ, আমি পৃথিবীকে তাঁর পুত্রকে নিয়ে গর্ব করা থেকে বঞ্চিত করতে চাইনি। প্রফেসর মার্লে, অবশ্যই নামগোত্রহীন প্লটার নন, পৃথিবীরই সন্তান, মৃত্যুর পর তাঁর জ্ঞান সঁপে দিয়ে গেছেন গোটা বিশ্বকে, বিশেষ করে রাশিয়ার বিজ্ঞান শাখাকে। আমি রাশিয়ান ভাষায় লেখা তাঁর নোটবুক বার বার পড়ে এই বিষয়ে আরও নিশ্চিত হয়েছি। নিশ্চিত হয়েছি তাঁর সমস্ত চিন্তা রাশিয়ান ভাষাতেই ছিল, কখনোই তিনি তাঁর প্রাচীন গ্রহের ভাষা শেখার বা মনে করার চেষ্টা করেননি। ওই গ্রহ তাঁর কাছে ভিনগ্রহই ছিল।

একবার মার্লের নোটবুকগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু যেন আমার হাত চেপে ধরেছিল। সম্ভবত এই রহস্য পৃথিবীর সামনে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা না আসার দ্বিধাগ্রস্ততা আমাকে বাধা দিয়েছিল।

না, এই রহস্যের দায় আর একা কাঁধে বইতে পারছি না। আমার স্ত্রী ইনা প্রফেসর মার্লেকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনত, সে নিজেও একজন বিজ্ঞানের কৃতী সৈনিক, আমাদের বড়ো হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরাও এক-একজন বিজ্ঞান সাধক, তারাই ঠিক করুক প্রোফেসার মার্লে পৃথিবীর সন্তান ছিলেন না পৃথিবীর অতিথি...

যাচ্ছ কোথায় পিঁপড়েরা

টিউলিপের বুকে শিশির জমেছিল। লার্কা একটা টিউলিপ নিয়ে তার মধ্যে জমে থাকা শিশিরটাকে জিভের আগায় নাচাতে নাচাতে বলল, “জানো তো, আগে কিন্তু টিউলিপ ফুটত মে মাসে, এখনকার মতো জুলাইতে নয়!” তারপরে বলল, “আরে! দেখো দেখো, একটা ছোট্ট জলের স্রোত এদিকে নেমে আসছে না? মনে হচ্ছে বুঝি আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই আসছে!”

পাহাড়ের যে খাড়াই দেওয়ালের কোলে আমরা ছিলাম, তার গায়ের ফাটলগুলোর মধ্যে থেকে জলের ধারা বেরিয়ে আসছিল। সূর্য এখন মাথার উপর। ফাটলের খাঁজে জমাট বরফ এখন সূর্যের তাপে গলে গিয়েই ছোটো ছোটো জলের ধারা তৈরি করেছে।

তারই মধ্যে একটা শীর্ণ, লাজুক ধারা কাঁপতে কাঁপতে আগের বছরের ঘাসের ঝোঁপের পাশ কাটিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে টিউলিপের গোড়ায় একটা গর্ত পেয়ে থমকে গেল। থমকে গেল, কিন্তু থেমে গেল না। খানিকক্ষণ দাঁড়াল বোধ হয় শক্তি সঞ্চয় করার জন্য। তারপরে সোজা আমাদের পেরিয়ে চলে গেল নাচতে নাচতে।

পিঁপড়েদের একটা দল সরু রেখা বরাবর চলছিল। জলের এই চলমান ধারা সেটা খেয়াল না করেই এগিয়ে গেল। কাজেই পিঁপড়েদের একটু ঝামেলাই হল, কারণ দলের বেশ কিছু সদস্য ওপারে রয়ে গেছে। আর ওদের বাসা এপারে একটা গাছের গুঁড়িতে।

পিঁপড়েদের বাসা যেদিকে, লার্কা আর আমি সেদিকেই ছিলাম, আর আন্দ্রোজিন ওপারে।

“টিউলিপ কেন জুলাইতে ফুটত বলো তো! জানো কেউ?” লার্কা মিষ্টি হাসল।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। দেখছিলাম ওই পিঁপড়ের দলটাকে। পিঁপড়ের

সারিটা এখন ভেঙে গেছে। ওরা যেন কারো নির্দেশমতো জলের ধারা বরাবর রওনা হল, কিন্তু দল বেঁধে নয়, একা একা। বোঝাই যাচ্ছিল, স্রোতটা পেরোনোর মতো কোনো জায়গা খুঁজছে ওরা।

"তবে তুমিও সবটা ঠিক জানো না। অনেক অনেকদিন আগে তোমার ওই টিউলিপ ফুটত ডিসেম্বরে।" আন্দ্রোজিন বলল, "তাছাড়া সে কি এরকম এক পাপড়ির! মোটেই না! দু-সারি পাপড়ি ছিল! আর শুধুই কি তাই? ম্যামথদের প্রিয় খাদ্যই ছিল ওটা! আন্দ্রোজিন তার পিঠের রুকস্যাকটা মাটিতে নামিয়ে রেখে তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথা থেকে একটা বুনো রসুনের ডাঁটা জুটিয়েছিল, সেটা চিবোতে চিবোতে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "হুমম, তারপর যা বলছিলাম, অন্য গ্রহের প্রাণীরা এল। এই আমাদেরই মতন খানিকটা, তবে ওদের মস্ত বড়ো দুটো গঁড় ছিল শিরদাঁড়া বরাবর, বুঝলে ডার্লিং! সে যে কী বিশাল, ভাবতেও পারবে না! তার এক-একটাই একটা মহাদেশের সমান! এই যেমন ধরো, দক্ষিণ আমেরিকা।" কেন কে জানে ও আমার দিকে চকিতে একবার তাকাল। তারপর আবার আগের কথায় ফিরে এল, "ওরা পৃথিবীটাকে বেড় দিয়ে ধরে এমন মোচড় দিল যে, সে-বেচারা একদিকে হেলে ওইভাবেই ঘুরতে লাগল। ব্যস! পৃথিবীর আবহাওয়াটাও গেল পালটে, আর টিউলিপেরাও ঠিক করল তারা এবার থেকে জুলাইতেই ফুটবে-একেবারে তোমার জন্মদিনের সময়টাতে। ম্যামথগুলো সেই দুঃখে মরেই গেল। আমি মোটেই বানিয়ে বানিয়ে বলছি না, এখনও কত ম্যামথের ফসিল পাওয়া যায় যাদের পেটে গোছা গোছা টিউলিপ।" আন্দ্রোজিনের ঘন পাতায় ঘেরা বড়ো বড়ো কালো চোখদুটো যেন ম্যামথদের দুঃখে কাতর।

লার্কা পাত্তা দিল না। বরং বলল, "তিম, তুমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবো, তাই না? মজা করতে গিয়ে এই যে কথাগুলো বললে সেটা বেশ বোকা বোকা বুঝতে পারোনি, বলো! মন দিয়ে শোনো, 'টিউল-ইপ জুল-আই টিউল-জুল টিউল-জুল! কত মিল! ঠিক বুলবুলির ডাকের মতো টিউল-জুল! টিউল-জুল!" লার্কা ঘাড়টা বেঁকিয়ে তাকাল। তারপর বড়ো করে দম নিল, "নিজের ভাষার যে মিষ্টত্ব, তার স্বাদ

নেওয়ার জন্যে আমার মতো ভাষাবিদ হওয়ার তো দরকার নেই। হতে পারে তুমি কেমিস্ট্রিতে পি.এইচ.ডি, পিটের স্বাভাবিক দাহ্যতার বিষয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তোমার ভালো কাজ আছে। কিন্তু নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেকের থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। বুঝলে মশাই!" ওর হাতের ফুলটা দিয়ে তিমের নাকে টুকটুক করে ক' বার ঠুকে দিল। শেষের বার অবশ্য তিম খপ করে টিউলিপের পাপড়ি মুখে পুরে দিল, তারপর থু থু করে সেগুলো পিঁপড়ের ঢিবির দিকে ছিটিয়ে দিল।

আলটপকা মন্তব্যে তিমের জুড়ি নেই। লার্কার দিকে তাকিয়ে ফস করে বলে বসল, "কিন্তু একটা ব্যাপারে বিজ্ঞান তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবে না।"

লার্কা ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিমের দিকে তাকাল। "মানে?"

"মানে এই যে তুমি তোমার বিয়ের আগের পদবিটা এখনো রেখে দিয়েছ, কখনোই আমার এত সুন্দর আন্দ্রোজিন পদবিটা নামের সঙ্গে লাগালে না।"

আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম, এই বুঝি লাগল দু' জনে! অবশ্য লার্কা সেদিকে গেলই না, হেসে বলল, "তাই! আমার তো মনে হয় তোমার ওই পদবির ভার বুঝি আমার সইবে না! ওটা তোমাদের পরিবারের সম্পত্তিই থাকুক না হয়! কিন্তু তিম, তোমাদের এই পদবির উৎস কী বলো তো? 'আন্দো' কথাটা শ্লোভেনিয়ার প্রাচীন ভাষায় চলত, যার মানে, 'আকস্মিক'।"

যদিও আমার সন্দেহ, আন্দ্রোজিনের বংশলতিকার ব্যাপারে এই গবেষণা ওর নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত, ওই ঘাড়ে-গর্দানে ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু মজা করা আর কী! লার্কা যে কেন তিমের পদবি ব্যবহার করে না, সে বিষয়ে আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না।

জলের ধারাটা পিঁপড়েদের তুলনায় বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চওড়ায় আমাদের তিন চার কদমের মতো তো হবেই। জলের ঠিক পাশেই একটা মাটির ছোটো ঢিবির উপর পিঁপড়েরা জড়ো হয়েছে এবার। ওরা খুঁড়ে খুঁড় ঠেকিয়ে বোধ হয় নিজেদের মধ্যে কোনো খবর দেওয়া নেওয়া করছিল, কিংবা জাতভাইদের কিছু

সংকেত পাঠাচ্ছিল। শুনেছি মৌমাছিদের মতো এরাও বাঁচার পথ খুঁজে না পেলে সবাই মিলে মরণকে বরণ করে নেয়।

আন্দ্রোজিন বলল, "ছাড়ো তো তোমার ওই শব্দতত্ত্বের কচকচি আর যত্তসব আদ্দিকেলে ধ্যানধারণা! এই তুমিই না বলেছিলে সোনা, পশুপাখির আচরণ থেকে সেকালের লোকজন ভবিষ্যতের আন্দাজ পেত?"

"পশুপাখির আচরণ, বিদ্যুতের ঝলক, নদীর কলতান, ধূমকেতুর যাওয়া-আসা, সব কিছুর থেকে।" লার্কা হাসল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, এদের মনের কথা থেকে ভবিষ্যৎ পরে দেখো, এখন তোমার ওই বাল্য বন্ধুটির পদবির অর্থ বলো দেখি!"

লার্কার আঙুলগুলো জলের মধ্যে খেলা করছিল। আন্দ্রোজিনের কথা শেষ হতে ভিজে আঙুলগুলো নিয়ে নিজের কপালে বুলোল, তারপর বলল, "এ আর এমন কী! 'তালানভ' শব্দটা 'তালান' থেকে এসেছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তালান মানে অনেক কিছু হতে পারে। প্রতিভা, সাফল্য, সৌভাগ্য..."।

"তা তো বটেই। এই যে তালানভ, তুমি তো ভাগ্যবান লোক হে! একেবারে ভাগ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছ! সাফল্যের জিন তোমার মধ্যে একেবারে সেঁধিয়ে বসে আছে।"

মনে হল আন্দ্রোজিন ভিতরে ভিতরে বেশ রেগেছে।

আমি একথার কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না।

শীতকালে বরফ জমে ছিল এসব জায়গায়। এখন বরফের চাদর সরে গিয়ে আবার ঘাস আর ছোটো ছোটো গাছপালা বেরিয়ে এসেছে। এদের দেখলে মনে হয় না যে এরা এতদিন চাপা পড়েছিল বরফের নীচে। রীতিমতন সতেজ। আমি লম্বা দেখে ঘাসের একটা ফলা ছিঁড়ে নিলাম। দেখি, পিঁপড়ের দলের কোনো উপকারে লাগতে পারি কি না।

আন্দ্রোজিনের কথার উত্তর লার্কাই দিল। আমাকে দেখিয়ে বলল, "তিমচিক, কথাটা তুমি একদম ঠিক বলেছ। ভাগ্য ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। জীবনে সফল বলতে

আমার তো ওর নামই প্রথম মাথায় আসে। আর ওর সবচেয়ে ভালো লাগে কী জানো? জল, মাটি, হাওয়া, পাহাড়, নদী, ঝরনা... এমনকি পোকামাকড়, পিঁপড়ে এ সবকিছুর উপর ওর ভালোবাসা। এই তো দেখো না, তিন-চার বছরে একবার হলেও ও ঠিক আমাদের সেই ছোটবেলার জায়গায় ঘুরে আসবেই, সবসময় বেশিদিন থাকতে পারে না কিন্তু চেষ্টা করে।"

"তোমার মতো একজন বন্ধু থাকলে তার সুখের কি আর কমতি থাকে? তোমার কথায় এখানে এসে বেচারা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কী হে তালানভ, বলো সেটা!"

আমি আর কী উত্তর দেব একথার? ওদের এই খুনশুটি লেগেই থাকে।

আন্দ্রোজিনের কথা তখনো শেষ হয়নি। বলল, "একটা লজঝড়ে বাসে নাচতে নাচতে চিলিক, তারপর সেখান থেকে লরির পিছনে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আসা... ভাবছিলাম দেহের হাড় ক' খানা বুঝি-বা আস্ত থাকবে না। আর লরির থেকে নামার পর এই একমনি বোঝা পিঠে নিয়ে হাঁটা! আহা! কী মধুর যাত্রাপথ! এই না হলে সুখ!"

এর পরে চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। লার্কার কথা বলার আদল নকল করে আন্দ্রোজিন তাই বলল, "না বাবা, চুপ থাকাই ভালো, আমি আর কথা বলব না!"

"ইউরোপের একজন সেরা রেসারকে নিয়ে তোমার এইসব খেলো ইয়ার্কি শোভা পায় না তিম।" লার্কা ঘাসের একটা গোছা নিয়ে আনমনে খেলছিল। বলল, "ওকে গত শীতে দেখেছিলাম, কার রেসিংয়ের উপর কী একটা ফিল্মের শুটিং হচ্ছিল। মেক্সিকোতে... না না, বোধ হয় কলম্বিয়া... ঠিক মনে পড়ছে না। এই জায়গাগুলো আমি না, বড্ড গুলিয়ে ফেলি। উহ! ঘটনাটা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়! একটা বাঁকের মুখে এসে ওর গাড়িটা তিন-তিনবার ডিগবাজি খেল, ঠিক একটা ডলফিনের মতো। তারপরেই ঝাঁপ দিল কোন অতলে সেটা দেখতে পেলাম না। ধুলোবালির একটা ঝড় উঠল। ভাবলাম, গাড়িটা বুঝি চুরমার হয়ে গেল। ভয়ে

চোখ বুজলাম। ওমা! একটু বাদে চোখ খুলে দেখি তিনি ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে নামছেন! দেখে মনে হল, গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। হাতে একটা হারপুনের মতো কিছু একটা যন্ত্র আর একটা তির। তিরের সঙ্গে আবার একটা লম্বা দড়ি আটকানো। তিরটা সাঁ করে ছুঁড়ে দিল সামনের পাহাড়ের দিকে, সেটা কোন পাথরের খাঁজে গিয়ে আটকে গেল। তারপর সেই দড়ি ধরে চোখের পলকে তরতর করে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল ও-ই উপরে। দুঃখ শুধু একটাই, ওর মুখটা দেখতে পাইনি। আর দেখবই বা কী করে? ওদের সবারই তো মুখ হেলমেটে ঢাকা ছিল! একেবারে মহাকাশচারীদের মতো।"

লার্কা থামলে পরে আমি ওর ভুলগুলো ধরিয়ে দিলাম। বললাম, "তথ্যে কিঞ্চিৎ ভুল আছে যে লার্কা! প্রথমত, আমি দু-বার ডিগবাজি দিয়েছিলাম। তিনবার নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো অতল খাদে ঝাঁপ দিইনি, পাশের একটা নাবাল জমিতে নেমে গিয়েছিলাম। আর জায়গাটা মেক্সিকোও নয়, কলম্বিয়াও নয়, ওটা ছিল পেরু। সেই ইনকা সভ্যতার পেরু। শোনা যায়, ওরা নাকি লোকজনকে সম্মোহিত করে ভবিষ্যৎ জানতে পারত।"

তা না হয় জানুক, কিন্তু এই পিঁপড়েগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে? আমি কি পারব এই ঘাসের ফলা দিয়ে ওদের এই বিশাল জলধি পেরোনোর সেতু বানিয়ে দিতে? শুনেছি, পিঁপড়েরা নাকি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।

ঘাসের ফলাটা এমনভাবে জলের উপর রাখলাম, পিঁপড়েগুলো সহজেই যাতে ওর উপর দিয়ে এপারে চলে আসতে পারে। চরম হতাশার মধ্যে এত সুন্দর একটা আলোর রেখা দেখে পিঁপড়েদের কীরকম আনন্দ হতে পারে তাই কল্পনা করছিলাম।

কিন্তু সেরকম কিছু হল না। ওরা এদিকে এলই না।

"এই যে ভাগ্যবান!"

পিঁপড়ের দলকে নিয়ে আমি একেবারে আত্মমগ্ন ছিলাম, তাই আন্দ্রোজিনের কথা শুনে একটু চমকে তাকালাম ওর দিকে।

এক-একটা বাচ্চা আছে না, একবার যেটা মাথায় ঢুকবে সেটা নিয়েই ঘ্যানঘ্যান

করতে থাকবে! আন্দ্রোজিনের স্বভাবটা সেরকম। ও বলতেই লাগল, “পৃথিবীর বহু জায়গায় তো ঘোরা হল। নিউ ইয়র্ক, রিও-ডি-জেনেইরো, সিঙ্গাপুর, বাগদাদ, কলকাতা, জেরুজালেম কত শহর! তা সেসব জায়গার যত সুন্দরীদের দেখেছ, তাদের কারো কারো সঙ্গে একটু আধটু হেঁ হেঁ হেঁ...”

আন্দ্রোজিন তার পুরুষ্টু গোঁফজোড়ায় চাড়া দিয়ে এমন একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল যে আমার পিত্তি জ্বলে গেল।

ওর বক্তব্য অবশ্য তখনো শেষ হয়নি। “ভাগ্যটা তোমার সত্যিই ভালো হে! দেশবিদেশের কত ভালো ভালো জিনিস তোমার ভাঁড়ারে বলো ঠিক কি না? আর টাকা! তোমাদের টাকার থলের পেট তো সবসময় মোটাই থাকে। হুঁ হুঁ বাবা! আমাকে বোকা বোঝাতে এসো না! বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আর ঘরে বসে তুমি ঝনঝন করে টাকা গুনছ। উহ! ভাবলেই রোমাঞ্চ হয়!”

ঝনঝন সত্যিই হচ্ছিল, তবে তা আমার টাকার থলেতে নয়, আমার মাথার ভিতর। উহ! লার্কা একে সহ্য করে কী করে? আমার কাজটা যে কতটা ঝুঁকির, সেটা বোঝার ক্ষমতা এই মহাশয়ের অন্তত নেই। অসহ্য লাগছিল লোকটাকে। ও কী করে জানবে, রাতের পর রাত ঘুমোতে পারি না, পিঠের ফিক ব্যথার জন্যে। বিশেষ করে ওর ওই ‘রোমাঞ্চকর বর্ষার রাতে ব্যথাটা বার বার মনে করায় শিরদাঁড়ার পুরোনো চোটের কথা।

একটা দুর্ঘটনায় পাঁচ নম্বর ভার্টিব্রা ভেঙে গিয়েছিল। দুর্ঘটনা আমাদের জীবনসঙ্গী। এই তো, এবছরই হিমালয়ান কার র ্যালিতে চার-চারজনের গাড়ি ক্র্যাশ করেছিল। দ্য ব্রায়ান, ওমেগিও, তু হারা আর ভিক্টর গোলোসেয়েভের গাড়ি। কাকে বলব এসব কথা! এই লোকটাকে? লোকটার মুখ দেখলে মনে হয় গোটা শতাব্দীর সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ওর মুখে বাসা বেঁধেছে। তাকাতে ইচ্ছা করে না। নেহাত লার্কার স্বামী, না হলে...

রাগে গা রি রি করছিল। তবুও বললাম, “এক্কেবারে ঠিক বলেছ শ্রীযুক্ত তিমচিক আন্দ্রোজিন!” এত বছরের মধ্যে এই প্রথম একেবারে ওর পোশাকি নাম

ধরে কথা বললাম, “একটা আধটা নাকি? অনেক কিছু নিয়ে ফিরেছি। এই যেমন ধরো, পিঁপড়েদের উদ্ধার করার অভ্যাস।”

পিঁপড়ের দল এখনো ঘাসের ফলাটার উদ্দেশ্য ধরতে পারেনি, কাজেই ওরা এদিকে এলই না। ভাবলাম, একটা কাঠি দিয়ে ওদের ওই ঘাসের ফলার সেতুর পথটা দেখিয়ে দিই। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে সেই চেষ্টা করলাম। কিন্তু নাহ, এবারও কোনো ইতর বিশেষ হল না। বরং ওরা ভয় পেয়ে একটা মরা পাতার নীচে গিয়ে ঢুকল।

“পিঁপড়েরা নিজেদের তুলনায় বহুগুণ ভারী জিনিস বইতে পারে। কিন্তু তার মর্যাদা কেউ দেয়? মোটেই না।”

লার্কা ঠিক কী বলতে চাইল কে জানে?

যাই হোক, পিঁপড়েদের পার করার জন্যে কিছু একটা করতেই হবে।

আমার পকেটে একটা ছোটো ছুরি থাকেই। দেশলাই কাঠিটাকে ছুরি দিয়ে দু-ভাগ করলাম। তার একটা ভাগ দিয়ে একটা পিঁপড়েকে তুলে পিঁপড়েসুদ্ধ কাঠিটাকে ঘাসের গোড়ার দিকে রাখলাম আর অন্যটা দিয়ে ওকে ঠেলতে লাগলাম যাতে ও ঘাসের উপর দিয়ে এগোতে থাকে। কিন্তু ও কাঠিটা প্রাণপণে আঁকড়ে ঝুলতে লাগল। ওর ভয় কাটাতে হবে। আমি আস্তে আস্তে ওকে খোঁচাতে লাগলাম। ওইটুকু প্রাণীর কী জোর! ও আমাকে আপ্রাণ বাধা দিচ্ছিল, আঙুলে বেশ টের পাচ্ছিলাম সেটা।

যাক! শেষপর্যন্ত ও এগোনো শুরু করল। প্রথমদিকে খুব ধীরেসুস্থে, গুঁড়জোড়াকে এদিক ওদিক নাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগল। এতক্ষণ ও ছিল কাঠিটার নীচের দিকে, এবার সাহস সঞ্চয় করে ঘুরে গেল উপরদিকে, তারপর বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে এগোতে লাগল। এখন আর ও ভয় পাচ্ছে না তা ওর চলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নজরে এল, লার্কা খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কাজকর্ম দেখছে।

সূর্য এখন ঠিক মাথার উপরে। তার প্রখর তেজ টের পাচ্ছি বেশ। লার্কা বসে

ছিল আমার পাশে। প্রায় বছর চারেক বাদে ওকে এত কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলাম। অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর। চোখের কোলে, কপালে আবছা বলিরেখা দেখতে পাচ্ছি। আগে ওকে কোনোদিন জ প্লাক করতে দেখিনি। এখন প্লাক করা জর নীচে চোখদুটোকে সরু দেখাচ্ছে। ওর চেহারার সেই অমলিন সারল্য আর নেই। চোখে বিদ্যুৎ, গালে এক অদ্ভুত লালিমাএ লাকাকে আমি চিনি না।

হয়তো ঐ পেট মোটা, গাল ফোলা, কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো মোটা গোঁফওয়ালা বকচ্ছপ আন্দ্রোজিনের বোকা বোকা চুটকি আর মাথামুণ্ডুহীন কথায় ও আপ্লুত হওয়ার ভান করছে। লার্কার মতো মেয়ে! আন্দ্রোজিনের উপর হিংসে হওয়া কি খুবই অস্বাভাবিক?

'তবে তুমি কিনা কার রেসিংয়ে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন, ওই তিমচিক আন্দ্রোজিনকে হিংসে করা কি তোমায় সাজে!' খুব করে বোঝালাম নিজেকে। না, মাথা গরম করা মোটেই উচিত নয়।

লম্বা শ্বাস নিয়ে আমি আবার পিঁপড়েদের দিকে নজর দিলাম।

ন' টা পিঁপড়ে জলের ওপারে আটকা পড়েছিল, একে একে সব ক' জনই এপারে এসে পৌঁছেছে দেখছি। আচ্ছা, আবার যদি ওদের জলের ওপারে রেখে আসি ওরা কি পথ চিনে আসতে পারবে? দেখা যাক!

এই না ভেবে একটা পিঁপড়েকে ধরে ওইদিকের মাটির ঢিবিটার উপরে রেখে এলাম। পিঁপড়েটা কিন্তু সহজেই পথ চিনে কাঠিটার কাছে এসে প্রথমে শুড় বাড়িয়ে ওটা চুল, তারপর তরতরিয়ে কাঠি পেরিয়ে ঘাসের ফলার উপর দিয়ে দিব্যি চলে এল ওর দলের কাছে, একবারও থমকাল না কোথাও। দেখে আশ্চর্য লাগল। ওইটুকু একটা প্রাণী কত সহজে কায়দাটা শিখে নিল! ও সত্যি সত্যি শিখেছে, না ব্যাপারটা কাকতালীয়? আমি পরীক্ষা করার জন্য আরও দু'বার বেচারাকে ওইদিকে রেখে দিলাম। দু-বারই ও দৌড়ে চলে এল এদিকে! শুধু তাই নয়, এতটাই দৃঢ়তার সঙ্গে এদিকে এল যে দেখে মনে হল, সেতুটা ওর পরিকল্পনায়ই তৈরি হয়েছে।

"সেকালের গ্ল্যাডিয়েটরদের মতো তোমার মনে কোনো দয়ামায়া নেই

তালানভ।" আমার কাজকর্ম দেখতে দেখতে লার্কা হঠাৎ বলে উঠল, "পেট্রোল আর ইঞ্জিন এছাড়া তুমি আর কিছু বোঝ না। গাড়ি, পিঁপড়ে, মানুষ সব তোমার কাছে এক। সবই নিছক বস্তু। হুবহু একরকম, পরমাণুর অনুভূতিহীন কতগুলো কম্পন ছাড়া কিছু নয়।"

বললাম, "আমি মানুষ অবশ্যই ভালোবাসি, তবে..." লার্কা তেরছা চোখে আমার দিকে তাকাল। "তবে সত্যি বলতে কী, যারা খাড়া পাহাড়ের বিপজ্জনক কিনারা ধরে চলাচল করে তাদের উপর আমার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। জানোই তো ঝুঁকি নিতে আমি নিজেও পছন্দ করি, তাই আমার কাছে এসব লোকের মূল্য অন্যরকম।"

কথাটা মুখ থেকে বেরোনো মাত্রই বুঝতে পারলাম, ভুল হয়ে গেল। আসলে নিজের কানেই কথাটা কেমন অহংকারী ঠেকল। লার্কার মুখ দেখে বুঝলাম ও মনে মনে আহত হয়েছে।

"শ্রীমতীর এই 'পর্বত অভিযানু'এর আসল কারণটা তুমি আদৌ বোঝোনি হে তালানভ! উদ্দেশ্যটা খুব পরিষ্কার। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই টের পাবে।" তিমচিক আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল। আকাশের সীমা এখানে পাহাড়চূড়ায় গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে। একটা সাংঘাতিক কিছু আবিষ্কারের উত্তেজনায় তার গোঁফজোড়া কাঁপছিল তিরতির করে। বলল, "ও আমাদের দু' জনকে এই জাইলাস্কি আলাউ পাহাড়ের গোলকধাঁধায় টেনে এনেছে। কেন? দু' জনেই যাতে ধ্বসে চাপা পড়ি। এই আমি, লার্কার স্বামী, খুব ভালো করে জানি, আমাকে ও সহ্য করতে পারে না। আর তুমি তালানভ। ওর 'প্রাক্তন'। দেশবিদেশের কত ভালো ভালো মেয়ের পর কি আর ওকে মনে ধরে! তাই দু'জনের থেকেই মুক্তি পেতে চায় ও।"

আমি যে ভুলটা করেছিলাম, তাকে কাজে লাগাতে তিমচিক এক মুহূর্ত দেরি করল না। ওর সাধের পি.এইচ.ডি করতে গিয়ে সমস্ত শুভ বুদ্ধিশুদ্ধিগুলোকে সিন্দুকে বন্দি করে ফেলেছে তিমচিক। অথচ ছোকরা মন্দ নয়। কিন্তু ওর পক্ষে রেসিং ড্রাইভার হওয়া সম্ভব নয়।

লার্কার চোখেমুখে ভাবান্তর দেখলাম না। বরং সে শান্ত স্বরে বলল, "ঠিক বলেছ তিমচিক, তোমাদের অন্তত একজনের অবশ্যই ধ্বসে আটকে পড়া উচিত। একটা নতুন অভিজ্ঞতা বৈ তো নয়! কিন্তু কী জানো? সেরকম কিছু ঘটবে না। আমার কথা না-ই মানতে পারো, কিন্তু আমি জানি, তোমাদের যে জায়গাটা দেখাতে চাই, কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই সেটা হয়ে যাবে। পথ অনেকটাই, তবে সূর্যাস্তের আগে ঠিক পৌঁছে যাব। এখন এইবেলা অবশ্য হাঁটা শুরু না করলে মুশকিল হবে। চলো, চলো, এগোই।"

আন্দ্রোজিন এত সহজে প্রসঙ্গ ছেড়ে নড়ার লোক নয়। সে গদগদ স্বরে বলল, "কিন্তু সুন্দরী, একটা কথা তোমার ওই রেসিং বীরকে জিজ্ঞেস করো তো, ওই যারা খাড়া পাহাড়ে চড়তে যায় বা বিপজ্জনক পথ বেয়ে গাড়ি নিয়ে ওঠে তাদের প্রতি ওর এত ভক্তি কীসে?"

যদিও সে অত্যন্ত মিষ্টি স্বরে বলল, কিন্তু চলার পথে এমন বাক্য বিনিময় কাম্য নয়। কিন্তু ওর কথায় আমার অন্তরের পবিত্র ভাবনাগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে এল। বললাম, "আন্দিজ পর্বতের একটু উপরের দিকে, যেখানে মোটামুটি তুষার রাজত্ব শুরু হয়, শুনেছি সেখানে একরকম ফুল পাওয়া যায়। ওখানকার স্থানীয় লোকজন গ্রেভারস,

গ্রেভাইরস, এরকম কছু একটা নামে ডাকে ওই ফুলটাকে। আমি দেখিনি, তবে যা বর্ণনা শুনেছি তাতে মনে হয় সেটা দেখতে পপির মতো, তবে আকারে বড়ো।" আগের প্রসঙ্গের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য না থাকলেও আমার কথা ওরা শুনছিল। মনের মধ্যে বিক্ষোভ চললে আমার গলার স্বরে সেটা বোঝা যায়। বললাম, "এর নির্যাস দিয়ে বানানো শরবত খেলে নাকি লোকজন খানিকক্ষণের জন্যে উন্মাদ হয়ে যায়। পুরোহিতেরা বছরের পর বছর, হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ওই গ্রেভাইরস খেয়ে রাতের অন্ধকারে বিপজ্জনক পাহাড়ের খাড়াই রিজগুলো অক্লেশে পার হত গোষ্ঠীর বাকি লোকগুলোকে চমকে রাখার জন্য, বিশেষ গুল্ম থেকে তৈরি টানটান দড়ির উপর দিয়ে। তোমরা এখনো পেরুতে ওইরকম দড়িতে তৈরি ব্রিজ দেখতে

পাবে।”

চাঁদের দেবী

বললাম বটে, ওই গ্রেভাইরসের গল্পে আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম না। এমনিতে দক্ষিণ আমেরিকার এসব দিকে হাজার রকমের কুসংস্কার বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। আর শুধু এখানেই নয়, আরও বহু জায়গায়ই নানারকম কুসংস্কারের ছড়াছড়ি দেখেছি।

কিন্তু গতবছরের আগের বছর ইনকা সান কাপ র   ্যালি হয়েছিল কারাবায়ো পাহাড়ে। জায়গাটা পুরোনো ইনকা রাজধানী কাসকোর পুবদিকে। সেবারের প্রতিযোগিতাটা খুবই শক্ত ছিল, কারণ এই গিরিখাতের মধ্য দিয়ে চলা তো তার পরেই খাড়া পাহাড় চড়া। রাস্তাগুলোও সাংঘাতিক প্যাঁচানো। মনে আছে, টানা দু-সপ্তাহ প্রতিযোগিতা চলার পর যখন শুনলাম দু-রাত একদিন বিশ্রাম পাওয়া যাবে, আমি আর ভিক্টর দু'জনেই খুব খুশি হলাম।

ভিক্টর আমার সহযোগী চালক। আমার মতো ও-ও বিশ্রামের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। সেদিন ঘুম ভাঙল প্রায় দুপুরের খাওয়ার সময়ে। খাওয়াদাওয়ার পর ঠিক হল মাছ ধরতে যাওয়া হবে। ওখানকার নদী আমাদের এই তিয়েনশানের মতো খরস্রোতা, ফেনিল উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে। তাছাড়া মাছ ধরার পক্ষেও ভালো। ছিপ ফেললেই ট্রাউট ওঠে।

ছোট্ট শহর লা পাকুয়া। আমরা আমাদের ছিপ আর মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম ডঙ্কো স্ট্যামাটভকে। স্ট্যামাটভ বুলগেরিয়ার দলের প্রতিযোগী।

“আরে স্ট্যমাটিখ যে!”

আমার গলা শুনে ও তাকাল। এবার রসেত্তিকে ও দারুণভাবে বিট করেছে। সেকথাই বললাম ওকে, “আরে ভায়া, রসেত্তিকে যা দিলে! ও ভাবতে পারেনি! দেখো, এবার ও ওদের নেপলসের বিখ্যাত গানই ভুলে না যায়!”

“তখন না হয় আমাদের স্লাভ ভাষার গান শিখিয়ে দেব!” ডঙ্কো মুচকি হেসে

বলল, “কিন্তু বাপু মৎসশিকারী, অন্ধকার নামার আগে ফিরে এস হে! বিকেলে একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়ার আছে। পাহাড়ের অনেকটা উপরে, যেখান থেকে বরফ পাওয়া যায়, তারও খানিকটা উপরে রেড ইন্ডিয়ান উপজাতিদের একটা গ্রাম আছে। সেখানকার লোকজন এখনো বিশেষ একটা সভ্য হয়ে ওঠেনি। অমাবস্যার পর প্রথম যে চাঁদ ওঠে, সেই চাঁদের উদ্দেশ্যে ওদের কী একটা বড় অনুষ্ঠান হয়, আজ সেই অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, একজন রেড ইন্ডিয়ান সুন্দরী পাহাড়চূড়ার উপর থেকে ভেসে ভেসে নিচে আসবে শুনেছি, বিশাল কোনো জন্তুর থাবায় বসে অথবা পিঠে ডানা লাগিয়ে। সে যাই হোক, এরকম অভিজ্ঞতা আমার অন্তত আগে হয়নি। তুমি শুনেছ কখনো? আমিও অবশ্য এরকম কোনো অনুষ্ঠানের কথা আগে শুনিনি। তোমরা শুনে থাকতেও পারো।”

ডঙ্কোর কাছেই শুনলাম, “মেয়র নিজে আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, ভাবতে পারো! আসলে, ভদ্রলোকের গাড়ির উপর একটা দুর্বলতা আছে, যেমন আমাদের রসেত্তির কথাই ভাবো না! ওর দুর্বলতা অবশ্য মেয়েদের উপর।”

আবার রসেত্তির কথা ঘুরে ফিরে এসে গেল। কতগুলো ব্যাপার ডঙ্কো জানিয়ে দিল, “হ্যাঁ, তবে একটা ব্যাপারে মেয়র বার বার অনুরোধ করেছেন, কেউ যেন কোনোরকম ক্যামেরা ব্যবহার না করে। আমার অবশ্য অনুরোধ না বলে আদেশ বলেই মনে হয়েছে।”

এ ব্যাপারে অবশ্য একজনকে নিয়েই আমার ভয়। সেটা গোলোসেয়েভকে নিয়ে।

আমরা রাত্তির আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। যে যার গাড়ি নিয়ে যাব।

পাহাড়ে অন্ধকার তাড়াতাড়ি নামে। শেষ পাঁচ কিলোমিটার আমাদের পাঁচটা গাড়ি সারি বেঁধে ক্রমশ চড়াইতে উঠছে। ইঞ্জিনের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আমরা যে পথ দিয়ে উঠছি, এ পথে সাধারণত গাড়ি চলে না। মালবোঝাই লামাদের চলাচলের রাস্তা এটা। এখানে মাল বওয়ার জন্য গরু, ঘোড়া, গাধা বা খচ্চর এসবের ব্যবহার নেই, তার জায়গা নিয়েছে এই লামারা।

রাস্তাটা পাহাড়ের গা বেয়ে সরু সুতোর মতো উঠে গেছে। আর অন্যদিকে গভীর খাদ। মেয়র ছিলেন স্ট্যামাটভের গাড়িতে। একটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়র বাইরে এসে দু-হাত তুলে নাচের ভঙ্গিমায় আমাদেরও থামতে ইঙ্গিত করলেন। মেয়রের অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসি পাচ্ছিল। যাই হোক, ভদ্রলোক জানালেন, "গাড়িতে আর যাওয়া যাবে না, রাস্তা বড়োই সরু। আর তাছাড়া, আপনাদের ভালোমন্দের দায় তো আমার উপরেই। ওই রাস্তায় গাড়িতে যেতে গেলে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়! তার জবাবদিহি কে করবে বলুন? তার চেয়ে চলুন, পায়ে হেঁটে এগোনো যাক। না না, বেশিদূর নয়। হেঁটে গেলে বড়োজোর ঘণ্টা খানেকের পথ।"

মেয়রের কথা শেষ হওয়ার আগেই রসেত্তি তার গাড়ির অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল। গোঁ গোঁ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সামনের চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল তার ভিসুভিয়াস। খানিকক্ষণ বাদেই আমাদের ঠিক মাথার উপরের রাস্তায় ওর গাড়ির লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়া আলোটা আর তার ঠিক পিছনেই ওর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথার স্যিলুয়েট দেখা গেল, সঙ্গে ওর তীক্ষ্ণ গলার গানও কানে এলু

'চাঁদের আলোয় দেখেছিলাম।
সুন্দরী সে, জ্যোৎস্না মেয়ে।
গোলাপরঙা চুলের বাহার
শ্রেষ্ঠ কে আর তোমার চেয়ে
লা-লা-লা-লা-'

রসেত্তি আমাকে আর গোলোয়েসেভকেও খুব করে বুঝিয়েছিল।

সে যাই হোক, মেয়র প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু হাজার হলেও তিনি লা পাকুয়ার সর্বাধিনায়ক, কাজেই সামলেও নিলেন চট করে। রাসেত্তির পথের দিকে দু-চারবার নজর দিয়ে যেন কিছুই হয়নি এভাবে আগের কথার খেই ধরল।

রসেত্তির গাড়িটা এবার নেমে এল; স্ট্যামাটভের গাড়ির সামনে গাড়িটাকে দাঁড়

করিয়ে ও বেরিয়ে এল বাইরে। মেয়র একটু চড়াই ভেঙে ওর পাশে গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল। আমরাও আবার এগোলাম। হ্যাঁ, গাড়িতেই।

শেষপর্যন্ত দশটা নাগাদ আমরা সেই রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

গ্রামে পৌঁছনোর খানিক আগে থেকেই বেশ কয়েকটা আগুনের শিখা নজরে আসছিল। এরকম অদ্ভুত রঙের আগুন আগে কখনো দেখিনি। বেগুনি আগুনের শিখা, তার মধ্যে। থেকে নানাধরনের হলুদের আভা উঁকি দিচ্ছিল।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে ছোটো ছোটো বাড়ি নজরে আসছিল। বাড়িগুলো বেশ শক্তপোক্ত, ঢালাই ছাদের। আগুন জ্বালানো হয়েছে এখান থেকে খানিক দূরে, একটা পাথরের মিনারের গোড়ায়। মিনারের আকৃতিটা বেশ নজর টানে। এর মধ্যে তিনটে অগ্নিকুণ্ডের উপর বিশাল বিশাল আকারের তিনটে কড়াই ঝোলানো হয়েছে।

গাড়ি যেখানে রাখা হল, সেখান থেকে কিছুটা চড়াই উঠলেই এই পাহাড়টার চূড়ো। আর সেখানেই মিনারের চারদিকে আগুনের বেষ্টনী।

এই পাহাড়টার পিছন দিয়ে আরেকটা খাড়া চড়াই। সে চড়াইটা সোজা উঠে গেছে আরেকটা চূড়ায়। তার মাথায় একইরকম একটা অদ্ভুত আকৃতির মিনার দেখতে পেলাম, যার গোড়ায় একটামাত্র আগুনের কুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। তবে এই দুটো পাহাড়ের মধ্যে বেশ গভীর খাদ। নীচে বোধ হয় একটা নদী আছে, কেননা অবিরাম একটা জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এবার চড়াই ভেঙে ওই আগুনের কুণ্ডগুলোর কাছে পৌঁছতে হবে। আমরা হাঁটা শুরু করলাম।

অনেকে যাচ্ছে এ পথে। এখানকার লোকজনের টুপি আর উজ্জ্বল রঙের পোশাক চোখে পড়ে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার! যারা যাচ্ছে, সবাই পুরুষ, একজন মহিলাকেও দেখলাম না!

আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি, সেই সময়ে মেয়র হঠাৎ ফিসফিস করে বললেন,

"ওই যে পাটাতনের উপর লাল কাপড় পরে বয়স্ক মানুষটি বসে আছেন, উনি মোড়ল। একেবারে মাটি ছুঁয়ে ওঁকে সম্মান জানাবেন সবাই। ওঁর বাঁদিকে দেখুন তিনজন আছে, তার মধ্যে দু'জন গুনিন আর ওই যে মাথায় ঈগলের পালক গুঁজেছে, ও-ই পুরোহিত। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, এখানে বিদেশিদের কথা বলা নিষেধ। কোনোরকম গান টান গাইবেন না যেন। সেনুর রসেত্তি, কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

খেয়াল করলাম, মোড়ল বসেছেন একটা চিতাবাঘের ছালের উপর। মেয়রই প্রথমে খুব ঘটা করে নীচু হয়ে মোড়লকে অভিবাদন করলেন। আমরাও একে একে সেই চেষ্টা করলাম, তবে বেশ নাকানিচোবানি খেতে হল সেটা করতে গিয়ে।

মোড়ল উঠে দাঁড়িয়ে একইভাবে আমাদের সামনে মাথা নোয়ালেন। তারপর খুব দ্রুত কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আমাদের এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তবে মোড়লের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলাম না।

মেয়র দোভাষীর কাজটা করে দিলেন। "চন্দ্রদেবের যোদ্ধাদের অধিনায়ক, যিনি তাঁর রথের সিংহাসনে আসীন, তাঁর রাজ্যে আপনাদের স্বাগত। তাঁর তেজ আপনাদের সমস্ত অশুভ থেকে রক্ষা করুক।"

মোড়লকে দেখে মনে হল বয়স কম করে আশি তো হবেই। ঝুপো ভ্রুর নীচে তাঁর তীব্র দৃষ্টিতে যদিও তারুণ্যের ছোঁয়া। চারজন মুশকো জোয়ান মোড়লের দেহরক্ষী। তির-ধনুক, বর্শা ছাড়া একটা উইনচেস্টার রাইফেলও রয়েছে তাদের সঙ্গে।

উইনচেস্টারওয়ালা এবার ওই চিতাবাঘের ছালটাকে আর একটু ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের বসতে ইঙ্গিত করল। বসা মাত্র অতিথিসেবার আয়োজন হল। সাদা রঙের পানীয় ভর্তি পোড়ামাটির পানপাত্র আমাদের সবার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। পাত্রগুলো একেবারে কানায় কানায় ভর্তি। তার সঙ্গে এল সোনার থালায় গরম গরম সুগন্ধি ভাজা মাংস। মাংসটা এ অঞ্চলের এক বিশেষ ধরনের প্রাণী, কেভির। কেভির মাংসের এই পদটা আন্দিজের একটা ঐতিহ্য।

এটাই এদের অতিথিসকারের রীতি। আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, এই মাংস আর পানীয় না খেলে এদের অসম্মান করা হবে।

খুব সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে একটু মাংস মুখে দিলাম। মাংসের মধ্যে নানারকম মশলা আর পাতার পুর ঠাসা।

মেয়র মোড়লের সঙ্গে খুব সহজভাবে কথা বলছিলেন। একবার দেখলাম আমাদের গাড়িগুলোকে দেখিয়ে কিছু বললেন, তারপর আমাদের নাম শুনতে পেলাম ওঁর কথার মধ্যে। যদিও কী বলছেন, সেটা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল আমাদের পরিচয় দিচ্ছেন।

আমাদের যে পানীয় দিয়েছিল, কয়েকবার তাতে চুমুক দিলাম। বেশ টক-মিষ্টি খেতে। সামনেই সেই উঁচু স্তম্ভটা আকাশ ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচে সেই বেগুনি রঙের আগুনের কয়েকটা কুণ্ড জ্বলছে। আর সেই আগুন ঘিরে অবিশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন মানুষ, তাদের মুখে একটাও শব্দ নেই। দেখলে মনে হতে পারে যে, ওরা কথা বলতেই জানে না। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল।

কালের ফিরতি স্রোতে ভেসে আমি যেন পৌঁছে গেলাম সুদূর অতীতে। ভেসে বেড়াতে লাগলাম কাল থেকে কালান্তরে। কখনো রাজা সভাতোস্লাভের কোনো বিশ্বস্ত অনুচর আমি, আবার সময়ের অন্য ফ্রেমে আমি তাতারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়েছি বীর নাইট ইয়েভপাতির সঙ্গী হয়ে, অতীতের কোনো কুয়াশামাখা ভোরের আধফোঁটা আলোয় ওই তো দেখতে পাচ্ছি নেপ্রিয়াদভা নদীর তীরে ওকগাছের জঙ্গলের মধ্যে অশ্বারোহী দু'জন নাইট মুখোমুখি। একজনের মাথায় বাহারি শিয়ালের লোমের টুপি, আরেকজনের পোশাক একেবারেই সাদামাটা। গ্রামের সাধারণ চাষির মতো একটা দোমড়ানো শার্ট পরনে, বুকের কাছে ব্রোঞ্জের ঐশ আঁটা। শিয়াল-লোমের টুপিধারীর চোখে মুখে খুনে ক্রোধ জ্বলজ্বল করছে। দু'জনেই দু' জনের দিকে বর্শা ছুড়ল একইসঙ্গে আর তারপর... তারপর আহত দুই যোদ্ধা ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

ডম-ডম-ডম-ডম... দামামার জোরালো আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এলাম। আওয়াজটা মনে হয় আসছিল ওদিককার চূড়ার উপরের বিচ্ছিন্ন মিনারটার উপর থেকে।

পুরোহিত এতক্ষণ মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল। ওই আওয়াজটায় যেন প্রাণ ফিরে পেল। দু-হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। খেয়াল করলাম, প্রসারিত হাতদুটোতে পাখির পালক বাঁধা রয়েছে। এবার সে এগিয়ে গিয়ে মিনারের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

দুই গুনিন পুরোহিতকে সাহায্য করছিল। শুরু হল মন্ত্রোচ্চারণ। একটানা একঘেয়ে সুর।

আগুনের কুণ্ডগুলো ক্রমশ একটু একটু করে কমে আসতে লাগল। ধোঁয়ার চাদরে সবকিছু ঢেকে গেল। আগুনও ছোটো হতে হতে একসময় পুরোপুরি নিভে গেল। শুধু এদিককার কুণ্ডগুলো নয়, চড়াইয়ের ওপাশের চূড়ায় যে আগুনটা জ্বলছিল, সেটাও নিভে গেল। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার সমস্ত চরাচর গ্রাস করে নিল। শুধুমাত্র রসেত্তির মুখের জ্বলন্ত সিগারেটের লাল বিন্দু তারার মতো মিটমিট করছিল। একসময় সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভিক্টর আর আমি মেয়রের কাছাকাছি বসে ছিলাম। অন্ধকারের আড়াল নিয়ে আমি মেয়রের আরও কাছে ঘেঁষে এলাম। কীসের মন্ত্র বলা হচ্ছে জানতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল, আর সেটা একমাত্র এঁর কাছ থেকেই জানা সম্ভব। তাই মেয়রের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, “কিছু মনে করবেন না, ওরা কী বলছে একটু বলবেন?”

“ওরা চন্দ্রলোকের আত্মাকে আহ্বান করছে। যতক্ষণ না স্তম্ভের উপর পৌঁছবে, ততক্ষণ এই মন্ত্র চলতেই থাকবে। আমি আপনাকে মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি, আপনি পরে আপনার বন্ধুদের বলে দেবেন।” মেয়রও আমার মতোই ফিসফিস করে বললেন।

“অসংখ্য ধন্যবাদ!”

সেইমতো ওদের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মেয়রের অনুবাদও চলতে লাগল। মন্ত্রগুলো ছিল প্রশ্ন-উত্তরের ঢঙে।

"আলোর খবর সঙ্গে করে শিখর পেরোয় কোন জনা?" পুরোহিতের উচ্ছ্বসিত গলা যেন মিনারের চূড়া থেকে ভেসে এল।

এর উত্তরে সামনের চড়াইয়ের ওপার থেকে অপেক্ষাকৃত তরুণ গলা শোনা গেল, "দীপ্তিময়ী চাঁদের দেবী।"

"পিঠের ডানায় দেবীর চিহ্ন বহন করেন কোন জনা?"

"চাঁদের দয়ার আধার যিনি।"

"তাঁর চুলের জালে আলোর ছটা,

যেন কচি চারার দোলা

যেন তরুণ স্রোতের চলা

কোন সে দেবী, কোন জনা?"

"দীপ্তিময়ী চাঁদের দেবী।"

"যার চোখের ধারা আশিস হয়ে বৃষ্টি নামায় ধরার বুকে

কোন সে দেবী, কোন জনা?"

"চাঁদের দয়ার আধার তিনি।"

"যিনি তফাত করেন জনম-মরণ

মন্দ-ভালো

আঁধার-আলো

কোন সে দেবী, কোন জনা?"

"দীপ্তিময়ী চাঁদের দেবী।"

এই প্রশ্ন-উত্তর আরও অনেক লম্বা ছিল। আমার পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই সব মনে রাখা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া মেয়রের অনুবাদের ভাষা! অনেক কথাই বুঝতে পারছিলাম না।

শেষপর্যন্ত খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মিনারের মাথা থেকে পুরোহিতের গলা

শোনা গেল, যেন চাপা গলায় কাউকে ডাকছে

“আলোক-কুমারী তুমি
দরশন দাও দেবী
তোমার সেনানী-দলে।
আছি মোরা পথ চেয়ে।
নভোগামী দেবী এস,
আকাশেতে ভেসে এস....”

দামামা বাজতে লাগল দ্রুত তালে।

হঠাৎ আমাদের মাথার ঠিক উপরে নতুন এবং অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঠিক দেখছি তো! চোখ কচলে আবার তাকালাম। স্বপ্ন দেখছি না তো? নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। যা দেখছি তার সঙ্গে আমার বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতার মিল নেই!

সত্যিই একজন উড়ন্ত নারী, যার গা দিয়ে আলোর ছটা বেরোচ্ছে! ওদিককার পাহাড়ের উপরের মিনারের দিক থেকে অন্ধকার ভেদ করে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে উড়ে এল! আলোকোজ্জ্বল হাতদুটো ডানার মতো নাড়ছিল উপর-নীচে। আলখাল্লার মতো একটা পোশাক ওর দুই ডানা কিংবা হাত, যাই বলি না কেন, তার মধ্যিখানে ঝকমক করছে। মুখটা চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ সাদা, দুই চোখ ঘিরে নীল রঙের বৃত্ত, মাথার উপর সরু কাস্তের মতো একফালি বাঁকা চাঁদের মুকুট শোভা পাচ্ছে।

অবিশ্বাস্য!

ভিক্টর, যে কোনোরকম অলৌকিকে বিশ্বাস করে না, চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখার পর সে এবার কী বলবে!

আমি ভিক্টর যেদিকে ছিল অন্ধকারের মধ্যে, আন্দাজে সেদিকে সরে গেলাম। কিন্তু ভিক্টর ওখানে ছিল না! নিশ্চয়ই স্ট্যামাটিখের কাছে গেছে।

চারদিক নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই, শুধুমাত্র অনেক নীচ দিয়ে যে নদীটা বয়ে

যাচ্ছে, তার মৃদু কুলুকুলু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

উড়ন্ত চাঁদের দেবীকে দেখার পর থেকে এক, দুই করে মনে মনে গুনছিলাম। ঠিক যেই একশো পঞ্চাশ গোনা শেষ হল, উড়ন্ত মূর্তিও আমাদের সামনের মিনারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

আকাশে এখন চাঁদ উঠেছে দেবীর মাথার উপর যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক সেরকমই সরু একফালি চাঁদ।

এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের চন্দ্রসেনা বলে। চাঁদের দেবীর সেনানী।

ওরা এবার ওদের ভাষায় কোনো গান গাইছিল, আর সেই সঙ্গে মন্ত্র বলাও চলছিল আগের মতো। দামামার শব্দ আর কানে আসছে না। বোধ হয় থেমে গেছে। বেশ অনেকক্ষণ মন্ত্র বলার পর এদিককার কুণ্ডগুলোর নিভন্ত আগুন আবার দপ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু এবার দূরের কুণ্ডটার আগুন জ্বলল না।

আমি মিনার দুটোর মাঝের আকাশের দিকে তাকালাম নতুন কিছু দেখবার আশায়। এখানে আসার পর যে শরবত দিয়েছিল তার মধ্যে সম্ভবত গ্রেভাইরসের রস মেশানো ছিল। এতক্ষণে তার প্রভাব কেটে গেছে টের পাচ্ছি। এখন আমার মাথা অনেক পরিষ্কার। ভেবেছিলাম ওই 'দীপ্তিময়ী চাঁদের দেবী' কে আবার দেখতে পাব, কিন্তু শেষপর্যন্ত নতুন আর কিছুই ঘটল না।

এবার মিনারের সিঁড়ির মুখে পুরোহিতের অবয়ব আবার দেখা গেল। সঙ্গে গুনিন দু' জন ছিল না। ভারী পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ডানহাতে একটা চকচকে ছোরা আর বাঁহাতে ঝুলছে একটা ছিন্নমুণ্ড মোরগ! আমার বিস্মিত চোখের সামনে সে নেমে এসে মোড়লের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথামতো কোমর ভেঙে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর যেটা ঘটল, তা দেখে আমি শিউরে উঠলাম।

পুরোহিত মোরগটার পেট চিরে সটান তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল, তারপর টেনে ছিঁড়ে বের করে নিল মোরগের কলিজা এবং... এবং ওখানে দাঁড়িয়ে কচকচ করে চিবিয়ে খেল সেটা!

চাঁদের সেনানীর দল আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কেউ কেউ শুরু করল উদ্দাম

নৃত্য, সেই সঙ্গে দামামা আবার বাজতে লাগল আদিম ছন্দে! যেন সটান বুকের মাঝে এসে অনুরণন তোলে সে শব্দ।

অগ্নিকুণ্ডের উপরের ঝোলানো কড়াইগুলো থেকে কোন সুরুয়া এখন অনেকের হাতেই চলে এসেছে। কীসের সুরুয়া ওটা জানি না।

ভিক্টর গোলোয়েসেভকে কাছাকাছি দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হে ভিক্টর, কী বুঝছ?

ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা উঁচিয়ে ও বোঝাল ওর ভালো লাগার পরিমাণ। তারপর যেটা বলল তার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। বলল, "ফাটাফাটি! কেভির মাংসে না জানি ওরা কী মশলা দিয়েছে! আমি তো চেটেপুটে খেয়েছি। আবার যদি কেউ নিয়ে আসে আবারো খাব। স্বাদটা যেন মুখে লেগে রয়েছে।"

যা বাবা! কী আশ্চর্য! শুধুই কেভি! ওই উজ্জ্বল মানব-পাখি সম্বন্ধে একটা শব্দও নয়!

ওকে কিছু বলার আগেই আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হল, আমার দেহটা ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। যেন আমাকে এবার চড়তে হবে এই মিনারের উপর। পা বাড়াতে হবে ওই চড়াইয়ের দিকে। দু-বাহু নাড়াব ডানার ছন্দে। আর তখন আমায় পায় কে? আকাশে উড়তে থাকব বাঁধনহারা!

সত্যি কথা বলতে কী, এরকম অনুভূতি এই প্রথম হল, তা নয়। যখন ছোটো ছিলাম, আমাদের ইয়েলতলোভকা গ্রাম লাগোয়া ব্যাকওয়াটারে, গ্রামের মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতাম পাখির মতো, তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এরকম স্বপ্ন বহুবার দেখেছি। তার প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি এখনো আমার মনে আছে। অনেক উপর থেকে পাখির চোখে দেখা বাড়ির লাগোয়া তরিতরকারির বাগান, পাহাড়ের গা বেয়ে ছাগলেরা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এমনকি স্বপ্নে বোধ হয় চোখের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার অতীত কিছু ক্ষমতা এসে যায়। তাই হয়তো দেখতে পেতাম ক্ষেতের মাচায় কুমড়ো ফলে রয়েছে, অগভীর জলায় ছোটো ছোটো মাছ খেলে বেড়াচ্ছে, গতবছরের জমানো খড়ের গাদার মধ্যে মেঠো ইঁদুরের ছুটোছুটি, এমনকি বেড়ার ধারে কালো জামের

গাছের ফলগুলো পর্যন্ত! সেগুলোতে সবে পাক ধরছে।

বড়ো হয়ে ভর্তি হলাম অটোমোবাইল একাঁদেমিতে। ওখানে একটা দেওয়ালজোড়া মস্ত ছবি ছিল। ছবির বিষয়বস্তু কল্পবিজ্ঞানের। ইভান ইয়েফ্রেমভের ফিকশনে যেমন আছে তেমন একটা যান ছাড়া হচ্ছে স্তেপ অঞ্চল থেকে শনিগ্রহের উদ্দেশ্যে। যেন কয়েকশো কিলোমিটার উপরে পাক খাওয়া উপগ্রহ ছবিটা তুলে পাঠিয়েছে। পুরো জায়গাটার খুঁটিনাটি এত সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে যে সত্যি বলে মনে হয়। উৎক্ষেপণ স্থানের কয়েকশো মিটারের মধ্যে টিউলিপের লাল রঙের পাপড়ি, পাথরের খাঁজে সাপের শীতঘুমের প্রস্তুতি, গর্ত থেকে মেঠো ইঁদুরের উঁকিঝুঁকি, সমস্ত পরিষ্কার বোঝা যায়।

আমার সেই বহুবার দেখা স্বপ্নটাই যেন ছবিতে রূপ পেয়েছে। আমার খুব অবাক লাগত। বার বার মনে হত, ছোটবেলার স্বপ্নটা বুঝি কোনদিন সত্যি হবে!

মেয়রের কথায় সম্বিত ফিরল। মেয়র আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "এ আর কী দেখছেন! দেখার মতো উৎসব হয় বসন্তকালে। একবার আসুন সেই সময়ে, মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।"

মেয়রের ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি একবার চাঁদের পিঠ ছুঁয়ে আমাদের দিকে ফিরল। বললেন, "দেখছেন তো, এই উৎসবে মেয়েরা নেই। কারণ এটায় ওদের যোগ দেওয়া বারণ। কিন্তু বসন্তকালের উৎসবে মেয়ে-পুরুষ সবাই আসতে পারে। খুব জাঁকজমক হয়। আরও মজা! কারণ মহিলা চন্দ্রসেনাদের সঙ্গেও উৎসবে মিলতে পারবেন। ভাবুন একবার! সূর্যোদয়ের আগে একটা জাল বিছানো হয় দুটো মিনারের মাঝে। এমনভাবে সেটা থাকে যেন ভোরের সূর্যের প্রথম আলোটা ওই জালের উপর এসে পড়ে।"

রসেত্তি মোড়লের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একেবারে মাখনের মতো মোলায়েম স্বরে, বিনয়ে গদগদ হয়ে মোড়লকে ধন্যবাদ জানাল উড়ন্ত 'চাঁদের দেবীর এত সুন্দর একটা প্রদর্শনীতে থাকতে দিয়েছেন বলে। তারপর বলল, "আমার আরেকটা প্রার্থনা ছিল আপনার কাছে। দয়া করে ওই দেবীর সঙ্গে যদি একবার

আলাপ করিয়ে দেন। আমি কথা দিচ্ছি, আমার এই রথে চড়িয়ে ওঁকে নিজে সঙ্গে করে লা পাকুয়ার দুর্দান্ত নৃত্যশালায় নিয়ে যাব।"

মোড়ল একবার ঝটিতি তার উইনচেস্টারওয়ালা দেহরক্ষীর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "এই যে রথওয়ালা, আপনার কথা শুনলাম। কিন্তু আপনার ইচ্ছা পূরণ করা আমার সাধ্যের বাইরে। দেবী তাঁর স্বর্গীয় সুষমা বাইরের জগতের কারো কাছে প্রকাশ করেন না। আর কখনো যদি কেউ তাঁকে দেখেও ফেলে, সেই রূপ সহ্য করতে পারে না। তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। চন্দ্রগ্রহণের রাতে, যখন আলোয় কালোয় একাকার হয়ে যায়, ঠিক তখনই মৃত্যুর করাল ছায়া তার উপরে পড়বেই!

মোড়লের বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে গা-টা শিরশির করে উঠল। রসেত্তিও ভয় পেয়েছে বুঝলাম ওর আওয়াজে। ফিসফিস করে মোড়লের কথারই পুনরাবৃত্তি করল, "চন্দ্রগ্রহণের রাতে, যখন আলোয় কালোয় একাকার হয়ে যায়, ঠিক তখনই..."

"আপনাদের ওই রথে দেবীকে চড়াবেন! ছোঃ!"

এই প্রথমবার পুরোহিতকে কথা বলতে দেখলাম। প্রথমবার এবং শেষবার। এর আগে সে মন্ত্র বলেছে, কিন্তু তাছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। মোড়লকে নীচু হয়ে অভিবাদন করে সে বলল, "আপনাদের এই রথের ক্ষমতা কতটুকু! চাঁদের আলোয় আমাদের এই খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারবে ওই রথ? দেবী আপনাদের অজ্ঞতা মার্জনা করুন!"

কথা ক'টা বলেই অত্যন্ত রাজকীয় ঢঙে পুরোহিত আবার মিনারের দিকে ফিরল, তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল মিনারের অন্ধকারে।

সবাই বিব্রত বোধ করছিলাম এই কথোপকথনে। তাই একটু স্বাভাবিক করার জন্য বললাম, "চাঁদের দেবী কতদিন বাদে বাদে চন্দ্রসেনাদের দেখা দেন?"

"উনি বছরে একবারই আসেন। চন্দ্রের মৃত্যু মিনার থেকে নিয়ে আসেন চন্দ্রের তেজ, নিয়ে আসেন জীবনের দোলন মিনারে। আর সেই রাতে দেবীকে তুষ্ট না করলে গোটা পৃথিবীর মানবজাতির উপর নেমে আসে তাঁর ক্রোধ, আর তাই সেই

দৈবদুর্বিপাক এড়াতে দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে তাঁর পুজো করতে হয়। অনেক পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় ছোটোখাটো বিড়ম্বনা ঘটতে পারে। এগুলো দেবীর ইঙ্গিত। আর তখন অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাতে শুকনো কাশফুল জ্বালাতে হয়, দামামা বাজিয়ে বলি দিতে হয় আর সেই প্রাণীর কলজে কাঁচা খেতে হয়।”

মেয়রের কাছে আরও জানলাম, যবে থেকে চন্দ্রসেনারা প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল, তখন থেকেই এই প্রথা একইভাবে পালিত হচ্ছে। তা সে আজ বাষট্টি হাজার চাঁদ আগের ঘটনা।

‘বাষট্টি হাজার চাঁদ’ মানে বাষট্টি হাজার চান্দ্রমাস, হিসেব করে দেখলাম প্রায় পাঁচ হাজার বছর।

অর্থাৎ, এদের কাহিনি অনুযায়ী ওরা পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল, হোমারের সময়েরও আগে।

ভিক্টর একটু বাঁকা হেসে বলল, “আর তাই, যে রাতে শ্রীমতী চন্দ্রদেবী আপনাদের মধ্যে আসেন, সেদিন মোরগের কলজে খেতে হয়?”

মোড়ল হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিলেন। তারপর অতি শান্তভাবে বললেন, “শুধু মোরগের কলজে বললে ভুল হবে, যে-কোনো জীবিত প্রাণীর কলজে। আমাদের এই পুরোহিতের ঠাকুরদা যখন পুরোহিত ছিলেন, তখন অবশ্য মোরগ চলত না। সে অন্য কিছু ছিল, অন্যরকম প্রাণী।”

ক্রমশ রাত্রি বাড়ছে। চাঁদ এখন মধ্যগগনে। নিস্তব্ধ সেই রাতে এক আকাশ তারার নীচে আমরা ক’ জন নির্বাক দাঁড়িয়ে আছি। ওই সরু একফালি চাঁদের আলো দূরের পাহাড়গুলোর মাথার জমাট বরফের উপর পড়ে এক অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি করেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। আমাদের শহরে ফিরতে হবে। প্রতিযোগিতা থেকে বিশ্রামের মেয়াদ আজ রাত পর্যন্ত। কাজেই এবার রওনা হওয়া উচিত।

মোড়ল আমাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। লক্ষ করলাম, দেহরক্ষীও এল

সঙ্গে সঙ্গে। মেয়র তাঁকে অনেক কিছু উপহার দিলেন কয়েক বাক্স ওয়াইন, নানারকম খাবার, একটা কুডুল আর করাত। করাতটা বড়ো, দু' জনে দু-দিকে ধরে ব্যবহার করতে হয়।

মোড়ল আর মেয়রের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু কথা হল। তারপরেই দেখলাম দু'জনে কোলাকুলি করলেন আর মোড়ল কাঁদতে লাগলেন। কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

রসেত্তি জিজ্ঞেস করল, "কী হল, উনি কাঁদছেন কেন? উনি কি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছেন? কীসব আবোলতাবোল বকলাম! দেবীকে নৃত্যশালায় নিয়ে যাব! ছি ছি! আমি ওঁকে যদি আঘাত করে থাকি তবে যেন আমার মাথায় বজ্রপাত হয়।"

"না না, সেজন্য নয়। তিন বছর আগে চাঁদের দেবী ওঁর নাতিকে নিয়ে নিয়েছেন। বাচ্চাটা ওই ওপাশের চড়াই বেয়ে উঠছিল, তারপর কী করে যেন পা পিছলে খাদে পড়ে যায়। তার আগের বছর ওঁর ছেলে মারা যায়।" মেয়র বললেন।

খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কার জীবনে যে কী লুকোনো থাকে, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝারই উপায় থাকে না।

"এই চন্দ্রসেনাদের মোড়ল নির্বাচনের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। বর্তমানের মোড়ল তার বংশের কোনো উত্তরসূরিকে নির্বাচন করেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই হয় পরবর্তী মোড়ল। সেটাই নিয়ম। কিন্তু মুশকিল হল, উনি আমাকে সেই দায়িত্ব দিতে চাইছেন! আমি তো জানি যে আমি কতটা দুর্বল চিত্ত, তার উপর আবার 'রুলের জুয়া ছাড়া থাকতে পারি না। এই দায়িত্ব কি আমায় সাজে!" মেয়র কাঁচুমাচু মুখে জানালেন।

শেষপর্যন্ত জানা গেল মেয়র আদতে মোড়লের ভাইপো।

আমার গাড়ির বুটে সেলোফেনে মোড়া পেরুনের একটা ছোটো প্রতিকৃতি ছিল। খুবই ছোটো, আসল গাড়ির দশ ভাগের একভাগ হবে কি হবে না। সৌর প্যানেল লাগানো, রিমোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মোড়কটা মোড়লের পায়ের কাছে রেখে বললাম, "আমাদের সকলের তরফ থেকে চন্দ্র সেনানীদের অধিপতির জন্যে এই

সামান্য উপহার। মোড়কটা খুলে জিনিসটা দেখালাম।

মোড়ল মৃদু হেসে গাড়িটা নিলেন, তারপর কপাল কুঁচকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন সেটা। মনে হল, এরকম জিনিস আগে কখনো দেখেননি। শেষপর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, "সে অনেকদিন আগের কথা। আমার বাপ-ঠাকুরদার আমলের কথা বলছি। তখনকার পুরোহিতের ছিল প্রখর দূরদৃষ্টি। উনি বলেছিলেন, যত বড়ো রথই হোক

কেন, আমাদের এই আঁকাবাঁকা চড়াইতে ওঠার সাধ্য কারো নেই। তাই এই রথ শিশুকে খামোখা চালিয়ে কষ্ট দেওয়ার দরকার নেই। অনেক অনেক চাঁদ আগে, আমাদের পরদাদাদের সময় স্বর্গ থেকে পবিত্র পাথর এসে পড়েছিল। তার ধারে আমার সিংহাসন, আর সিংহাসনের পাশে এই রথের জায়গা হবে। তাহলে সকলেই দেখতে পাবে।"

এই সামান্য জিনিসে একজন প্রাজ্ঞ মানুষ এত খুশি হতে পারেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

তবে তাঁর অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। যখন মোড়লকে রিমোট দিয়ে কীভাবে গাড়ি চলে তা হাতেকলমে দেখিয়ে দিলাম, মোড়ল শিশুর মতো হেসে উঠল।

রিমোটটা দেখিয়ে বললাম, "দেখুন মোড়লমশাই, এই রথ-শিশু চড়াই বেয়েও উঠতে পারে। এই যে, এই চৌকো বোর্ডটা দেখুন, এখানে চারটে পাপড়ি দেখতে পাচ্ছেন তো! এগুলো দিয়েই এই রথ-শিশুকে চালাতে হয়।" মোড়লকে রিমোটটা দেখিয়ে বোঝাতে থাকলাম কী করে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। "এই যে লাল পাপড়িটা দেখছেন, এটা টিপলে রথ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, আবার সবুজটা টিপলে পিছনের দিকে চলতে থাকবে। আর ডাইনে-বাঁয়ে সরাতে হলে এই নীল আর কমলা পাপড়ি দুটো লাগবে। কমলা পাপড়ি টিপলে বাঁদিকে, আর নীলটা দিয়ে ডানদিকে। আর এই যে মাঝখানে এই গোলটা দেখছেন, এটা এই যন্ত্রের চোখ। রথ -শিশু কোথায় যাচ্ছে এখানটায় দেখতে পাবেন সেটা। ধরুন ও নীচে নদীর দিকে

গেলে এখানে নদীর ছবি ফুটে উঠবে, আবার ও যদি পাহাড় বেয়ে চড়তে থাকে, এখানে সেটাই দেখা যাবে।”

মহা উৎসাহে মোড়ল মেয়রের সাহায্য নিয়ে রিমোট দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দেখলেন। কী আনন্দ তাঁর! মোড়লকে এত খুশি হতে এর আগে দেখিনি।

মোড়ল জিজ্ঞেস করলেন, “এই রথ-শিশু কি খুব বেশি দূর যেতে পারে?”

“তা পারে বৈকি! সারারাত ধরে একটানা ছুটতে তো পারবেই। আর হ্যাঁ, এই পাপড়িওয়ালা বোর্ডটাকে দুপুরবেলা রোদ্দুরে রাখলে রথ-শিশু সবসময়েই টগবগে থাকবে, কক্ষনো ঝিমিয়ে যাবে না। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান, এই বোর্ডটা যেন কখনোই উপর থেকে পড়ে না যায়, তাহলে কিন্তু রথ-শিশু আর চলতে পারবে না।”

“এ বোর্ডটাকে গুনিনদের কাছে রাখতে দেব, ওরাই সাবধানে রাখতে পারবে। বলে দেব, রোজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একে রোদে রাখতে, আর আমি যতদিন বেঁচে আছি। কোনোমতে যেন এই বোর্ড উপর থেকে না পড়ে খেয়াল রাখতে বলব। তবে, রথে চড়লেও আপনারা লোক ভালো। এর আগে কোনো বিদেশি আপনাদের মতো চন্দ্রসেনাদের অধিপতিকে এত আনন্দ দিতে পারেনি। পুরস্কার পাওনা আছে আপনাদের। বলুন, কী পেলে আপনারা খুশি হবেন?”

মোড়ল ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন যেদিকে পাহাড়ের মাথায় চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। তারপর হেসে বললেন, “বলুন, আমাদের এই চাঁদের আলোর জগৎ থেকে অন্ধকারের পথে কী নিয়ে যেতে চান?”

রসেত্তি উত্তেজিত! আমার কানে কানে বলল, “সুযোগটা কোনোমতেই হাতছাড়া করা যাবে না, সেনর তালানভ! আমি বলি কী, যে থালায় করে আমাদের ভাজা মাংস দিয়েছিল, তার অন্তত একটা দিতে বললে হয়। ওগুলো যে বিশুদ্ধ সোনার, তা আমি সেন্ট

জানুয়ারিয়াসের নামে দিব্যি দিয়ে বলতে পারি। আর এক-একটার ওজন দেখেছ?”

আমার ইচ্ছে ছিল গ্রেভাইরসের। আদৌ যদি ওর কোনো অস্তিত্ব থাকে, তবে

সেটা একান্তই এদের নিজস্ব জিনিস। ওই জিনিসটা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর থেকে বড় সুযোগ আর আসবে না।

আমি মেয়রকে চুপিচুপি জানালামও সেকথা। মেয়র কোনো জবাব দিলেন না। বরং ব্যথিত দৃষ্টিতে উদাস হয়ে কী ভাবতে লাগলেন।

আমি বললাম, "অসুবিধা থাকলে দিতে হবে না, আমরা কিছু মনে করব না। আপনার এই চাউনি সঙ্গে নিয়েই আমি আমার আঁধারের দেশে ফিরে যাব। মনে করব এটাই আমার পুরস্কার।"

মেয়র হাসতে চেষ্টা করলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, "এমন কিছু পুরস্কার আছে যা জীবদ্দশায় পাওয়া যায় না, বুঝলেন! বাবার কাছে শুনেছি, একবার একজন বিদেশি এরকম অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তাকে আর সে পুরস্কার পেতে হয়নি, তার আগেই এক ধাক্কায় তাকে খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।"

আমি তখনও আশা ছাড়তে পারিনি। তাই বললাম, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা গুরুতর, তা বুঝলাম। তাহলেও একটা কথা ভাবুন, তখন কিন্তু এরকম রথ-শিশু ছিল না যে এদিক ওদিক চলতে পারে। তাই না?" আমি পেরুনটাকে দেখালাম। "আর তাছাড়া লা পাকুয়াতে এরকম আরেকটা শিশু আপনার জন্যেও রয়েছে।"

ভাইপোও দেখলাম কথাটা শুনে কাকার মতোই খুশি হয়ে উঠলেন।

মোড়ল মেয়রের সঙ্গে কোথায় গেলেন, আবার একটু বাদে চলেও এলেন। ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, "আপনি যা চেয়েছেন তাই পাবেন। ওই আঁধারেই পাবেন আপনার পুরস্কার।"

রসেত্তিও অবশ্য তার পুরস্কারটা হাতে হাতেই পেল। একখানা নীলচে পাথর, যার মাঝখানে একটা ঘেঁদা। তা নাকি চন্দ্রদেবীর চোখের জল পড়ে তৈরি। আর একটা কাঠের খাঁচায় দুটো জ্যান্ত কেভি।

তোমার জায়গা কখনো শূন্য নয়

পরের দিন থেকে আবার সেই আঁটোসাঁটো কর্মসূচি। প্রতিযোগিতার ক্ষণিক অবসরে কখনো কখনো মনে পড়ে সেই রহস্যময় রাতের কথা। উপহার পাওয়া

সেই পোড়ামাটির পাত্রটাকে বের করি, ওটার কাঠের ছিপি সরিয়ে গন্ধ টেনে নিই বুক ভরে। কাটা খড়, মৌরি ফুল আর সোমরাজের মিলিত গন্ধের মতো লাগে। আর তখনই মনে হয় এই উন্মত্ত রেসিংয়ের জন্যে এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে বেড়ানো, সাক্ষাৎকার দেওয়া, নানাজনের সঙ্গে রকমারি বৈঠক, বক্ত...তা, লিডারদের হলুদ হেলমেট, পদে পদে দুর্ঘটনার কুটি, আঁকাবাঁকা পথ... সব অর্থহীন। নিজের বাড়ি, গ্রামের মাঠ-ঘাট, কুয়াশা-মোড়া নদীর বুকে খড় বোঝাই নৌকোর ভেসে যাওয়া, পাইনের পাতার ফাঁকে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শন শন... সবকিছু যেন কোন অমোঘ টানে টানতে থাকে।

কিন্তু তা সাময়িক, আবারো ফিরে আসতে হয় বর্তমানে।

এ বছরের ইনকা গোল্ড কাপ আমরাই জিতলাম। আমি আর ভিক্টর গোলোয়েসেভ। কিন্তু আমাদের এই টিমের এটাই ছিল শেষ জয়।

পেরুর ক্যালাও বন্দরে আমাদের রেসিং কার পেরুনকে নিয়ে জাহাজে উঠলাম। জাহাজের সামনের দিকের ডেকে আমাদের বাহনের জায়গা হল। তারপর কেবিনে ফিরে নিশ্চিন্তে লম্বা ঘুম দিলাম। দু-চারদিনের মধ্যেই জাহাজ রওনা দেবে।

একদিন সময় কাটাতে কাছের একটা সিনেমা হলে একটা ফিল্ম দেখে এলাম দু'জনে। 'দ্য সিজ অফ মার্স'। খুব বিজ্ঞাপন দেখেছি এই ফিল্মটার।

ফেরার সময় ভিক্টর বলল, "কিছু মনে কোরো না, আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে। তুমি জাহাজে ফেরো, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।" তারপর চোখ টিপে খুব একটা ষড়যন্ত্র করছে এমন ভঙ্গিতে বলল, "হুঁ হুঁ বাবা, কী আনতে যাচ্ছি, সেটা দেখলে হাঁ হয়ে যাবে, বুঝলে শ্রীযুক্ত স্বপ্নদর্শী!

ও ফিরল তাড়াতাড়িই। হাতে একটা টিনের কন্টেনার, যার মধ্যে সিনেমার ফিল্ম রাখে, সেরকম। সেটা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এর মধ্যে কী রোমাঞ্চকর জিনিস লুকিয়ে আছে, তা কল্পনাও করতে পারবে না!"

"কী আর হবে? মহাসমাপ্তির উপর কোনো ফিল্ম, যেখানে তোমাকে আর আমাকে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে আর তুমি চোখ মটকে হাসছ, ঠিক অ্যালিসের

চেশায়ার বিড়ালের মতো! তোমার পকেটে নিয়েছ ক্রু ড্রাইভার, রিলে আর ক্রু। তাও আবার পকেট থেকে পড়তে পড়তে যাচ্ছে! আর আমি! তুমি যে কাপটা সামোভার থেকে তৈরি বলে থাকো, সেটাকে অজগরের মতো জাপটে ধরে ভেসে চলেছি।"

"তোমার পক্ষে অবশ্য বলা সম্ভব নয়। আমিই বলে দিই, এটাকে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযোগপত্র বলতে পার। মানুষের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে ওই পুরোহিতরা কীভাবে তাদের বোকা বানায় সেটা দেখো। কিছু লোক ঠকানো হাতসাফাই আর রূপকথার গল্পের উপর ভিত্তি করে কেমন উড়ন্ত চাঁদের দেবীর সৃষ্টি হয়, তোমার তা অবশ্যই দেখা দরকার হে স্বপ্নদর্শী!"

ভিক্টর হো হো করে হেসে উঠল। যদিও আমার কাছে ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার নয়, তাই জিজ্ঞেস করলাম, "পুরোহিতরা শক্ত করে দড়ি টাঙিয়ে তার উপর হাঁটছে আর তুমি তার ছবি তুলেছ তা নিশ্চয়ই বলবে না?"

"তাদের ছবি না হলেও অনেক গোপন তথ্য এখন আমার কাছে পরিষ্কার।" ভিক্টর জ্ব নাচিয়ে বলল, "তুমি তো জানো অবলোহিত আলোর কামাল। আমাদের খালি চোখে যা দেখা যায় না, ওই আলোয় তা একেবারে দিনের মতো পরিষ্কার।"

আমি অবাক হলাম, এত কাণ্ড ঘটল কখন! জিজ্ঞেস করলাম, "এসব জোগাড় করলে কী করে?"

ভিক্টর হাসল। তারপর বলল ওর তদন্তের গল্প।

সেই রাতে ওদিকের পাহাড়ের মিনার, ওরা যেটাকে মৃত্যু-মিনার বলে, সেদিক থেকে যখন ওই আলোকিত 'চাঁদের দেবী' কে দেখা গেল, ও সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সরে যায় যাতে ওকে কেউ দেখতে না পায়। তারপর আমাদের পেরুনের উপর ক্যামেরাটাকে এমনভাবে নিয়ে বসে যাতে করে লেন্সের আওতায় দুটো মিনারই চলে আসে। ক্যামেরাটাকে পনেরো মিনিটমতো অটোমেটিক মোডে রেখে দেয়। ফলে দুটো মিনারের মধ্যে ভাসমান মূর্তির পুরো ছবিই উঠেছে।

আমি সেই সময় উত্তেজিত ছিলাম সেই উড়ন্ত নারীকে দেখে, যার আলোকোজ্জ্বল হাতদুটো ডানার মতো নড়ছিল উপর-নীচে, আলখাল্লার মতো একটা

পোশাক যার দুই ডানা কিম্বা হাত... যাই বলি না কেন, তার মধ্যিখানে ঝকমক করছিল, যার মুখটা চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ সাদা, দুই চোখ ঘিরে নীল রঙের বৃত্ত... বুঝলাম সেইজন্যই তখন গোলোয়েসেভকে আমার আশেপাশে খুঁজে পাইনি।

"তাহলে আমার দুঃসাহসী বন্ধু, তোমার ফিল্মে কী দেখিয়েছ?" ভিক্টর গোলোয়েসেভকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি দেখাব কেন? আরে বাবা, তোমার মতো না হলেও আমারও তো কিছু আবেগ টাবেগ আছে! যা দেখিয়েছে তা ওই আবেগহীন ক্যামেরা, আমি এখানে নিমিত্তমাত্র। এটুকু বলতে পারি, আমার যুক্তিকে আমার ক্যামেরা প্রমাণসহ সিলমোহর দিয়েছে। তবে আমাদের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে ওরা বোকা বানিয়েছে তার জন্য খারাপ লাগার কিছু নেই। আরেকটা জিনিসও পরিষ্কার হল। ওই গ্রেভাইরস বা যাই হোক, তার ব্যাপারে যেসব গল্প চালু আছে তা পুরোপুরি বাজে কথা।

ভিক্টর ওর ফিল্ম রাখা বাক্সটাকে এমনভাবে নাড়াল, যেন কোনো রাজা তার হাতির দাঁতের রাজদণ্ডটা নাড়াচ্ছে! তারপর বলল, "গতকালই ফিল্মটা ডেভেলপ করে পর্দায়। দেখলাম। আমি বার বার বলি অলৌকিক বলে কিছু হয় না। কোনো রঙ করা পাখি টান টান তারের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে, ব্যাপারটা তা নয়। মেয়েটি একটা রিঙের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এক মিনার থেকে আরেক মিনার পর্যন্ত রিঙের মধ্যে দিয়ে দড়ি একটা গলানো ছিল, যেটা দিয়ে ওকে টানা হচ্ছিল। দড়ির ফাঁসটা এমনভাবে বাঁধা ছিল, যা দরকারমতো ছোটোবড়ো করা যায় যাতে ওই রিঙটা পাক না খায়। মেয়েটা এদিকের মিনারে যেই পৌঁছে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের মিনারের কোনো অদৃশ্য শক্তি দড়িটাকে খাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে। তারপর যথারীতি আমাকে চিমটি কাটল। "তোমার মতো স্বপ্নালু লোককে বোকা বানানো বড়োই সহজ।"

"সব কথায় ঠেস না দিলে তোমার চলে না, তাই না? তবে এবার তুমি ছাড়ান পাচ্ছ না, বুঝলে হে কেভি-ভুক!"

"তোমার বোঝাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। একবার নিজের চোখে দেখো পর্দার

উপর কী ঘটছে, তখন বুঝবে কে কাকে কীভাবে বোকা বানিয়েছে। এস এ ঘরে।” গোলোয়েসেভ বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে নীচু হয়ে দরজা দেখাল। বলল, “ফিল্মটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখানোর বন্দোবস্ত করেছি। আমার চেনাশোনা আরও কয়েকজনকেও বলেছি। ওহ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার যে হতে চলেছে! একটা হইচই পড়ে যাবে।”

“তুমি বড়ো চালাক হে গোলোয়েসেভ, একেবারে জন্ম-বৈজ্ঞানিক! একদল বিজ্ঞানী আছে না, যারা জ্যান্ত ব্যাঙের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয় তা পরীক্ষা করে, তোমার অনুসন্ধিৎসাও সেরকম। এখন কথা হল, জীবনের রহস্যময়তার মধ্যে কতদূর পর্যন্ত উঁকি মারা উচিত? তুমি এই রহস্যের ব্যবচ্ছেদ করতেই পারো। খুব ভালো কথা, করো! কিন্তু মাথায় রেখো, প্রকৃতি তার গোপন রাজত্বের মধ্যে নাক গলানো পছন্দ করে না, একদিন তার প্রতিশোধ নেমে আসবেই। যারা দুর্গম পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, তারাও কিন্তু প্রকৃতির কাছে মাথা নুইয়েই সেখানে যায়, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নয়।” আমি উপর উপর শান্ত থাকলেও মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিলাম।

ভিক্টর আমার দিকে একটা বাঁকা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “তোমার কথাগুলো বেশ সুন্দর। কিন্তু তোমার প্রকৃতি-রানি কি শুধুমাত্র পুরোহিতদের ওইসব গালভরা মন্ত্রতন্ত্রের বদলেই মানুষজনকে উৎসাহ দেন? মানে, আমি বলতে চাইছি, ওই পুরোহিতরা কি মধ্যস্থতাকারী?”

“আঁধার-আলোর মাঝে যে মৃত্যুর কথা আসছিল ঘুরেফিরে, তাকে কি তোমার উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছিল? তোমার মনে হওয়ার উপরে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু যারা চাঁদের দেবীর রহস্যভেদ করতে চেষ্টা করেছে, তাদের পরিণতির কথা ভুলে যেও না। তারা কেউ বেঁচে ফেরেনি।”

ভিক্টর হেসে বলল, “স্বপ্নদর্শী! ওই মায়ামূর্তিকে তুমি বুঝতে পারোনি! আর ওদের কথার মধ্যেকার মারপ্যাঁচও ধরতে পারোনি। সমতলবাসী লোকজন ওদের ওই ‘সনাতন দৃশ্য’এর রহস্যভেদ করতে চেষ্টা করলেই যে শাস্তি পাবে, তা নয়!

শাস্তি দেওয়া হয়। চন্দ্রগ্রহণের রাতে। ভেবে দেখো, ব্যাপারটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক নয়। সেদিন ওই অশীতিপর মোড়লের পদকে কীভাবে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দেখানো হচ্ছিল, সেটা খুব ভালোভাবে লক্ষ করেছিলাম। হয়তো-বা একটু ঝুঁকিই নিয়ে ফেলেছিলাম।"

"তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, আমি কিছু বলতে যাব না। তবে একটা অনুরোধ, আমি একা ফিল্মটা দেখতে চাই, একদম একা, তুমিও থাকবে না। আরেকটা কথা, আমাকে স্বপ্নদর্শী বলা বন্ধ করো, বিরক্ত লাগছে।"

গোলোয়েসেভ ফিল্মের কন্টেনারটা টেবিলে রেখে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কেবিনের মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে, যেন কেউ কালি ঢেলে দিয়েছে। পোর্ট হোল দিয়ে দূরের দ্বীপ দুটোয় মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। এই দ্বীপ দুটো ক্যালাও বন্দরকে খোলা সমুদ্রের থেকে আলাদা করে তার ঝাঁপটা থেকে বাঁচাচ্ছে।

আমি কন্টেনারটাকে নিয়েই ডেকে উঠলাম। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে আমার লৌহ শকট। আমার আদরের পেরুন। মোটা কাছিতে বাঁধা। একেবারে সুরক্ষিত। ওর চকচকে গায়ে হাত বোলালাম পরম মমতায়।

নীচে নেমে কেবিনে ঢুকে আগে শার্সিগুলো বন্ধ করলাম কেউ যেন উঁকিঝুঁকি না মারতে পারে। এখন বন্ধ কেবিনে আমি আর ওই রহস্যময় কন্টেনারটা। যার মধ্যে আছে ভিক্টরের রহস্যন্মোচনের চাবিকাঠি।

ভিক্টরের কাহিনি আমার কৌতূহল জাগাতে পারেনি। বরং অস্বস্তি লাগছিল। এমন একটা অনুভূতি, যেন প্রতিযোগিতা শুরুর আগে পেরুনকে জেতানোর জন্য আমি আড়ি পেতে শুনে নিয়েছি প্রতিপক্ষের শলাপরামর্শ।

অবশ্য কৌতূহল যে একেবারে হচ্ছিল না, তা নয়। আবার লজ্জাও লাগছিল। আমি কি চুপিচুপি গ্রিনরুমের পর্দা সরিয়ে উঁকি মারতে চলেছি? অভিনয় শেষে পর্দা পড়ে গেছে, কুশীলব যে যার রঙ মুছে ফেলেছে, দর্শকহীন থিয়েটারে শুধু ইঁদুরদের কুটুর কুটুর।

ফিল্মটা প্লেয়ারে চাপালাম। এবার সুইচ অন করলেই, ব্যস! সমস্ত রহস্যের ইতি। হাতটা বাড়ালাম, কিন্তু সুইচ পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই কে যেন ভিতর থেকে বলে উঠল, "কী দেখতে চাও, গোললায়েসেভ ঠিক, না ভুল? কীসের রহস্যভেদ করবে? সেদিন যে রহস্যে তুমি মজেছিলে, তার পিছনে পার্থিব কোন সূত্র আছে জেনে কী লাভ?"

সত্যিই তো, প্রকৃতিতে কত ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, আপাত দৃষ্টিতে তার না আছে কূল, না কিনারা।

এই যে পরিযায়ী পাখির ঝাঁক, প্রতিবছর নিয়ম করে উড়ে যায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাহাড়, সমুদ্র ডিঙিয়ে, আবার ফিরেও আসে। কই, তাদের তো দিক ভুল হয় না! সে রহস্যের উত্তর কোথায়?

আমার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে তার কার্য-কারণ আজও আমার অজানা।

আমি তখন বেশ ছোটো। আমাদের পরিবার সেই সময় গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে। গ্রামে আমাদের কুকুর ছিল নার্কা, তাকে ওখানেই ছেড়ে আসা হয়। সাতদিন বাদে সাড়ে ছশো কিলোমিটার রাস্তা উজিয়ে শরতের তাইগা তৃণভূমি পেরিয়ে কীভাবে সে চলে এসেছিল আমাদের শহরের নতুন বাড়িতে।

আরেকটা ঘটনার কথা বলি। তখন কিছুটা বড়ো হয়েছি। অটোমোবাইল অ্যাকাঁদেমিতে ভর্তির যে শেষ পরীক্ষাটা ছিল, তার ঠিক আগের রাতের ঘটনা। সেদিনের পেপারটার উপর নির্ভর করছে আমি ভর্তি হতে পারব কি পারব না। স্বপ্নে যেন পুরো প্রশ্নপত্রটা দেখতে পেলাম! আর পরীক্ষা দিতে গিয়ে যখন প্রশ্নপত্র হাতে পেলাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে জ্বলজ্বল করছে স্বপ্নে দেখা তিনটে প্রশ্নএকেবারে হুবহু যেমনটি দেখেছিলাম!

আমার একটা ক্ষমতা অনেকবার টের পেয়েছি, বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতে গাড়ি চালানোর সময় সমস্ত অদেখা বাঁক, চড়াই-উত্রাই, পথে কোনো ধরনের বাধা আছে কি না, দুর থেকে আসা গাড়ি বা ট্রাক... যেগুলো বাঁকের আড়াল থেকে দেখতে পাওয়ার কথাই নয়, আমি সব আগে থেকে টের পাই। আমি জানি না, কী

করে এটা হয়!

আসলে এই পৃথিবীতে আমাদের চলার পথে এমন অনেক রহস্য, এমন অনেক ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা আছে, যা হয়তো জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রহস্যের ওড়নার আড়ালে একটু আধটু পরিচয়ের মধ্যেই তাদের সৌন্দর্য।

এই মহাবিশ্বে অনেক সভ্যতা জন্ম নিয়েছে, আবার অনেক সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে। তার একটা কারণ অবশ্যই পারমাণবিক ঘূর্ণি, যার সবটার নাগাল আমরা এখনো পাইনি। আর আমার ধারণা, আরেকটা কারণ অবশ্যই নিষ্ফলা যুক্তিজাল, যা পৃথিবীর শেষ রহস্যটাকেও গলা টিপে মেরে ফেলে। গ্রামের বাড়ির সবাই যদি একে একে চলে যায়, কী হয় তবে? ধীরে ধীরে সেই বাড়ির মৃত্যু ঘটে। যে মানুষের মনে কোনো আবেগ নেই, ভালোবাসা নেই, মনোজগৎ শুধুই শুকনো যুক্তিতে ঠাসা, তাকে কি আদৌ জীবিত বলা চলে?

আমি ফিল্মটা আবার কন্টেনারে ঢুকিয়ে ফেললাম। কেবিন থেকে বেরিয়ে ওটাকে নিয়ে ধীরেসুস্থে চলে গেলাম জাহাজের পিছন দিকে। রেলিংয়ের উপর একটু ঝুঁকে হাতটা সামনে বাড়ালাম। তারপর মুঠো আলগা করে দিলাম। আর দাঁড়ালাম না। পিছন ফিরে সোজা চলে এলাম আমার কেবিনে। 'ঝপাং' শব্দটা কানে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। চাঁদের দেবীর কলুষিত ছায়াএবার শান্তিতে ঘুমোও তুমি প্রশান্ত মহাসাগরের জলের নিচের নিশ্চিন্ত বিছানায়।

চাঁদের দেবী খাদ পেরিয়ে আলোর রথে চেপে আসতে থাকুক যুগযুগান্তর ধরে... মানবসভ্যতা বয়ে চলুক কাল থেকে কালান্তরে...

আমি আর দেরী করলাম না, পরেরদিনই কিউবার প্রথম প্লেন ধরলাম। তারপর ফিরে এলাম মস্কোতে।

গোলোয়েসেভ অবশ্য আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি যে, ফিল্মটা একবারও না দেখেই আমি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম।

একবার একটা পুরোনো ম্যাগাজিন থেকে একটা প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলাম। চলে আসার সময় সেটা ওকে দিয়ে এলাম। আমার যুক্তিশীল বন্ধুটি মহাসমুদ্রের এই

বিশাল পটভূমিকায় এবার রাতের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলা সঙ্গীহীন অ্যালবাট্রোসের কথা ভাবার বদলে নতুন কিছু ভাবতে থাকুক।

প্রবন্ধটা নিচে তুলে দিলাম।

চন্দ্রের রহস্যময় বল

ভরের দিক থেকে বিবেচনা করলে চাঁদ আর পৃথিবী এই দুই জ্যোতিষ্কের কেউই ফেলনা নয়। তাছাড়া মহাজাগতিক দূরত্বের নিরিখে এরা একে অপরের বড়োই কাছাকাছি। কাজেই এদের মধ্যেকার মহাকর্ষীয় বল যথেষ্ট প্রবল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চুম্বক যেমন লোহাকে নিজের দিকে টানে; তেমনি চাঁদও সাগর, মহাসাগরের বিপুল জলরাশিকে নিজের দিকে টানতে থাকে। ফলে কী হয়? সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ওঠে।

জোয়ারের সময় অনেক উপকূলেই বিশাপ বিশাল ঢেউ ওঠে। যেমন আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমের দিকে যে খাঁড়িগুলো আছে, জোয়ারের সময় কখনো-সখনো কুড়ি ফুট পর্যন্তও ঢেউ ওঠে! ফ্রান্সের ব্রিটানিতে জোয়ার আর ভাটায় জলস্তরের এতটাই পার্থক্য থাকে, যে জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেখানে বিরাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

তবে শুধুমাত্র সমুদ্রের কথা বললে ভুল হবে। চাঁদের মহাকর্ষীয় টান মহাদেশের উপরেও পড়ে। চাঁদের টানে মহাদেশের স্থলভাগ ২৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঠে যেতে পারে।

পৃথিবীর স্থলভূমি সব জায়গায় কিন্তু সমান পুরু নয়। যেসব জায়গায় পৃথিবীর মাটির আবরণ কম পুরু, চাঁদের টানে সেসব জায়গার মাটি ফেটে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

এমনকি আমাদের পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে যে বায়ুমণ্ডল, ওই একই কারণে সেখানেও জোয়ার-ভাটা খেলে। দেখা গেছে অন্য সময়ের থেকে পূর্ণিমা অমাবস্যায় বায়ুর চাপ প্রায় তিন মিলিবার কম থাকে।

এবার আরেকটা তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক।

সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে পরিমাণ আলো এসে পড়ে, তার একশো হাজার ভাগের এক ভাগ চাঁদের পিঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে। এই পরিমাণ সূর্যালোকে পৃথিবীর তাপমাত্রা এক ডিগ্রির দু-হাজার ভাগের একভাগ বাড়তে পারে।

মনে হতে পারে, এই সামান্য পরিবর্তন পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর আর কী প্রভাব ফেলবে?

আমরা এবার পিছিয়ে যাই প্রথম খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন ইতিহাসবেত্তা এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানী প্লিনির মতে, পূর্ণিমায় বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যায়, আর সেজন্য বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ কি শুধুই বিভ্রম? যুগ যুগ ধরে বহু মানুষ বিশ্বাস করেছে, চাঁদের কলার সঙ্গে আবহাওয়ার একটা যোগাযোগ আছে। কলা যত বাড়তে থাকে, আবহাওয়াও তত ভালো হয়। তারা কি সবাই ভুল?

দীর্ঘ সময় যাবৎ আবহাওয়াবিদরা এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। শেষপর্যন্ত আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী বিগত পঞ্চাশ বছরের পনেরোশো চুয়াল্লিশটা জায়গার ষোলো হাজার আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তাঁদের গবেষণা ছিল মূলত বৃষ্টিপাতের উপর। তাঁরা যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোন, তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁরা দেখেন পূর্ণিমা বা অমাবস্যার তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যেই বেশিরভাগ বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটেছে।

তাঁদের এই গবেষণা নিয়ে সারা বিশ্বেই একটা সংশয় তৈরি হয়। শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা আমেরিকার বিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সঙ্গে একমত হলেন। তাঁরাও বললেন, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরপরই সাধারণত বৃষ্টিপাত হয়।

আরেকদল বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন ঘূর্ণিঝড় নিয়ে। তাঁরা দুশো ঊনসত্তরটি আবহাওয়া স্টেশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে একটা মজার সিদ্ধান্তে পৌঁছন। তাঁরা দেখান, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা অন্যান্য সময়ের তুলনায় পঁচিশ শতাংশ বেশি থাকে।

ঘটনা হল, পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে এখনো আমরা

অন্ধকারে।

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতটি এইরকম:

মহাবিশ্বের ফাঁকা স্থান বলতে যাকে বোঝায়, তা আদৌ ফাঁকা নয়, বরং সেখানে রয়েছে মহাজাগতিক ধুলো, উল্কার ধ্বংসাবশেষ আর মৃত গ্রহ। হতে পারে, এইসব মহাজাগতীয় বস্তুর কিছু অংশ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে প্রথমে চাঁদের দিকে ধেয়ে আসে, তারপর পৃথিবীর অভিকর্ষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কারণ, চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অনেক প্রবল।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার সংস্পর্শে আর্দ্র বায়ু ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে এবং মেঘের সৃষ্টি হয় ও বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে।

আগেই বলা হয়েছে মহাসাগর, মাটির শক্ত আবরণ, বায়ুর চাপ, এমনকি তাপমাত্রাও চাঁদের টানে প্রভাবিত হয় এবং সম্ভবত মানুষ এবং পশুপাখির আচরণও।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

শামুক-জাতীয় প্রাণীরা জোয়ার আসার সময় তাদের খোলক ফাঁক করে রাখে আর জোয়ার নামার সময় খোলক বন্ধ করে। এইভাবে ওরা একদিনে প্রায় পঁয়ষট্টি লিটার জল হেঁকে ফেলতে পারে আর তার সঙ্গে প্রায় সাত কোটি কুড়ি লক্ষ অণুজীব জলের সঙ্গে ওদের দেহে ঢোকে, যেটা ওদের খাদ্য।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ওদের খোলকের এই গতিবিধি বোধ হয় জোয়ার-ভাটায় জলের চাপের পার্থক্যের জন্যে হয়।

এবার একটা পরীক্ষার কথা বলি।

ষোলোশো ষাট কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত থেকে শামুক সংগ্রহ করে অন্ধকার কাঁচের পাত্রে রাখা হয়েছিল। কৃত্রিমভাবে সেখানে সমুদ্রের চাপ এবং তাপমাত্রা তৈরি করা হয়েছিল। শামুকের খোলকের নড়াচড়া পর্যবেক্ষণের জন্য একটা যন্ত্র ওই পাত্রে রাখা হল।

ওই পাত্রে জোয়ার-ভাটার কোনো ব্যাপারই ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও শামুকের খোলক খোলা আর বন্ধ নির্দিষ্ট ছন্দ মেনেই হচ্ছিল।

চোদ্দ দিন বাদে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ঘটল। শামুকদের খোলক খোলা-বন্ধের ছন্দটা ঠিক তিন ঘণ্টা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এই পরীক্ষা থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়।

শামুকেরা তাদের এই নতুন বাসস্থানেও জোয়ার-ভাটার ছন্দের সঙ্গে তাদের খোলক খোলা-বন্ধের ছন্দকে মিলিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, শামুকের খোলক খোলা-বন্ধের ছন্দ চন্দ্রকলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিছু কিছু স্তন্যপায়ীর আচরণও চাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দেখা গেছে, গবেষণাগারের পরিবেশে ধেড়ে ইঁদুর পূর্ণিমা-অমাবস্যায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর নেংটি ইঁদুরের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা যায় পূর্ণিমায়।

পূর্ণিমা-অমাবস্যায় নয় লক্ষ প্রাণ ধ্বংস হয়েছে তা কি কাকতালীয়, না অন্য কিছু?

১৯৭৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। সন্ধে ৭টা ২৮ মিনিট। সাত থেকে আট মাত্রার একটা প্রবল ভূমিকম্প স্রেফ তিন মিনিটে আটটা জমজমাট শহরকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছিল।

সেই সময় চাঁদ, সূর্য আর পৃথিবী এক অক্ষরেখায় অবস্থান করছিল। অর্থাৎ এটা বলা খুব কি ভুল হবে যে চাঁদ এবং সূর্যের মিলিত প্রভাবে পৃথিবীর যে অংশের আবরণ কম পুরু, তা প্রভাবিত হয়েছিল?

একটা পুরোনো কথা আছে, সংস্কারও বলতে পারি। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় নাকি ভূমিকম্প হয়। এ-সংক্রান্ত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই। কারণ, আজ পর্যন্ত কোনো ভূ-পদার্থবিদ এ ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেননি। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাকে শুধুমাত্র কাকতালীয় বলাটা হয়তো ঠিক হবে না।

বিগত কয়েক দশকের কিছু ভয়াবহ ভূমিকম্পের দিকে নজর দেওয়া যাক।

২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০: মরোক্কোর শহর আগাদিরে একটা বড়ো মাপের

ভূমিকম্প হয়। যেখানে প্রায় বারো হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারান। সেদিনটা ছিল অমাবস্যা।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২: ইরানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে চার মিনিটে প্রায় বারো হাজার মানুষ মারা যান। পূর্ণিমা।

২২ মে ১৯৭০: সাংঘাতিক ভূমিকম্পে পেরুর ল্যান্ডস্কেপ বদলে যায়। এই বিপর্যয়ের বলি হন অন্তত ষাট হাজার মানুষ। পূর্ণিমা।

২৮ জুলাই ১৯৭৬: চিনে ভূমিকম্পের পর প্রায় আট লাখ মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মারা যান। পূর্ণিমা।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮: সকাল ৬টা ০৮ মিনিট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প হয়েছিল জার্মানির বাডেন-উয়োটেমবার্গে। এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক, মোটর রাস্তা বলে প্রায় কিছুই আর ছিল না। অমাবস্যা।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮: ভয়াবহ ভূমিকম্পে ইরানের তাবাস শহর আর তার সংলগ্ন চল্লিশটারও বেশি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমা তো বটেই, সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণও।

সমাপতন, না কুসংস্কার? কী বলব? নাকি পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে?

প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, স্মরণাতীত কাল থেকে চাঁদের সঙ্গে একটা রহস্যময়তা জড়িয়ে আছে। চাঁদের অধীশ্বরী দেবী সেলিনা মৃত্যুর দেবী শুধু নয়, উর্বরতার দেবী হিসাবেও পূজিত হন।

চাঁদের কলার এক অন্য তাৎপর্য আছে। এক অমাবস্যার পর থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত চন্দ্রকলার ক্রমশ বৃদ্ধি ও হ্রাস যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু এবং শেষপর্যন্ত অন্তর্ধানের প্রতীক।

প্রাচীনকালে রোমানরা বিশ্বাস করত, পূর্ণিমা বৃষ্টির লক্ষ্মণ বয়ে আনে, আবার স্পার্টানরা সবসময় পূর্ণিমায় যুদ্ধযাত্রা করত।

বর্তমানে যে ক্যালেন্ডার চালু আছে তা মূলত সৌর বৎসরের উপর ভিত্তি করে

তৈরি। ইতিহাসে প্রথম যে ক্যালেন্ডারের খোঁজ পাওয়া যায় তা কিন্তু ছিল চান্দ্র ক্যালেন্ডার।

এমন অনেকেই আছেন পূর্ণিমা রাত যাদের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেয়। প্রাচীন যুগে তো বটেই, এমনকি মধ্যযুগেও মানুষের বিশ্বাস ছিল চাঁদের প্রভাবে মাথাখারাপ হয়ে যায়। যে কারণে পাগল হয়ে যাওয়াকে চন্দ্রাহত হওয়াও বলা হয়। পাগলের ইংরাজি প্রতিশব্দ 'লুনাটিক' কথারও উৎস সেই চাঁদ, কারণ ল্যাটিনে চাঁদকে বলা হয় 'লুনা'।

মানুষের আচরণের উপর চাঁদের প্রভাবুএ বিষয়েও একটা গবেষণা হয়েছিল।

পঞ্চাশ জন ছাত্রের একটা দলকে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন যাবৎ পর্যবেক্ষণে রাখেন। প্রতি দু-সপ্তাহ বাদে বাদে তাদের মেজাজের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, প্রতি পূর্ণিমায় তাদের মেজাজ চরমে ওঠে, তারপর ক্রমশ শান্ত হতে হতে অমাবস্যায় একেবারে ঠান্ডা! ঠিক সেই ছন্দেই তাদের আভ্যন্তরীণ তড়িৎ বিভবও পালটাতে থাকে।

গোলোয়েসেভের মহামূল্যবান কন্টেনারের বদলে এই প্রবন্ধটা ওর কেবিনে রেখে এলাম। ওহ! ওর মেজাজের সঙ্গে একেবারে খাপে খাপে মিলে যাবে। প্রথমে আমার উদ্দেশ্য ছিল ওর পেছনে লাগা, কিন্তু তারপরে মনে হল, এই ভর্ৎসনাটা ওর পাওয়া উচিত। যেভাবে ও মহাজাগতিক চন্দ্রযোদ্ধাদের নিজস্ব জগতে নাক গলানোর চেষ্টা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য।

কিন্তু এখন ওইভাবে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ চলে আসার জন্য অনুতাপ হয়। সেদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চিত জানি, ওই যে মিনারগুলো দেখে এসেছিলামু তারা তাদের আকার দরকার মতো পালটে নেয়, আর বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। ওই অসামান্য রহস্যময় জগৎকে রক্ষা করার জন্য কারো কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

বাগানের দর্পণ

আমি খুব ভালো গল্প-বলিয়ে নই। সেই তিরতিরে শীর্ণ জলের ধারাটার পাশে

বসে লার্কাকে চন্দ্রযোদ্ধাদের গল্প বলছিলাম। অবশ্য খুব যে গুছিয়ে বলতে পারছিলাম তা নয়, অনেক খুঁটিনাটিই বাদ চলে যাচ্ছিল। আমার ইচ্ছে ছিল শুধুমাত্র লার্কাই এই গল্প শুনুক। কারণ, জানতাম আমার প্রতিটি কথাই ও খুব সহজভাবে নেবে।

"তোমার এই বীররসের গল্পটি খাসা। কিন্তু মুশকিল হল, তার প্রমাণ হিসেবে তোমার কাছে কি নেই।" তিমচিক একটা ধূর্ত হাসি দিয়ে বিড়ালের মতো টানটান হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর আবার শুরু করল, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ফিল্মটা প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে আর এটাও নিশ্চয়ই বলবে, ওই 'ভালোবাসার মিশ্রণ ভর্তি পাত্রটার গতিও একই হয়েছে! তবে এটা তুমি বলতেই পারো, ওটা সমুদ্রের নীচে মাছেদের খেলার জন্য ওখানে পাঠিয়েছ! ওর উপরটা চাটলেই টের পাবে ওরা এখন বাতাসেও ডিগবাজি খেতে পারছে। কেউ কেউ তো আবার উড়ন্ত পাখিদের সঙ্গেও দেখা করে ফেলবে! তবে হ্যাঁ, এসব ঘটবে শুধুমাত্র পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যায়! হা হা হা..."

লার্কা এমনভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল যেন মাথাটা ধরেছে। ওর রকম-সকম দেখে বুঝতে পারছিলাম আন্দ্রোজিনকে কিছু বলতে চলেছে। ওকে সে সুযোগ না দিয়েই আমি বললাম, "কথাটা অবশ্য একদিকে ঠিকই। আমি ওই পোড়ামাটির পাত্রটাকে ক্যালাওতে জাহাজের কেবিনে রেখেই চলে এসেছিলাম।"

আন্দ্রোজিন বেশ কায়দা করে লার্কার দিকে তাকিয়ে বলল, "এরপরেও তুমি তোমার এই অধম স্বামীটির দিব্যদৃষ্টির কথা স্বীকার করবে না লার্কা!"

"কিন্তু গোলোয়েসেভের সঙ্গে তোমার ঝামেলা মিটেছে?" লার্কা এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যেন আন্দ্রোজিনের কথা ও শুনতেই পায়নি।

"ঝামেলা তো কিছু হয়নি।" আমি খুব সহজভাবে বললাম, "একমাস বাদে আমার পেরুনকে সঙ্গে নিয়ে ও ফিরে এল। আর মজার ব্যাপার, ও দিব্যি গেলে বলল, আমি নাকি ওর সঙ্গেই ছিলাম! ওই ফিল্মে ইনকা গোল্ড কাপের শেষভাগ আর পুরস্কার বিতরণী ছাড়া আর কিছুই ছিল না৷এটাও শুনলাম ওর কাছে। আমি পাত্তা

দিলাম না। সেই সময় আমি পিরেনে নেকলেস কাপের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এবার আমার সঙ্গী অ্যাশট মেলকোয়েন। আর এবার গাড়িটাও আলাদা। সিলভার ফক্স।"

আন্দ্রোজিন হঠাৎ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান ধরল, "তাই তাই তাই... আমার সিলভার ফক্স চাই..."

তারপর যেন বিদ্রূপ করে বলল, "এখানে বসে থেকে কী হবে? এগোনো যাক লার্কার গোপন রহস্যের দিকে! হে হে... তবে যাই বলো বাপু, এইসব পাণ্ডববর্জিত জায়গার রহস্যের তুলনায় আমাদের রাশিয়ান রহস্য ঢের ঢের ভালো। তবে সেসব রহস্যের তো কোনো ভুল প্রমাণ নেই!" মুখচোখের বিশেষ ভঙ্গি করে আন্দ্রোজিন তার মহামূল্যবান বক্তব্য শেষ করল।

আন্দ্রোজিনের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে মাথা ঠান্ডা রাখা দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু মেজাজ হারানো চলবে না। তাই নিজেকে বার বার বোঝাতে লাগলাম, 'তিমচিকের কথায় কিছুতেই রেগে গেলে চলবে না। অন্যকে ব্যঙ্গ করা, তাদের কাজ নিয়ে মজা করা শুধু ওর শখ নয়, বরং বলা যায় এসব না করলে ওর পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। যেন এটাই ওকে জল হাওয়া যোগায়। এবার যদি ওকে বলি যে পত্রিকার জন্যে বেশ গুছিয় একখানা অভিযানের গল্প লেখো তো, তবেই বাছাধনের সব জারিজুরি বেরিয়ে যাবে। অন্যের ধারণা থেকে সাহায্য না নিলে তো এক কলম লেখা বেরোবে না! তবে হ্যাঁ, 'রসায়ন বিজ্ঞানের অবিনশ্বরতা...' এছাড়া ওর জীবনে আর কিছু রহস্যের জায়গা নেই।'

যাই হোক, আমরা আবার এগোনো শুরু করলাম।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর আমরা একটা সালফার প্রস্রবণের কাছে এসে পৌঁছলাম। ফিনকি দিয়ে গরম জলের ধারা বেরিয়ে আসছে মাটির তলা থেকে। এতটাই তেজে বেরোচ্ছে যে, সটান এক মানুষেরও বেশি উঁচু ফোয়ারা হয়ে বৃষ্টির মতো নীচে নামছে। এই জলের নীচে দাঁড়ালে শরীর জুড়িয়ে যায়, সব ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

তিমচিক অবশ্য স্নান করল না। একটা খাতায় খুব গম্ভীরভাবে কিছু লিখতে লাগল, যদিও লেখার মধ্যে খুব একটা যত্ন ছিল বলে মনে হয় না।

এখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারা হল। এবার তাস-আক্সু গিরিখাতের মধ্য দিয়ে পথ। সাদা পাথরের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে তাস-আক্সু নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। যেন পাথরেরই নদী! লার্কা বলল, "নদীর নাম সাদা-পাথুরে।"

লার্কার কথা অনুযায়ী এখান থেকে গন্তব্যে পৌঁছতে কম করে আরো দু-ঘণ্টা লাগবে। কাজেই এখন তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে, যেন অন্ধকার গম্ভীর হওয়ার আগে পৌঁছতে পারি।

পাথরের উপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলা।

আমি লার্কার ঠিক পিছনে ছিলাম। পাথরগুলো সমতল, কিন্তু বেশ পিছল। নদীটা আমাদের অনেক নীচে। তার মিষ্টি কুলুকুলু আওয়াজ কানে আসছে। নদীতে যেখানে স্রোত কম, সেখানে বেশ কয়েকবার মাছ দেখতে পেয়েছি। কাল মাছ ধরা যাবে।

আমি যেদিন এখানে এলাম, সেদিনই লার্কা আমাকে ওর একটা লাল রঙের খাতা দিয়েছিল পড়ে দেখার জন্য। আমাকে ও বলেছিল এই খাতাটার জন্যই আমাকে আলমা আটায় ডেকে পাঠিয়েছে। এটা পড়ে ওকে সাহায্য করতে হবে। খাতায় যা লেখা ছিল তা এখানে হুবহু তুলে দিলাম।

এখন এপ্রিল মাস চলছে। আজ, এই বসন্তকালে যে ঘটনার কথা লিখতে বসেছি তা সোজাসুজি গত আগস্টেই লিখে ফেলতে পারতাম। কারণ সেটা তখনই ঘটেছিল।

গবেষণা বলে, কোনো ঘটনা ঘটার এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষ তার খুঁটিনাটিগুলোর অর্ধেক জিনিসই মনে করতে পারে না। কিন্তু এ ঘটনাটা আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখতে চাইনি। একটু সময়ের দূরত্ব থেকে সেদিনের ঘটনাটা ব্যাখ্যা করব ভেবেছিলাম। যাই হোক, এত দিন পরেও সে ঘটনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল। শুধু এখন কেন, আমি বোধ হয় জীবনেও ভুলতে পারব না।

তিমচিকের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। আমাদের দু'জনেরই মনে হয় ওটা যেন স্বপ্ন ছিল, কিংবা হয়তো-বা স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন!

কবি লারমন্টভের 'স্বপ্ন' কবিতার কথা মনে পড়ে। যেখানে দেগিস্তান উপত্যকায় নিঝুম মধ্যাহ্নে ক্লান্ত নায়ক আধো তন্দ্রায় নিজেকে দেখতে পায়, যেন মারাত্মক জখম সে। স্বপ্নের মধ্যেই সে একটি অল্পবয়সী ঘুমন্ত মেয়েকেও দেখে। মেয়েটির স্বপ্নে আসে তার পরিচিত কারো মৃতদেহ... দেগিস্তান উপত্যকায় শুয়ে আছে নিঃস্পন্দ... তার বুকের ক্ষত থেকে কালচে রক্ত বেরিয়ে জমাট হয়ে আছে।

তাহলে এখানে নায়কের স্বপ্নের তিনটে স্তর, অথবা বলা ভালো, স্বপ্নত্রয়ী।

তিমচিক যথারীতি আমার পিছনে লেগেছিল, তবে ও একটা ব্যাপারে যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছিল সেটা বলতেই হয়। ঘটনাটা কাউকেই বলেনি। কারণ, আমি ঠিক এটাই চেয়েছিলাম। ঘটনাটা আড়ালেই থাকুক, এমনকি বাবাকেও বলব না। কিন্তু নিজের মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। একটা অস্থিরতা ছিলই।

নভেম্বরে তিমচিক হাঙ্গেরি গেল। আমি ওর সঙ্গে গেলাম না। বরং ঠিক করলাম, আমি যা দেখেছি তার উপর একটা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখব। আর সেজন্য শীতকালটা লাইব্রেরিতেই কাটাতে হবে। তবে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েও ত্রিশ পাতার বেশি এগোতে পারলাম না।

শুনেছি, পুবের দেশে নাকি একটা রোগ আছে। অতীতের দিকে অমোঘ টান। এমনকি অতীতের কিছু ঘটনা মনের মধ্যে থাকতে থাকতে এমন অবসাদ তৈরি করে যে, তার থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়। যেমন হয়তো এমন কেউ, যার সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার স্মৃতি জীবনভর পিছু ছাড়ল না।

আমি লিখে রাখতে চাইছি, কারণ তথ্যটা রাখা দরকার।

একেবারে গোড়ার থেকে শুরু করি।

সময়টা ছিল আগস্টের মাঝামাঝি। পর্বতারোহণের একটা শিবিরে ছিলাম সে সময়ে। দিব্যি চলছিল সবকিছু। পরের দিন তিনটে চূড়ায় সামিট করার কথা, যার

একটা মাউন্ট আভিসেনা।

আমাদের ট্রেনার জুমাগেলদিনভ ট্রেনিংয়ের সময় আমার উপর খুশিই ছিলেন। কাজেই আমি নিশ্চিত ছিলাম পরের দিনের সামিট দলে আমি থাকবই।

কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল না।

ঠিক আগেরদিন সন্ধেবেলায় ঠান্ডা লেগে একটু সর্দি মতন হল। ব্যস, আমি বাদ পড়লাম।

অবশ্য দোষ আমারই ছিল। কেউ জানত না, আগেরদিন দুপুরে, সূর্য যখন একেবারে মাথার উপরে গনগন করে আগুন ছড়াচ্ছে, সেই সময়ে চুপিচুপি নদীর বরফগলা জলে স্নান করেছিলাম।

খুব রাগ হল, খারাপ তো লাগছিলই। এই যদি মারাত নোকেন্তিয়েভিচ হত, এই সামান্য সর্দিকাশিকে পাত্তাই দিত না।

আর ওই সিসিলা আরকাদিয়েভনা, মোটা সাপের মতো চেহারা, আবার জামায় রেড ক্রস লাগিয়েছে! আহা! চেহারার কী বাহার খুলেছে! স্বভাবও তিরিক্ষি।

আসলে আমার উপর ওর রাগ আছে। আমার জন্মদিনে ইয়াকভ বরিশোভিচ প্রায় দুশোটা ডেইজি ফুলের এক মস্ত বড়ো তোড়া পাঠিয়েছিল আর তিমচিকও ওর স্বভাবমতো ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়িয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে ও সেটা ভালোভাবে নেয়নি।

সুতরাং পরদিন ভোরবেলা ওরা সাতজন আমাকে ছাড়াই বেরিয়ে গেল। আমার খুব অভিমান হল। নদীর পাশে বসে খানিক কাঁদলাম। আরও একবার স্নান করলাম। তারপর মনে মনে ঠিকই করে ফেললাম, পর্বতারোহণ থেকে একেবারে সরে যাব। আর সেটাই হবে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রতিশোধ।

এক সপ্তাহ বাদে ওরা বিজয়ীর আনন্দে ফিরবে, আর আমি বসে থাকব ওদের ফেরার পথ চেয়ে এই ভাবনাটাই আমার মনে চরম বিতৃষ্ণা তৈরি করল।

ভেবে দেখলাম, এখান থেকে থ্রি লেপার্ড পাসে নেমে যেতে আমার চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। এই নামার পথটা যথেষ্ট নিরাপদ, তাছাড়া খুব একটা

কঠিনও নয়। এই নদীটা যেখানে তাস-আক্সুতে গিয়ে মিলেছে, রাতে দিব্যি সেখানে তাঁবু ফেলা যাবে। জায়গাটা সালফার প্রস্রবণের থেকে একটু উপরে। ওখান থেকে আর একটু নামলে গাড়ি পেয়ে যাব। দিনে একটা লরি ওখানকার মেষপালকদের কাছে আসে।

আমি জিনিসপত্র রুকস্যাকে গুছিয়ে নিলাম।

একজনের থাকার উপযোগী একটা তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ আর কিছু খাবার। দুটো মাংসের টিন, এক টিন কন্ডেনসড মিল্ক আর কিছু রুটি ব্যস, আর কী দরকার!

একটা চিরকুট রেখে গেলাম ওদের জন্য। লিখে রাখলাম, জরুরি দরকারে লেপার্ড পাসের রাস্তা ধরে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে যেতে হচ্ছে।

এই রাস্তায় আমি বহুবার এসেছি। বিশেষ করে আমার ভাষাতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা পর্বতারোহণের ব্যাজ টেস্ট দিতে এসেছে, তাদের নিয়ে।

আবহাওয়াটা সেদিন ছিল চমৎকার, আমার রুকস্যাকটাও তেমন কিছু ভারী নয়। সূর্য ডোবার যথেষ্ট আগেই রাত্তিরে যেখানে তাঁবু ফেলব বলে ঠিক করেছি, সেখানে পৌঁছে গেলাম।

সাধারণত এইধরনের গিরিখাতের বাঁদিকের ঢালে তাঁবু ফেলা হয়। এখানেও চড়াইয়ের ঢালে আন্দাজ ষাট বর্গ মিটারের একটা প্রায় সমতল তাকের মতো ঘাসে ছাওয়া জায়গা খুঁজে বের করলাম।

জায়গাটা বড়ো সুন্দর। যেখানে তাঁবুটা লাগিয়েছি, তার পিছন থেকেই চড়াই শুরু হয়েছে। এখানে কুয়াশামোড়া ভোরবেলায় প্রথম সূর্যের রশ্মি বাঁকাভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে গোটা উপত্যকায়। নাচতে নাচতে বয়ে চলা নদীটার ফেনায় ফেনায় এসে পড়ে সূর্যের কিরণ। নদীখাতের গোপনতম খাঁজেও তার ছোঁয়া লাগে। সেই সৌন্দর্যে মনের কোনার সমস্ত দুঃখগুলো ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে যায়!

তাস-আক্সুকে আমি ‘নদী’ বললেও আদতে এখানে এটা একটা পাহাড়ি নালার থেকে বড়ো নয়। পাথরে পাথরে পা ফেলে দিব্যি এদিক থেকে ওদিকে চলে যাওয়া

যায়।

টিন থেকে খাবার বের করে আর গরম করার ঝামেলায় গেলাম না, ওই ঠান্ডা খাবার খেয়েই শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতেও দেরি হল না।

রাত্তির তখন ক টা জানি না, বোধ হয় মাঝরাত হবে, সাংঘাতিক একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। যেন কোন জন্তু গুমরে গুমরে গজরাচ্ছে! আমি যেখানে শুয়েছিলাম, সেই মাটিটা কাঁপতে লাগল ভীষণভাবে! গুম গুম করে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম আশপাশ থেকে।

এ তাণ্ডব অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। খানিকক্ষণ বাদে আবার সব চুপচাপ।

পাহাড়ের সঙ্গে যাদেরই একটু আধটু প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, তাদেরই ধ্বস সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়ে যায়। ধ্বসের আওয়াজ তারা প্রায় সবাই শুনেছে। কেউ কেউ ধ্বস নামতে দেখেছেও বটে।

আসলে দিনরাতের তাপমাত্রার বাড়া-কমার সঙ্গে পাথরেও সংকোচন প্রসারণ হয়। আর সেজন্যেই মাঝরাতে অন্তত পাথরের আচরণকে বিশ্বাস করতে নেই।

তবে ধ্বস একবার নামার পর সাধারণত ওই জায়গায় দ্বিতীয়বার আর বিপদের ভয় থাকে না। কাজেই আমি আবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সে রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

আমি যেন পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীকে দেখছি, অন্যান্য গ্রহের মধ্যে একটা উজ্জ্বল ফুলের মতোই ফুটে রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে একটা স্পন্দন রয়েছে... যেমন থাকে জীবিত প্রাণীর মধ্যে। আমি যত কাছে আসতে লাগলাম, দেখলাম... না, কী দেখলাম আগে বলব না। আগে বলি স্বপ্নে ঠিক কেমন করে আমি আস্তে আস্তে পথিবীর দিকে আসছিলাম।

আমি বসেছিলাম একটা আরাম-কেদারাতে, ওতে আবার দোলও খাওয়া যায়! আমার চারপাশে অনেকরকমের নাম না জানা ফুল ফুটে রয়েছে। ফুল শুধু নয়, এইধরনের গাছও আগে দেখিনি। এদের ডালপালা, কুঁড়ি, পাপড়ি সবকিছু আমার অচেনা। ফুলগুলো এমন মিলেমিশে আছে, দেখে মনে হচ্ছে একটাই মস্ত বড়ো ফুল

ফুটে রয়েছে!

গাছগুলোর মাথা আমার অনেক উপরে। যেন একটা বিরাট গামলার মেঝেতে বসে আছি! দেখতে পাচ্ছি, গাছেদের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙের ঢেউ মাথার উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে। উজ্জ্বল রঙে রাঙানো গহ্বরের মধ্যে বসে দেখছি সেই ঢেউ ক্রমশ মিশে যাচ্ছে দিগন্তে।

পৃথিবীতে দিগন্তকে আমরা উত্তলই দেখি, কিন্তু এখান থেকে দেখছি ঠিক উলটো। অবতল দিগন্ত।

আমি যেখানে বসে ছিলাম, আগেই বলেছি, সেটা একটা গামলার মতো। গামলার কিনারায় মৃদু ঔজ্জ্বল্য দেখা যাচ্ছে, অনেকটা ফসফরাসের মতো। সেই উজ্জ্বলতা বিনুনির মতো পাক খেতে খেতে কোন রহস্যময় জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতার সঙ্গে ক্রমশ মিশে যাচ্ছিল।

সে আশ্চর্য বাগান ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছিল। যেন ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বসে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি। যে মুহূর্তে মহাদেশের খাঁজ কাটা উপকূল আর দুই মহাদেশের মধ্যে ধরে রাখা মহাসমুদ্র নজরে এল, কেমন অস্থির লাগতে লাগল। মনে হল আমি আগুনের লেলিহান শিখা, আমার চারপাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে ব্রহ্মাণ্ডের ওলোট পালোট বাতাস বয়ে চলেছে...

আমার অস্থিরতা বেড়েই চলল, যখন দেখতে পেলাম শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে বিষাক্ত তীব্র নীল আলো পৃথিবীর বুকে ছোবল মারছে, এমনকি পৃথিবীর মাথায় সাদা বরফের টুপি পরা মেরু দুটোও রেহাই পাচ্ছে না। উহ, কী তীব্র, কঠিন সে আলো! সে আলোয় কোনো মাধুর্য নেই, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। জ্যোতিষ্কের কেন্দ্র থেকে বেরোনো যে তীব্র আলো কল্পনা করা যায়, এ আলো বোধ হয় সেরকমই।

হঠাৎ স্মরণে এল, যুগ যুগ ধরে আমার এই যাত্রা চলছে। সমস্ত জীবিত গ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আমার এই যাত্রা অনন্ত। কিন্তু যতবারই ওই সাংঘাতিক আলোর মুখোমুখি হয়েছি, এর পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গিয়েছি। এই আলোর বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী করতে হয় সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

অথচ বেশ মনে আছে কিছু একটা পদ্ধতি আছে এই আলোর বিপদ থেকে বাঁচার জন্য।

ঘূর্ণির গায়ে এখন বাদামি ছিট ছিট দাগ ফুটে উঠেছে। দাগগুলো একটু বাদেই কালো হয়ে গেল। আর আমার বাগানটা ঢেকে গেল এক ঝিলিমিলি আঁধারে।

এরপরেই ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। আমার স্লিপিং ব্যাগের চেনটা একটু খুললাম।

বেলা হয়ে গেছে। যদিও ঘন মেঘে আকাশ ছাওয়া, তাই বোঝা যাচ্ছে না। বাজ পড়ছে মুহূর্মুহূ। অথচ আজকের পূর্বাভাসে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না! অবশ্য আবহাওয়া দপ্তরের সেটাই দস্তুর, এতে আর আশ্চর্য কী!

এবার বেরোনোর জন্য তৈরি হতে হবে। তবে এই বৃষ্টি মাথায় করে বেরোনোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়, এর আগেও হয়েছে।

আমার বর্ষাতি যথেষ্ট ভালো, আর তার উপর পেরেক আঁটা বুট পরে নিয়েছি, কাজেই পা পিছলানোর ভয় কম। তবে দুঃখ একটাই। ভেবেছিলাম ব্রেকফাস্টের আগে একবার সালফার প্রস্রবণে স্নান করে নেব। কিন্তু এই আবহাওয়ায় সেটা হবে না। লোকে বলে, ওই প্রস্রবণে স্নান করলে অন্তত দু-কিলো ওজন তো ঝরবেই! আমার অবশ্য সেজন্য স্নান করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওই বেচারাদের কী যে হবে! যারা আমাকে ফেলে দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল পিক ক্লাইম্ব করতে! আবহাওয়ার যা অবস্থা, উপরে তো নির্ঘাত তুষার-ঝড় শুরু হয়েছে। আর একবার তুষার-ঝড় শুরু হলে কম করে দিন তিনেকের জন্যে আটকে যাবে তা একেবারে নিশ্চিত বলা যায়। এদিকের পাহাড়ে আগস্টে সাধারণত ঝড়বৃষ্টি হয় না, কিন্তু একবার শুরু হলে...

একটু দূরে কিছু কাঁটাঝোঁপ, তারপরেই রাস্তাটা সোজা নদীর দিকে নেমে গেছে। অনেকখানি উত্রাই এখানে।

কিন্তু কাঁটাঝোঁপ পর্যন্ত গিয়েই হতভম্ব হয়ে গেলাম। পথ কোথায়? সামনে একদম ফাঁকা! পথটাকে দুমড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বুঝলাম, গতকাল রাতের

ভূমিকম্পই এর জন্যে দায়ী।

নীচে তাকিয়ে দেখলাম পাথর পড়ে নদী আটকা পড়েছে। একটা বেশ বড়সড় জলাধার তৈরি হয়েছে ওখানে। তবে ঘন মেঘ থাকায় বুঝতে পারলাম না জলাধারটা ঠিক কতটা বড়ো।

কিন্তু আমি জানি আমার 'সাদা-পাথুরে' ঠিক ওর রাস্তা বের করে নেবে। মনে মনে বললাম, ওকে বাধা দেওয়া অত সোজা নয়। আর তারপরেই আমার বর্তমান অবস্থাটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার নীচে নামব কী করে? আমি এই জায়গায় আটকা পড়ে গিয়েছি! নদীখাত প্রায় সত্তর মিটার নীচে। ওখানে নামার রাস্তাটা আর নেই, অন্যদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে খালি হাতে ওঠা সম্ভব নয়। চড়াইটা প্রায় দেড়শো মিটার উঁচু আর এমন খাড়া যে পর্বতারোহণের সরঞ্জাম ছাড়া বেয়ে ওঠা অসম্ভব। কোনোভাবে নীচে নামার চেষ্টা করতেই হবে।

রুকস্যাকটাকে নামিয়ে ওর উপর বসলাম। এখন মাথা ঠান্ডা রাখতেই হবে।

আচ্ছা, মারাত ইন্নোকেন্তিয়েভিচের মতো নামকরা পর্বতারোহী এরকম অবস্থায় পড়লে কী করতেন? মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে চেষ্টা করলাম।

প্রথমত, ধৈর্য রাখো, সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করো। সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে।' জুমাগেলদিনভের গলা নকল করে নিজেকে বললাম।

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, এক সপ্তাহ কেটে গেল, কোনো সাহায্য এল না?' আমি নিজের গলায় বললাম।

অনুপস্থিত জুমাগেলদিনভের সঙ্গে আমার কথোপকথন চলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আপনারা পিক জয় করে আনন্দ করতে করতে ফিরে এলেন, ওয়াকিটকিতে শহরে সেই জয়ের খবরটা দিলেন, তখন হয়তো আমার খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করলেন। আর এসে দেখতে পেলেন খাবার, জল কিচ্ছু না পেয়ে আমি ওই কাঁটাঝোঁপের নীচে মরে পড়ে রয়েছি। কারণ আমার কাছে অতদিনের খাবার নেই, আর একফোঁটা জল পাওয়ার আশাই বা কী করে করব?"

এবার আসরে এলেন মারাত ইন্নোকেন্তিয়েভিচ, অর্থাৎ এবার আমি তাঁর ভূমিকায় নামলাম। তাঁর কণ্ঠ আমায় ভরসা জোগানোর চেষ্টা করল, 'অত হতাশ হওয়ার কী আছে? সামনেই কাঁটাঝোঁপ আছে, তার ফল খাবে, আর পাথরের গা চাটলে তোমার তেষ্টা মিটে যাবে। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, আর তা যদি নাও হয়, ভোরবেলায় শিশির জমে না! কাজেই পাথরের গা ভিজে থাকবেই। গা গরম রাখার জন্য শুকনো ঘাস, কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালো। সাহায্য না আসা পর্যন্ত এইভাবে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়। এ এমন কী কঠিন কাজ? এমনও তো হতে পারে যে, থ্রি লেপার্ডের দিক থেকে কোনো ট্রেনিদের দল এই পথ দিয়ে নদীর খাত বরাবর উপরে যাচ্ছে!

'কোনো আশা নেই।' আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'এত খারাপ আবহাওয়ায় কেউ কি উপরে আসে? আবহাওয়া খারাপ হওয়া মাত্রই সবাই নেমে গিয়ে যে যার বাড়ির পথ ধরবে।'

'ঠিক আছে, না হয় ধরেই নিলাম ওদিক থেকে কোনো আশা নেই। কিন্তু তাহলেও তোমার কাছে তাঁবু, তোমার স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক এগুলো তো আছে! নেহাত কোনোদিক থেকেই সাহায্য যদি না আসে, তবে ওগুলো ফালা ফালা করে কেটে ফেলল। জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা দড়ি বানাও। সুবিধাজনক কোনো পাথরে রিফ নট দিয়ে দড়ির একমাথা বাঁধো, তারপর দড়ি বেয়ে সিধে নেমে যাও নীচে।'

কিন্তু মারাত ইন্নোকেন্তিয়েভিচ স্যার, উপস্থিত আমার কাছে টিন ওপেনার ছাড়া আর কিছু নেই। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে তাই দিয়ে তাঁবুর কাপড় কাটা যায়। আচ্ছা না হয় আমি দাঁত দিয়ে তাঁবুর মোটা ক্যাম্বিস কাপড় ছিড়লাম, তা দিয়ে লম্বা দড়িও বানালাম। কিন্তু এইরকম ছেঁড়া কাপড় জুড়ে দড়ি বানিয়ে আমি কখনো দশ মিটারও ক্লাইম্ব করিনি, তো একেবারে সত্তর মিটার! অসম্ভব।'

'তাহলে চুপচাপ অপেক্ষা করো। তোমার কাছে ওয়াটার প্রুফ তাঁবু আছে। কাজেই থাকার চিন্তা নেই। শুধু একটাই কথা, ভরসা হারিয়ে কান্নাকাটি কোরো না।'

আজ যত সহজে একথা লিখছি, সেই সময় ব্যাপারটা তত সোজা ছিল না।

কাঁটাগাছের একটা বেশ বড়সড় ঝাড়কে সাবধানে পাকড়ে ধরে খাদের দিকে ঝুঁকে দেখতে গেলাম কোনো সরু ফাটল পাই কি না। সেরকম যদি কিছু পাই, তবে কোনোরকমে ঠিক টিকটিকির মতো নেমে যাব। নিদেনপক্ষে হামাগুড়ি দিয়েও নামতে পারব। কিন্তু রুকস্যাক সঙ্গে নিয়ে এভাবে নামা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রুকস্যাকটাকে উপর থেকে ঠেলে নীচে ফেলব। তারপর একবার নেমে গেলে ওখান থেকে নিয়ে নেব আমার সম্পত্তি!

কথায় আছে, নরকের পথ মসৃণ। আমার পায়ের তলার পথটাও একেবারে মসৃণ। নীচে যা দেখতে পাচ্ছি তা হল নিছক চকচকে পিছল পাথুরে গা। পা রাখা অসম্ভব।

আমার ডানদিকে একটা অদ্ভুত আকৃতির বোল্ডার পাহাড়ের গা থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আছে। বোল্ডারটা অন্য পাথরের মতো নয়, যেন একটা বিরাট স্ফটিকের অংশ। যার একটা দিক সেই আগেকার দিনের গ্রামোফোনের চোঙার মতো। এইদিকে পাথরের একটা কোনা পাহাড়ের গায়ে ঢুকে আছে। তাই আমি যেখানে আছি, ঠিক তার নীচে একটা অর্ধবৃত্তাকার জায়গা তৈরি হয়েছে।

এখানে পাহাড়ের রঙ উজ্জ্বল ধূসর, কিন্তু স্ফটিকটা সেরকম নয়। ওটা পাথুরে কয়লার মতো অনুজ্জ্বল কালো রঙের।

আমার ছোটবেলাটা কেটেছে কাবাসের ওসিনিকিতে। যেহেতু ওটা খনি অঞ্চল, কাজেই অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে আমিও এখানে ওখানে জমা হওয়া ধাতু-মলের স্তুপে চড়তাম। ওটা আমাদের একটা প্রিয় খেলা ছিল।

আচ্ছা! এমনও তো হতে পারে, এখানে আমাকে সপ্তাহভর আটকে থাকতে হল, আর সেই ফাঁকে কয়লার একটা মস্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেললাম!

এই বোল্ডারটা মাটির ভিতর কতটা সেঁধিয়ে রয়েছে কে জানে! হয়তো ওর নীচেই কয়লার স্তূপ, যুগ যুগ ধরে মাটির গহ্বরে লুকিয়ে আছে!

আমার একটা বদ অভ্যেস হল বাথরুমের আলো না নেভানো। তাই তো

তিমচিক তো সবসময়ই মনে করায়, আমাদের জ্বালানির ভাণ্ডার ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, কাজেই শক্তি নষ্ট করা একেবারেই অনুচিত। সভ্যতা যেদিকে যাচ্ছে, তাতে প্রত্যেক টন কয়লা বা পিট মূল্যবান। বরং যে খনিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পারলে সেগুলো আবারো খোলা উচিত।

যাই হোক, আমি যতদূর সম্ভব হাত বাড়ালাম। দেখি ওই স্ফটিক বোল্ডার পর্যন্ত হাত পৌঁছয় কি না। কিন্তু পারলাম না। বরং একটা আশ্চর্য ব্যাপার টের পেলাম। বোল্ডারটার একেবারে গায়ে, বলতে গেলে প্রায় এক সেন্টিমিটার দূরে একটা অদৃশ্য দেওয়ালে আমার বাড়ানো হাতটা বাধা পেল! আমি ঘটনাটার কোনো কার্য-কারণ খুঁজে পেলাম না। কীসের দেওয়াল ওটা? আমার আর ওই বোল্ডারটার মাঝে তো একটা মাকড়সার জাল পর্যন্ত নেই, তবে কীসে বাধা পেলাম? ভালো করে তাকিয়ে দেখি, পাথরটার গা একেবারে খটখটে শুকনো, সামান্য জলের দাগও নেই। অথচ খানিক আগে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেছে। যার রেশ এখনো চলছে। বৃষ্টিস্নাত পাহাড়ের গা বেয়ে জল ঝরছে টুপটুপ করে। এমনকি ওই রহস্যময় বোল্ডারটার আশেপাশেও সবকিছু ভিজে।

আমার কথাগুলো অনেকেই বিশ্বাস করবে না। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, যা দেখেছি, তাই লিখছি। হ্যাঁ, আবারো বলছি, এর একটা বর্ণও বানানো নয়।

হঠাৎ টের পেলাম, কারা আমাকে লক্ষ করছে। চোখ কচলে ভালো করে তাকালাম বোল্ডারের দিকে। সত্যি সত্যি একটা সোনালি রঙের বিস্ফারিত চোখ নজরে এল, বোল্ডারের কিনারা থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

রুকস্যাকটা আঁকড়ে ধরে পালাতে গেলাম। কিন্তু কোথায় পালাব, এখানে না আছে লুকোবার জায়গা, না পালানোর।

চোখটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। এখন ওটা প্রায় প্যারাস্যুটের মাথার মতো বড়ো। চোখের ভিতর থেকে গভীর সমুদ্রে ডাইভিংয়ের সময় যেরকম পোশাক পরে, সেরকম দেখতে মস্ত বড়ো একটা স্যুট ধীরেসুস্থে বাইরে এল। স্যুটটা ওই বোল্ডারের মতোই অনুজ্জ্বল কালো।

পা-দুটো প্রায় পাঁচ মিটার লম্বা, আর মাথার ব্যাস? এক মিটার তো হবেই!

এখন যতটা সহজে প্যারাস্যুটের মাথার মতো', 'এক মিটার, পাঁচ মিটার' এসব কথাগুলো বলছি, সেই মুহূর্তে এতসব সুস্থভাবে ভাবার মতো অবস্থায় ছিলাম না। একটা অসহায় ভয় আমাকে তাড়া করছিল। আমার তালিমারা উইন্ডচিটারের আড়ালে মনে হচ্ছিল আমি ক্রমশ পাথরে পরিণত হচ্ছি!

ওই দৈত্যাকার স্যুট এবার পুরোপুরি চোখের বাইরে বেরিয়ে এল, চোখটাও ছোটো হয়ে এল। স্যুটের মধ্যে কে বা কী আছে তখনো বুঝতে পারিনি। ওর পিছন পিছন একটা মোটা দড়ি বেরিয়ে এল। সেটার রঙও ওই একইরকমুঅনুজ্জ্বল কালো। আর একটু কাছে এলে দেখলাম, দড়ি নয়, খুব ঘন করে প্যাঁচানো স্প্রিং। স্প্রিংটা যেমন-তেমনভাবে বাতাসে পাক খাচ্ছিল।

ওই দৈত্যাকার অবয়বটা স্ফটিক বোল্ডার বরাবর ভেসে এল। আর ভাসতে ভাসতে আমার চোখের সামনেই পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল! প্রথমে একটা হাত, তারপর মাথা, আরেকটা হাত, ধীরে ধীরে পাসুদ্ধ গোটা দেহ পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু আগে কিছু যে ছিল, তার কোনো চিহ্নই রইল না, শুধুমাত্র ওই স্পিংটা ছাড়া। সেটা বাতাসে ভাসতেই লাগল। ও এত সহজে পাহাড়ের গায়ে ঝাঁপ দিয়ে মিলিয়ে গেল, যেমন আমরা সমুদ্রের উষ্ণতায় ঝাঁপ দিই।

একইভাবে আরো দু' জন ওই চোখের মধ্যে থেকে বেরোল, তারপর ভেসে এসে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে। যদিও প্রত্যেকের মিলিয়ে যাওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

এদের মধ্যে একজন বেরিয়ে এসে আবার চোখের মধ্যে ঢুকে গেল।

এরপর ওই ঢোকা বেরোনো চলতেই লাগল। অন্তত তিন ঘণ্টা ধরে এই কার্যকলাপ চলল। গোটা সময়টা আমি ভিজতে ভিজতে দেখে গেলাম ওদের কাজকর্ম। আমার মাথা কাজ করছিল না। নিজেকে বলছিলাম, এরকম হতে পারে না, যা দেখছি সব মনের ভুল! আর মনে মনে অদৃষ্টকে গাল পাড়ছিলাম।

ওই দৈত্যগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল অ্যানথ্রাসাইট কয়লা দিয়ে তৈরি। ওদের

দেখে যত না আশ্চর্য লাগল, তার থেকেও বেশি অবাক হলাম। ওরা আমাকে খেয়ালই করল না! কোনোভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করা তো দুরস্থান, মনে হল ওরা যেন আমাকে দেখতেই পায়নি!

আশ্চর্য! আমি কোনো পোকামাকড় কিংবা বুকে হেঁটে চলা গা ঘিনঘিনে সরীসৃপ নই! বরং তিমচিক যেমন ওর ভারী ভারী প্রবন্ধে লেখে, 'বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী', আমি তার একজন প্রতিনিধি। আর আমাকেই কোনো পাত্তা দিচ্ছে না! আমি যেন ওদের কাছে এই পাথর, নদী অথবা ওই কাঁটাঝোঁপের থেকে আলাদা কিছু নই।

আমার খুব রাগ হল। আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, "এই যে কয়লা স্যুটওয়ালা ডাইভারেরা, তোমরা পৃথিবীর পেটের ভিতর থেকে, না মহাকাশ থেকে এসেছ, তা জানার একটুও কৌতূহল নেই আমার। কেমন করে তোমরা তোমাদের ওই স্ফটিক নিয়ে এখানে এসে থানা গেড়েছ, তাও জানতে চাই না। কিন্তু তোমরা যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও তো বাপু। এখানে তোমাদের কীসের দরকার?"

ওদের তরফ থেকে কোনো উত্তর পেলাম না।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, পেটের মধ্যে যেন ছুঁচোর ডনবৈঠক চলছিল। খানিকটা ধাতস্থ হয়েছি, এখন আর তত ভয় লাগছে না।

তাঁবুটা লাগালাম, তারপর টিন খুলে মাংস বের করলাম। খুব হিসেব করে চলতে হবে এখন। তাই মেপে ঠিক অর্ধেক মাংস বের করলাম। তারপর রুটি দিয়ে গপগপ করে গিলে নিলাম। এত খিদে পেয়েছিল, যে আর চিবিয়ে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না। রুকস্যাকের একটা খাঁজে বৃষ্টির জল জমেছিল, তাই দিয়ে তেষ্টা নিবারণ করলাম।

বৃষ্টি তখনও টিপটিপ করে পড়ছে, আকাশ মেঘে কালো হয়ে রয়েছে। নীচের রোগা সোগা নদী এখন ফুলে ফেঁপে উঠে গর্জন করছে, পাথর পড়ে তার চলার পথ বাধা পেয়েছে, তাই বোধ হয় এত রাগ। এবার কী করা যায়। ভেবে ঠিক করলাম, এদের নামকরণ করব।

এদিকে ওই গ্রামোফোনের চোঙার মধ্যে থেকে ওদের যাতায়াত সমানে চলছে। কখনো কখনো ওদের হাতে প্যাঁচানো দড়ি, কখনো-বা ফিগার অফ এইটের মতো হাতলওয়ালা রুপোলী ত্রিশূল। কখনো ওদের হাতে বেলুন। তার মধ্যে আরও বেলুন। বেশিরভাগ বেলুনই কালো রঙের কোনো পদার্থ দিয়ে ভর্তি, তবে সেটা ঠিক কী বুঝতে পারলাম না।

বিকেল হল। দিনের আলো এবার ধীরে ধীরে মরে আসছে। আমার গা ভিজে চুপচুপ করছে, যদিও তাঁবুর ভিতর কিংবা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে জল ঢোকেনি। টিনের বাকি অর্ধেক মাংস দিয়ে আমার রাতের খাওয়া সেরে নিলাম। এবার ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে শোওয়ার তোড়জোড় করতে হবে। যদিও এই পরিস্থিতিতে ঘুম আসা অসম্ভব।

আমি নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, ‘হয়তো ওরা অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। হতে পারে এখন ওরা খুব ব্যস্ত। যেমন... আচ্ছা! কোনো দুর্ঘটনায় ওদের যান খারাপ হয়ে গেছে, তাই ওরা সেটা সারানোর চেষ্টা করছে, তাও তো সম্ভব? তবে, এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে যাতায়াতের যানবাহন যারা বানাতে পারে, তারা অবশ্যই রীতিমতন বুদ্ধিমান। তা আমার এই ভিনগ্রহী বুদ্ধিমান ভাইসকলের কি এটা খুব ভালো কাজ হচ্ছে? পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানব প্রজাতির একজন প্রতিনিধি বিপদে পড়েছে। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা কী বলে, তাকে সাহায্য করা উচিত কি না? তার উপর সে একজন কমবয়সী মহিলা বৈ তো নয়! এই গিরিখাতের মধ্যে সে আটকে পড়েছে। এমনও নয় যে পৃথিবীর অভিকর্ষ তোমাদের বাধা দিতে পারে, তোমরা তার আয়ত্বেই নেই। তবে কীসের ভয় তোমাদের? শুধুই কি আমাদের পৃথিবীবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ হলে কী অনর্থ ঘটতে পারে সেই ভয়?’ এসব সাতপাঁচ কথা নিজের মনে ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রা মতন এসে গেল।

চোখে সূর্যের আলো এসে পড়ায় তন্দ্রা কেটে গেল। বাইরে মুহুর্মুহূ বাজ পড়ছে। কী ভয়ংকর আওয়াজ! কানে তালা লেগে যায়। ভীষণ গরম লাগছে। দুপুরবেলায় সমুদ্রতটের বালির মতো তেতে রয়েছে তাঁবুর ভিতরটা। হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে

তাকালাম। এ কী! এখন সবে আড়াইটে, এসময় সূর্য!

তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখতে হবে কী ব্যাপার। গত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় আমার বিশ্রাম হয়নি। যাই ঘটুক, এরপরে ঘুমের আশাও আর করি না।

বাইরে এলাম। আলোটা সূর্যের নয়, রাত এখনো শেষ হয়নি। আলোটা আসছে একটা সোনালি রঙের পেল্লায় গম্বুজের মতো জিনিস থেকে। ওটা রয়েছে আমি যে গিরিশিরার নীচে আছি, তার উপর দিকে। উলটনো বাটির মতো জিনিসটা এত উজ্জ্বল, যে মনে হচ্ছে ওটা বুঝি সূর্যরশ্মি দিয়ে বোনা। এমনকি ওর ধার দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটাও নামতে দেখলাম, যদিও তা ওটার মধ্যে ঢুকছিল না।

এই মুহূর্তে বৃষ্টি পড়ছে না। তবুও তিয়েন শান পর্বতমালার গা বেয়ে জলের ধারা নামছে, রাতের আকাশকে এফোঁড়ওফোঁড় করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার সঙ্গে বাজের গর্জন।

যেখানে একটা ছোটো ধারা আমার ওই 'সাদা-পাথুরে' তে গিয়ে মিশেছে, সেখানে একটা অতি ক্ষুদ্র সূর্য উঠেছে দেখছি! মুহূর্তে আমার ভিজে তাঁবু, উইন্ডচিটার, এমনকি জুতোটুসব শুকিয়ে গেল।

স্ফটিকের রঙ এখন রুপোলী, তার মধ্যে মৃদু ঔজ্জ্বল্য, অনেকটা ফসফরাসের মতো। এর মসৃণ বাঁকানো প্রান্ত এখন বেশ স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ অঞ্চল দিয়ে ভিতরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভিতরে অনেকরকমের নাম না জানা ফুল ফুটে রয়েছে। ফুল শুধু নয়, এইধরনের গাছও আগে দেখিনি। এদের ডালপালা, কুঁড়ি, পাপড়ি সব কিছু আমার অচেনা। ফুলগুলো এমন মিলেমিশে আছে, দেখে মনে হচ্ছে একটাই মস্ত বড় ফুল ফুটে রয়েছে! ভিতরে না আছে ছাদ, না মেঝে। এমনকি একটা তলা থেকে আরেকটা তলা, কিংবা একটা কক্ষ থেকে আরেকটা কক্ষকে আলাদা করার মতো কোনো ছাদ বা দেওয়ালের পার্টিশন নেই। সে ভাগটা হছে বিভিন্ন-রঙা বক্ষশীর্ষের সাহায্যে। সে গাছগুলোর দোলায় নানা রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সেই ঢেউই বিভিন্ন স্তরকে ভাগ করছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল, স্ফটিকের মধ্যের গভীরতা। তার মধ্যে উপর বা নীচে তাকালে কোনো তল দেখা যায় না, যেন তার কোনো সীমানা নেই,

অসীম পর্যন্তই তার বিস্তৃতি।

আমি চমকে উঠলাম। আরে! এ তো আমার স্বপ্নে দেখা সেই আশ্চর্য বাগান! সেই অচেনা গাছ, অচেনা ফুল-পাতা-কুঁড়ি... কোনোভাবে সেই আশ্চর্য বাগান এখন আমার চোখের সামনে, যদিও তা ধরাছোঁয়ার বাইরে।

দেখতে পাচ্ছি তিনজন স্পেস স্যুট পরা লোক, যেমনটি আগে দেখেছিলাম তেমনই, কিন্তু এদেরও রঙ পালটে এখন রুপোলী হয়ে গেছে। ফুলগাছের জঙ্গলে ভেসে ভেসে বেলুন, তার মধ্যের বেলুন, ত্রিশূল, প্যাঁচানো দড়ি সেগুলো নিয়ে কী যেন করছে।

আমি কাঁটাঝোঁপের তোয়াক্কা না করে ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে জন্তুর মতো চার হাতে পায়ে গুঁড়ি মেরে ওই স্ফটিকের দিকে এগোতে লাগলাম। ঝোঁপের কাঁটায় আমার হাত-পা-মুখ সর্বত্র ছড়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। যাই হোক, আমাকে আরও কাছে যেতেই হবে।

ওরা ওই মিষ্টি, ঘুম ঘুম বাগানে একমনে কাজ করেই যাচ্ছিল, কিন্তু কাজটা যে কী বুঝতে পারলাম না। স্ফটিকের মহাজাগতিক গভীরতায় একটা ডিম্বাকৃতি আকার দেখা যাচ্ছে, আর সেখানেই বেশিরভাগ গাছের মাথা জড়াজড়ি করে দোল খাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে কে বলে উঠল, পৃথিবীর আকাশে তারার ঝাঁক যেমন সযত্নে ধ্রুবতারার নিশ্চলতাকে রক্ষা করে, তেমনই গাছের দঙ্গলের শীর্ষভাগ আয়নার মতো কিছুকে রক্ষা করছে।' মনে হল আয়নার মধ্যে চাপ চাপ কুয়াশা, তার মধ্যে অদ্ভুত একটা জগৎ পাক। খাচ্ছে, জোড়ায় জোড়ায় অথবা এয়ী তারার দল ঘুরপাক খাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রহ সেই তারা-মণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আর এই মহাজাগতিক বিশৃঙ্খলার ঠিক মাঝখানে আছে মসৃণ রুপোলী ঘূর্ণি।

পরক্ষণেই অবাক লাগল। এই অদ্ভুত ভাবনা আমার মনে এল কী করে? এটা কি আদৌ আমার নিজের চিন্তা?

"এই আশ্চর্য বাগান ওই ঘূর্ণি-যানের ইঞ্জিন।" কথাগুলো যেন দৈববাণীর মতো আমার মাথার মধ্যে ভেসে এল। "ইঞ্জিনে কিছু গোলমাল হয়েছে, ওরা সেটা

সারানোর চেষ্টা করছে।”

আমি স্পষ্ট টের পেলাম। কিন্তু আমি কীভাবে ওদের সাহায্য করতে পারি?

এই মধ্যরাতে সূর্যের মতো আলোয় চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাসের আড়ালে আমি লুকিয়ে রয়েছি। অবশ্য কার কাছ থেকে লুকোতে চাইছি জানি না, কারণ এই প্রান্তর জনমানবহীন। কথাগুলো আমার মনের মধ্যে যেভাবে আপনাআপনি চলে আসছে, তা আমার কাছে বিশাল রহস্য।

যেই মুহূর্তে আশ্চর্য বাগানটাকে ইঞ্জিন বলে মনে হল, তার পরেই আমাদের চেনা জগতের চেনা বেশ কিছু ঘটনা আমাকে অবাক করল। মনে হল, শীতের শূন্যতার ঠিক আগেই শরতে কেন গাছপালা এত জীবন্ত হয়ে ওঠে? কেন আপেলের মধ্যেটা রসে টইটম্বুর হয়ে ওঠে, ফল তার পূর্ণতা পায়, মাঠ-ঘাট সতেজ সবুজে ছেয়ে যায়? তারপরেই মনে হল, গাছপালার এই স্পন্দন পৃথিবীর স্পন্দনেরই প্রতীক।

একটা অন্যরকম বোধ আমার মধ্যে জন্ম নিল। মনে হল, পৃথিবীর প্রাণ-মণ্ডলী মহাবিশ্বের সার্বজনীন প্রাণ-প্রবাহের ক্ষুদ্র অংশ বৈ নয়।

ব্রহ্মাণ্ডের অসীম বিস্তার আমার অনুভবে এসে ধরা দিল। সূর্যের আলোর স্পর্শে যেমন কুঁড়ি পাপড়ি মেলে, তেমনি বিশ্বের স্বরূপ ধীরে ধীরে আমার সামনে উন্মোচিত হল।

মানবদেহ হোক অথবা বিশ্বপ্রকৃতি, স্বাধীন কেউই নয়। ক্ষুদ্র অংশগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত। এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা সর্বাঙ্গীন, দেশকালের অতীত। একের মধ্যে বহু আর বহুর মধ্যে একের প্রকাশ...।

ওই যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড, আমি তো তার একটা অংশ, আবার সেই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডকে আমারই অংশ বলতে পারি।

অকল্পনীয় কোনো সৌন্দর্যের জগতের দূত ওই স্ফটিক পাথরটা। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওদের স্থান-কাল কিছুই বোধ হয় মেলে না। এই দুই জগৎ পরস্পরের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওদের আভাস পাচ্ছি। কিন্তু যোগাযোগের কোনো

উপায় আমার জানা নেই। যেন পরস্পরকে ছেদ না করা দুটো সমান্তরাল স্তর, যারা কখনোই মেলে না।

কতক্ষণ ওই ঘাস-পাতা-ফার্নের আড়ালে শুয়ে এইসব ভাবছিলাম কে জানে? তবে এখন মনে হয় সেই সময়টুকু আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়।

কখন আকাশ কালো করে এসেছে টের পাইনি। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি দৌড়ে তাঁবুর নীচে ঢুকলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা ভাঙল বেশ বেলায়।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, কপালের দু-পাশের রগ দপদপ করছে। তাঁবুর কাপড়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার রুকস্যাক, বুট আর উইন্ডচিটারের কী হাল কে জানে!

তাড়াতাড়ি উঠে সেগুলোর খোঁজ নিতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, তারা একেবারে শুকিয়ে গেছে, সামান্য স্যাঁতস্যাঁতে ভাবও নেই্ সেগুলো যে আদৌ ভিজেছিল বলেই মনে হচ্ছে না! তাহলে প্রমাণ হল যে রাতের সূর্য শুধুমাত্র আমার কল্পনা নয়!

স্ফটিকের 'চোখ' খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলছে... সমানে এই খোলা-বন্ধ চলছেই। আর ভিতরে ওরা ব্যস্তসমস্তভাবে কাজ করছে।

যৎসামান্য যা খাবার ছিল, তাই দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারলাম। যেভাবেই হোক ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?

ভাবতে ভাবতে একটা মতলব মাথায় এল। ভাবলাম, পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায়, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে।

ওই স্পেস-স্যুটওয়ালারা তো এটাও জানে না যে আমারও বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। ওদের বোঝাতে হবে যে আমিও নেহাত ফেলনা নই।

চোখটা এখন ক্রমশ বিস্ফারিত হচ্ছে। এটাই সঠিক সময়। আমি ছুটে গেলাম খোলা চোখ বরাবর। যদিও ভয়ে তখন এত জোরে বুক ঢিপঢিপ করছে যে মনে হচ্ছিল বুঝি এই মুহূর্তে তা দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে!

একটু সামলে নিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "এই যে নক্ষত্রলোকের ভ্রাতাসকল!

তোমাদের অভিবাদন! এই যে শুনছ আমার...” ঠিক উপর দিয়ে একজন ভেসে যাচ্ছিল, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে বললাম, “আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে? বড়ো বিপদে পড়ে গিয়েছি।”

কিন্তু কে শোনে কার কথা? লোকটা আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত! সামান্য দুলতে দুলতে বাতাসে ভেসে বেরিয়ে গেল। তারপর ভূতের মতো পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘আচ্ছা! ওহে ভিনগ্রহী বন্ধুরা! আমি এত সহজে হার মানার লোক নই।’ মনে মনে বললাম। কিন্তু তারপর আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ওদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলাম, “ভেবেছটা কী? আমি ডানাভাঙা পাখি? আমাকে অত দুর্বল ভেবো না। আমাদের পরম্পরা সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে তোমাদের? কত মহান সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন! সেসব সাহিত্যের একটারও নাম জানা আছে? সেই দ্বাদশ শতকের ‘দ্য লে অফ ইগরস হোস্ট’, নিকোলাই গোগোলের ‘তারাস বুলবা’, মিখাইল বুলগানভের ‘দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা’, শোকোলভের ‘কোয়ায়েট ক্লোজ দ্য ডন’, আর কত নাম করব! প্রাচীনকালে যখন পুবদিক থেকে যাযাবর লুঠেরার দল আর পশ্চিম থেকে যুদ্ধবাজেরা আমাদের দেশকে আক্রমণ করত, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তখন বাঁধ তৈরি করে দেশকে বাঁচিয়েছিলেন। স্পেনের আক্রমণকারী পিসারো, কর্টেস দক্ষিণ আমেরিকা জয় করতে যাওয়ার পথে সবকিছু শেষ করে দিয়েছিল, মানুষের দুঃখের সীমা ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশের পুরোনো মানুষেরা জানতেন বন্ধুত্বের মূল্য। একটা পুরোনো প্রবাদ আছে, ‘ভুল পথে পা বাড়ালে কখনোই ফেরত আসা যায় না। এর থেকেই বোঝো, তাঁরা কতটা নীতিপরায়ণ ছিলেন।”

পরিস্থিতি কিছুমাত্র পালটাল না। আমি তাঁবুতে ফিরে এলাম। এবার কী করি?

কিচ্ছু করার নেই। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য নোটবইয়ের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে পেনসিল নিয়ে আঁকিবুকি করাই ঠিক করলাম।

প্রথম পাতায় আঁকলাম সৌরজগতের ছবি, যদিও সবকটা গ্রহকে ঠিকঠাক

বসাতে পারলাম না। পরের পাতাটায় স্কুলে শেখা পিথাগোরাসের উপপাদ্যের ছবি আর বিবৃতিটা লিখলাম। যত্ন করে একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম, উপপাদ্যে যেমন আছে তেমনভাবে প্রত্যেকটা বাহুর উপর বর্গক্ষেত্র আঁকলাম। পাতার বাদবাকি জায়গায় আঁকলাম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ছবি। তিন নম্বর পাতায় রকেটের ছবি আঁকা গেল। ভিতরে একটা মানুষের ছবিও দিলাম। এই ছবিটা বেশ ভাবনাচিন্তা করে আঁকলাম, একদম প্রথম চাঁদে পাঠানো রকেটটার মতোই দেখতে হল। চার নম্বর পাতায় ভাবলাম উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধ আঁকব। কিন্তু এইটুকু পাতায় দুটো গোলার্ধকে খুব কষ্টেসৃষ্টে ধরাতে হল, তবে অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকাকে খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিল। আমার বিদেশি দামি আইশ্যাডো দিয়ে দুই গোলার্ধকেই নীল আলোময় করে দিলাম। একবারের

জন্যও মনে হল না, ওটা এভাবে খরচ করার জন্য নয়।

এবার কী করি? আমি নিজের মনেই বিড়বিড় করলাম, 'তোমরা আবার পরামাণু বোমার স্বপ্ন দেখতেই পারো, হয়তো সেটাই তোমাদের মতলব। কিন্তু এ ভাবনা মনের কোনায়ও ঠাঁই দিও না, তোমাদের ওই জাদু-বাগান আমার এই লোহা বাঁধানো লাঠি দিয়ে তছনছ করে দেব। নিষ্ঠুর পুতুলের দল!

আর একটা ছেঁড়া পাতা বেঁচে ছিল। কী আর করি, তার উপর গোটা গোটা ল্যাটিন অক্ষরে একটা রাশিয়ান প্রবাদ লিখে ফেললাম। তবে তার মধ্যে দু-চারটে ভুল থাকলে আশ্চর্য হব না।

ঘঊচজঅঠউঙঔ ঠঊঝ ঝঠঊঞ চজঙঔঊঊঔঙঝঐ উঅ ঘঅঝঅউ ঘঊ ঠঊজঘঔঙঝঐঝঔঅ (মিথ্যে যতই চকচকে হোক, তা আপনাকে সুখ দিতে পারে না।)

ওরা বুদ্ধিমান হলে ঠিক এর মানে উদ্ধার করবে।

জামাকাপড় নোংরা, খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়িসুষ্ঠু জ্বলছে, আমার অবস্থা আর কী বলব। একহাতে আমার ওই লোহার খুর লাগানো লাঠি, আর আরেক হাতে ছেঁড়া কাগজগুলো নিয়ে বাইরে এলাম। ওদের সঙ্গে যেভাবেই হোক আমাকে যোগাযোগ

করতেই হবে।

ধীরেসুস্থে হেঁটে এলাম স্ফটিক পাথরের যে দিকটা গ্রামোফোনের চোঙার মতো, সেদিকটায়। আগের মতোই, কেউই আমায় লক্ষ করল না। উপায় নেই, আমার দিকে ওদের নজর ফেরাতেই হবে।

সামনে যে লোকটা ছিল, তার পা লক্ষ করে হাত চালালাম। বেশ জোরেই চালিয়েছিলাম। দুম করে হাতটা গিয়ে ওর পায়ে লাগল।

আর হ্যাঁ! আমার উদ্দেশ্যও সফল হল।

লোকটা নিজের পায়ের দিকে তাকাতে আমার উপর নজর পড়ল। তারপর নেমে এল অনেকটা নীচে। এখন আমার মাথার ঠিক উপরে ভাসছে ও। ওর হাতদুটো আমার মাথার থেকে বড়োজোর দু-মিটার উপরে। স্পেস-স্যুটের হেলমেটের আড়ালে ওর মাথাটা অন্ধকারের মতো লাগছে। আমি সেদিকে লক্ষ করে হাতের কাগজগুলো ছুঁড়ে দিলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম, কাগজগুলো হেলমেটের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! লোকটাও সেই জ্বলন্ত চোখের মধ্যে ঢুকে গেল। গেল তো গেলই! আমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম ওই চোখের দিকে, প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল। কেউ বেরোলো না।

তখন রীতিমতো হতাশ লাগছে, আমার হাতে আর কোনো উপায় নেই। আর কী করতে পারি?

শেষপর্যন্ত একজনকে বেরোতে দেখলাম চোখ থেকে। দেখা যাক, আমার দুঃসাহসী পরীক্ষার কী ফল হয়।

লোকটার হাতে একটা কোদালের মতো জিনিস। অবশ্য কোদাল না বলে জিনিসটাকে বেশ বড়োসড়ো কেকের স্লাইস বললে আরও ঠিক বলা হয়, তিন মিটার-মতো লম্বা।

লোকটা আমাকে ওই ওটা দিয়ে স্ফটিকটার দিকে ঠেলতে লাগল।

“এই যে স্পেস-স্যুট দাদা! ঠেলার দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে চাই!”

আমি বললাম, “তোমাদের মতো যদি ভেসে যেতে পারতাম আমিই যেতাম, দরকার হলে ঝাঁটার কাঠিতে চেপেই যেতাম। এখান থেকে মুক্তি পেতে হলে তোমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা বিশেষ দরকার।”

আমি আমার মতো বকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল করলাম, লোকটা মোটেই আমাকে স্ফটিকের দিকে ঠেলছে না, আসলে ঠেলছে খাদের দিকে!

“আরে আরে! করছ কী ভিনগ্রহী জানোয়ার! আমি তোমাদের মতো উড়তে পারি না। নীচে পড়ে ছাতু হয়ে যাব! আমার যদি কিছু হয়, তোমরাও কিন্তু পার পাবে না!” আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম।

আশেপাশে যেসব বড়ো বড়ো ঝোঁপঝাড় ছিল সেগুলো আঁকড়ে কোনোমতে নেমেই দৌড় লাগালাম তাঁবুর দিকে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। জানি না কেন ওরা আমার পেছনে লেগেছে। যেন আমাকে শেষ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে ওরা! দেখলাম, তাঁবুর পেরেক-টেরেক উপড়ে সবসুষ্টু হাওয়ায় ভাসছে!

ওই ভিনগ্রহী আমার পেছন ছাড়ল না, গরু খেদানোর মতো করে তাড়াতে তাড়াতে আবার একেবারে খাদের ধারে এনে ফেলল। হাত-পা নেড়ে ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ধ্বসের ওপারে যেতে চাই ঠিকই, কিন্তু আমি তো বাতাস কেটে হেঁটে যেতে পারব না। এই খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে দড়িদড়া, মই, পিটন, ক্যারাবিনার এসব ছাড়া খালি হাতে নামতে চেষ্টা করলে বিশেষ কিছুই হবে না, স্রেফ আমার পশুপাখিতে খুবলানো, থেঁতলানো দেহটা ক' দিন বাদে হয়তো কেউ খুঁজে পাবে ওই নীচে।

স্পেস-স্যুটধারী স্বচ্ছন্দে আমার উদ্যত আঙুলটা ধরে ফেলল, তারপর সযত্নে আবার বসিয়ে দিল সেই কালো রঙের কেকের স্লাইসের মতো আসনটায়। ওটা ক্রমশ সেই কাঁটাঝোঁপ পেরিয়ে খাদের দিকে এগিয়ে চলল। আমি তখন কাঁটাঝোঁপ পেরিয়ে পাহাড়ের খাড়া দেওয়ালের দিকে আরও প্রায় তিন মিটার চলে এসেছি। আমার নীচে সেই খাড়াই খাদ! ও আমাকে কেক স্লাইস আসনটাকে এমনভাবে হেলাচ্ছিল যেন আমি গড়িয়ে পড়ে যাই। ওর মতলব ভালো নয়, বেশ বুঝতে

পারছি।

আটকাতে পারলাম না শেষপর্যন্ত। আমি গড়াতে শুরু করলাম। বেশ বুঝতে পারছি আর রক্ষা নেই। ভয়ে, আতঙ্কে ওকে অভিসম্পাত দিতে থাকলাম, "অসভ্য আগন্তুকের দল, বার বার তিনবার অভিশাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মর..."

কিন্তু আমি খাদে পড়লাম না।

আমার নীচে একটা অদৃশ্য রবারের মতো স্তর, অল্প অল্প ঝাঁকুনি লাগছে।

না, ভয় আমি পাইনি, কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন কীভাবে নাকাল হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি সাজানো গোছানো একটা সভায় উপস্থিত হয়েছি একেবারে উলঙ্গ অবস্থায়। সভার মান্যগণ্য অদৃশ্য নারী ও পুরুষবৃন্দ আমাকে দেখে হাসছে। তাদের হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার প্রতি একরাশ ঘৃণা।

আমি হাত বাড়িয়ে কেক-স্লাইসটাকে ধরতে গেলাম। ওর একটা কোন ধরতে পারলেও আমি ঝুলে পড়ব, কিন্তু সে হতভাগা ততক্ষণে আমার নাগালের বাইরে। যেন দূর থেকে আমার অপমান দেখে মজা পাচ্ছে।

এরপরে যে কাজটা করলাম তা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো আমি চার হাতে পায়ে... একেবারেই চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিতে লাগলাম। কোনদিকে গেলে নিরাপদে থাকব সেটা ভাবছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, আগের জায়গাটায় ফিরে যাই। আমি তাই যেখানে ছিলাম, সেই গিরিশিরার দিকেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলাম। ওটা খুব দুরেও নেই, আর একটু গেলেই হাত পৌঁছে যাবে।

আমার নীচের অদৃশ্য বস্তুটার কম্পন হাতে টের পাচ্ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম কোনোভাবেই যেন নীচের খাদের দিকে নজর না যায়।

কিন্তু আমার পথ আটকে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াল সেই দৈত্যাকার কালো কেক-স্লাইস! শুধু তাই নয়, আমাকে পিছন দিকে ঠেলতে লাগল।

চোখ ঠেলে কান্না বেরিয়ে এল। আমি উলটোদিকে হামাগুড়ি দেওয়া

শুরু করলাম।

পাগলের মতো নিজের সঙ্গে নিজেই বিড়বিড় করছিলাম, "কথা বলা কুকুর, হামাগুড়ি দে! কতদূর এগোবি? এক্ষুনি ওরা সুইচ বন্ধ করে দেবে আর তোর পায়ের নীচের অদৃশ্য আস্তরণও সরে যাবে মুহূর্তে। তুই নীচে পড়তে থাকবি। সোজা তাস-আক্সুর দিকে, যেখানে উন্মত্ত নদী গর্জাচ্ছে, পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে। ওরা মজা পাবে তোর দুর্গতি দেখে। তা ও আরও গর্জাক, আরও জোরে আছড়ে পড়ুক পাথরের গায়ে। একসময়ে ওর পথের আগল ভেঙে ও দুরন্ত গতিতে ছুটে যাবে নীচের উপত্যকায়। ওর তীব্র স্রোতে কাদা-মাটি, পাথর, গাছের গুঁড়িসব খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। তাই হোক! আমার দেহটা সেই কাদা-জলের স্রোতে পাক খেতে খেতে স্রোতের টানে ভেসে যাক, পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে আমার শরীরের সব ক'টা হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাক..."

আমি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রমশ উঠতে থাকলাম, পড়ে গেলাম না। পোকা যেমন অমসৃণ তলের উপর দিয়ে এলোমেলো পা ফেলে এগোয়, তেমন করে আমি হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম। টের পেলাম, আমার দু-দিকের তল বাঁকাভাবে উঠে গেছে। যেন একটা অদৃশ্য টিউবের মধ্য দিয়ে আমি এগোচ্ছি। হাল্কা গোলাপি একটা আলোর আভা আসছিল আমাকে ঘিরে।

আর কিছুদূর গেলেই পাহাড়ের ওপাশে পৌঁছে যাব। সামনে চূড়া দেখতে পাচ্ছি একেবারে চোখের সামনে।

কিন্তু আমি কেন হামাগুড়ি দিচ্ছি? আমি, ভ্যালেরিয়া মারশেঙ্কো, কেন অন্যের আনন্দের জন্যে হামাগুড়ি দেব? আমি কি ওদের খেলার পুতুল? পৃথিবীর উন্নত সভ্যতার একজন প্রতিনিধি! এই আমার কি না জানি কাদের সামনে নিজেকে ছোটো করার অধিকার আছে, না আদৌ তা থাকা উচিত? মহাবিশ্বের কোন অন্ধকারের জীব এরা কে জানে। হতে পারে কোনো অজানা নক্ষত্রমণ্ডলীর অপরাধী, এখানে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রয়েছে! কেন ওরা ওদের ওই কালো যান এই পাহাড় পর্বতের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে? কী করেই বা খোঁজ পেল? ওরা কাদের কাছ থেকে

লুকোচ্ছে? সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা মুখ দেখায় না কেন? কেনই বা আমার মাত্র পাঁচটা ছেঁড়া পাতায় সামান্য কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সাততাড়াতাড়ি আমাকে বেলচায় তুলে আমাকে শূন্যে ভাসিয়ে দিল কেন? কী উদ্দেশ্য ওদের?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর টলোমলো পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কোনো শক্ত জমি আমার পায়ের নীচে নেই, আমি বাতাসে হাঁটছি! আমার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাব ডুব শুরু করল, মনে হল সেই কম্পনে পায়ের নীচের অদৃশ্য পথটাও বুঝি কাঁপছে। তাহলে নক্ষত্রজগতের অদ্ভুত প্রাণীকুল! আমার কাছ থেকে তোমরা এটাই চাও?

শেষের কয়েক মিটার ছিল সবচেয়ে কঠিন। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল ওই অত্যাচারীর দল পায়ের তলার অদৃশ্য আস্তরণটা সরিয়ে দিয়ে আমাকে শেষ করে দেবে।

কিন্তু সত্যি সত্যি তেমন কিছু ঘটল না।

হালকা গোলাপি আভা যেখানে খাড়া পাথরের দেওয়ালের গায়ে মিশে গেছে, সেখানেই মনে হয় পথের শেষ। কাছাকাছি এসে আমি সামনে ঝাঁপ দিলাম। পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা ঝোঁপঝাড় ধরে কোনোমতে ভারসাম্য রেখে দাঁড়ালাম পাহাড়ের গায়ে। আমার পায়ের নীচে এখন শক্ত মাটি। আর ভয় নেই। হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লাম। এই তো সামনেই চেনা পথ!

উবু হয়ে ভিজে ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্ত! আর ভয় নেই। দুঃস্বপ্নের থেকে মুক্তির কান্না আমার শরীর কাঁপিয়ে দু-চোখের কোল ভাসিয়ে বেরিয়ে এল।

একটু সামলে নিয়ে যখন মাথা তুললাম, সামনেই দেখলাম আমার রক্ষাকর্তাকে। সঙ্গে সেই কেক-স্লাইস আসন, তার উপর আমার তাঁবু, রুকস্যাক আর যা কিছু টুকিটাকি ছিল। যথারীতি কালো হেলমেটে মাথা ঢাকা। একটা পা মাটিতে, বাকি দেহটা বাতাসে ভাসছিল।

কেক-স্লাইসটাকে আমার দিকে ঠেলে দিল, আমার জিনিসগুলোও আমার কাছে

চলে এল।

উঠে দাঁড়ালাম। ভিনগ্রহীকে বললাম, "তোমাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। তবে কোনো ভালো কাজের প্রতিদান দেওয়া উচিত আরেকটা ভালো কাজ দিয়ে।" বলে আমি এগিয়ে গেলাম। দয়ালু ভিনগ্রহী কোনো উত্তর দিল না।

একটা ছোট্ট গাছে একটা ফুল ফুটে ছিল। রঙটা টকটকে লাল, তার মধ্যে হলুদের ছিটে। আমি শেকড়সুষ্ঠু গাছটাকে টেনে তুললাম, তারপর সেটা রেখে দিলাম সেই কেক স্লাইসের উপর। চুম্বকের মতো ফুলসুষ্ঠু গাছটা ওই আসনটতে আটকে গেল।

বললাম, "এই লাল-হলুদ ফুলটার গন্ধ যখনই পাবে, আমার কথা মনে কোরো। তোমাদের আশ্চর্য বাগানে শিশিরবিন্দুর মতো ও ফুটে উঠবে-পৃথিবীর এক ছোট্টো প্রাণ। তবে চেষ্টা করলেও তোমাদের বাগানের ফুল আমাকে দিতে পারবে না। তোমাদের ফুল তো ফুলদানিতে ধরবে না, আস্ত চৌবাচ্চা লাগবে ফুল সাজাতে। আবার দেখা হবে আমাদের। যাবার আগে একটা অনুরোধ করি, তোমাদের ওই গ্রামোফোন লাউড স্পিকারে নক্ষত্রজগতের একটা সুর শোনাবে?"

বৃষ্টি একেবারে ধরে গিয়েছিল। আমার রক্ষাকর্তা আমার দেওয়া উপহার নিয়ে খাদের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল ওদের স্ফটিকের দিকে।

গ্রামোফোনের চোঙার মতো প্রান্ত-বিশিষ্ট অনুজ্জ্বল কালো স্ফটিকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে হল ঠিক কীসের সঙ্গে ওটার মিল রয়েছে! ওটা হুবহু টর্নেডোর মতো দেখতে। ঘূর্ণিঝড়ের চেহারাটা যেমন উপরে চওড়া, ক্রমশ সরু হয়ে নীচে নামে, ওটা একদম সেই চেহারার! ঠিক কেন তা জানি না, বেশিরভাগ টর্নেডোই ওরকম নীচে থেকে খাড়া ওপরে ওঠে। ছবিতে যেমন দেখেছি, একদম সেই চেহারাটা আমি চিনতে পারলাম।

খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। ছোটো ছোটো গাছের পাতায় বৃষ্টির জল জমে ছিল, সূর্যের আলো পড়ে তা চকচক করছিল। প্রাণভরে সেই জল চেটে তেষ্টা দূর

করলাম। মনে হল জীবন ফিরে পেলাম!

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড গুমগুম আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠল, যেন সমস্ত পাহাড়টাই ধ্বসে গেল! সেই কালো ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্ফটিক পাথর মুহূর্তে অদৃশ্য হল। নিজের মনেই মুচকি হেসে বললাম, 'নক্ষত্রজগতের উপযুক্ত সঙ্গীতই বটে!

পাথরটা যেখানে ছিল সেদিকে তাকিয়ে মনে হল কোনো কালেই ওখানে কিছু ছিল না। শুধু পাহাড়ের চড়াইয়ের মাঝবরাবর একটা মস্ত বড়ো খোঁদল রয়ে গেল। স্ফটিকটার লাগোয়া যে বোল্ডারগুলো ছিল, তারা ছিটকে নীচে পড়ল।

সেই গুমগুম শব্দটা ক্রমশ নীচে নামতে নামতে নদীখাতে পৌঁছে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, আমার 'সাদা-পাথুরে' ও মুক্তি পেয়েছে। কাদা-মাটির স্রোত হুড়মুড় করে বয়ে চলেছে।

আর দু-দিন বাদে আমি শহরে পৌঁছে গেলাম।

লার্কার ডায়েরি এখানেই শেষ।

আকাশছোঁয়া

তাস-আক্সুর ডান তীর ধরে হাঁটছিলাম আমরা। নদীখাত থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার উপরে পাহাড়ের গা-টা এত মসৃণ, দেখে মনে হয় মস্ত নিড়ানি দিয়ে কেউ চেঁছে দিয়েছে। ওই জায়গায় না কোনো গাছ, না ঝোঁপঝাড়। কেবল এখানে ওখানে সদ্য গজিয়ে ওঠা কয়েকটা ঘাসের চাপড়া। আর কিছু বাঁকাচোরা ফার গাছের গুঁড়ি, তাদের গায়ের ছাল বাকল নেই, উঁচিয়ে রয়েছে মাঝেমধ্যে।

পথে একটা বোল্ডার পড়ল। আকারে বড়সড় একটা খড়ের গাদার মতো তো হবেই, কোনো সময় নদীর স্রোতে ভেসে এখানে এসে আটকেছে।

আমাদের সমতলের বন্ধুরা ভাবতেই পারবে না একটা নিরীহ নদী কত ক্ষমতা ধরতে পারে!

যখন ছোটো ছিলাম, আমাদের বাড়ির কাছেই একটা মিউজিয়াম ছিল। সেখানে একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবিটা বিংশ শতকের প্রথমদিকের, আবছা হয়ে এসেছে। নদী কীভাবে ফুলেফেঁপে মুহূর্তের মধ্যে একটা গোটা শহরকে মুছে ফেলেছিল,

ছবিটা তার। একমাত্র অক্ষত ছিল সেই শহরের কাঠের গির্জা। গির্জায় অনেকগুলো গম্বুজ ছিল। গির্জার বৈশিষ্ট্য হল, তার কোনো জায়গায় পেরেক ব্যবহার করা হয়নি। সেকালের নামকরা স্থপতি জেনকভের তৈরি এই আশ্চর্য স্থাপত্য। সেন্ট বেসিল গির্জার মতো এই গির্জাও খুব উজ্জ্বল রঙে রাঙানো আর তেমনই সাজানো। পরে এই গির্জাকে মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, এখানেই ছিল সেই ছবিটা।

এক সপ্তাহ আগে লার্কার নোটবইটা দেখে মনে হয়েছিল খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। হাতের লেখা মাঝেমধ্যে রীতিমতো খারাপ, এখানে ওখানে কাটা হয়েছে। তবে কাটাগুলো বেশ যত্ন করে করা। লেখাগুলো আমাকে ভাবাচ্ছিল। তবে ওর এই বিশৃঙ্খল স্বীকারোক্তি থেকে ঠিক কী মনে হচ্ছিল, সেটাও আমি গুছিয়ে বলতে পারব না।

আমার যেটা মনে হয়, লার্কাও দ্বিধায় আছে। ওর নিজের মধ্যেও প্রশ্ন আছে। ঘটনাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আদৌ কি সেরকম কিছু ঘটেছিল? কিংবা এটা যদি কোনো খেলা হয়, তবে বলব সেটা বাস্তবের থেকেও বাস্তব।

উঁহু, এটা বোধ হয় খেলা নয়। যাই হোক, কথাগুলো আমাকে ভাবাচ্ছে।

‘ধরা যাক, দেশ-কালের কোনো পথিক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমি ভাবছিলাম, ‘রাশিয়ান দার্শনিক ফিয়েদোরভের মতে, তা যদি হয় তবে সেই নিরুদ্দেশ পথিকের পথ পূর্বনির্ধারিত হবে না।’ ফিয়েদোরভ, যিনি বিখ্যাত রাশিয়ান মহাকাশ বিজ্ঞানী সিয়োল্কোভস্কির শিক্ষক...

‘হ্যাঁ, যা ভাবছিলাম সেরকম হলে দেশ-কালের হিসাবের সামান্য একটু গণ্ডগোলের জন্যে অবতরণের জায়গার আমূল ওলটপালট হয়ে যাবে। হয়তো দেখা গেল স্পেস-শিপ গিয়ে নামল জীবন্ত আগ্নেয়গিরির হাঁ করা মুখে, অথবা একেবারে খাড়াই পাহাড়ের গায়ে যেখানে পা রাখারই জায়গা নেই। এমনও তো হতে পারে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আর তার কঠিন ভূমি... তাদের কাছে দুটোই সমান অচেনা? গ্যাসীয় বা কঠিন পদার্থ, তাদের কাছে দুই-ই সমান?

কারণ, তাদের পরিবেশটাই আলাদারকমের। তাহলে তারা কী করবে? পৃথিবীর

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সবসময়ে স্পেস-স্যুট পরেই থাকবে! হু-ম-ম! এতক্ষণে কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তবে লার্কা যেরকম বলেছে, ওই স্ফটিক-যান... তার মধ্যে বাগান... স্ফটিকের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা... সেটা আসলে একটা মোটর, কিন্তু জীবন্ত... ওর ভাবনার মধ্যেই একটা কোথাও একটা আপাত বিরোধিতা আছে।

লার্কার বর্ণনা থেকে ওই স্ফটিক-যানের কলকজা সম্বন্ধে একটুও ধারণা করতে পারিনি। তা যেমনভাবেই ওরা সেটা চালাক, কিংবা যে পরিবেশ থেকেই আসুক না কেন, ওরা যে বেশ সংগঠিত, সেটা পরিষ্কার। কিন্তু এত অমিশুক কেন?

ঠিক এই প্রশ্নটাই আমাকে বার বার খোঁচাচ্ছিল। ওরা কোনোরকম যোগাযোগ করতে চায় না কেন? আমরা একেবারে আদিম যুগে পড়ে রয়েছি এটা ভাবার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই!

আমার মনে পড়ল সেই পেরুর ঘটনা। ভাবছিলাম, ‘চন্দ্রযোদ্ধাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগসূত্র আছে কি? মেয়র, যে কিনা নিজেও ওই উপজাতির লোক, সে অবশ্য আমাদের বুঝিয়েছিল, এসব ওই অশিক্ষিত, বর্বর আদিম লোকজনের কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। মেয়র বলেছিল বটে, ওদের মোড়লের জরাজীর্ণ প্রাসাদের মধ্যে একটা মস্ত পাথরের দেওয়াল আছে যার গায়ে গত হাজার বছরের এবং আগামী হাজার বছরের সমস্ত সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের হিসাব আছে। আবার ওই ক্যালেন্ডার থেকে সৌরজগতের গ্রহদের গতিবিধি, এমনকি নেপচুনেরও গতিবিধিও হিসেব করা যায়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে, উনবিংশ শতকের আগে নেপচুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কারো জানা ছিল না! শুনেছি যেদিন চাঁদের দেবী ভেসে আসেন, সেদিন সন্ধেয় পুরোহিত একটা কাঠের বারকোশের উপর একটা তামার বল রেখে ঘোরাতে থাকে, আর তার মধ্যে চাঁদের সমস্ত সমুদ্রের ছবি ফুটে ওঠে! এমনকি চাঁদের যেদিকে আলো পড়ে না, সেদিকেরও। এটাও শুনেছি, ওদের কবরখানায় এমন অনেক পুরোনো পাথরের মূর্তি আছে, যাদের চোখ আর নাভি চুম্বক দিয়ে তৈরি। এটা যদি সত্যি হয় তবে চিনের আবিষ্কারের অনেক আগে

থেকেই এরা চুম্বকের কথা জানত। ডানাওয়ালা যানে চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বিপজ্জনক অভিযানের গল্প পৌরাণিক কাহিনিতে অনেক আছে। হতে পারে সেরকম যান হয়তো সত্যিই ছিল, যার ভিতরে ভরা থাকত পারদ আর অদ্ভুত কোনো তরল চুম্বক! এসব গল্পে কারো ক্যান্সার বা এরকম কোনো মারাত্মক রোগের কথাই নেই-ব্যাপারটা ভাবার নয়? অথচ সেটা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়েছে বলে শুনিনি। মোদ্দা কথা, তাদের সঙ্গে কাদের যোগাযোগ ছিল? মহাজাগতিক ঘূর্ণির মধ্যেকার অনন্ত ছায়াপথের সঙ্গে আমাদের পার্থিব পূর্বপুরুষদের বিস্মৃতি ঘটাল কে? এ ব্যাপারে কেন আমরা এত উদাসীন?'

নদীর বুকে ধীরে ধীরে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছিল।

"রথের রাজা, এবার কিন্তু তাড়াতাড়ি পা চালানো দরকার!" লার্কা তাড়া দিল, "তিমচিক, বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। প্রবন্ধ লেখা এর চেয়ে সোজা, তাই না?" লার্কা মুচকি হাসল, "প্রায় এসে গিয়েছি! সামনের ওই বাঁকটা ঘুরে নদী পেরোব, তারপর একটুখানি চড়াই পার হলেই সেই জায়গা। কাল সকালে উঠে টের পাবে কোন অপূর্ব জায়গায় এসে পৌঁছেছ।"

"হুম, বেশ জানা আছে যত সুন্দর জায়গাই হোক, আমরা তো একা নই। আমাদের আগে কেউ না কেউ সেই সৌন্দর্য উপভোগ করে গেছে।" তিমচিক ঘোঁত ঘোঁত করে বলল।

শেষপর্যন্ত ন'টা নাগাদ আমরা তাঁবু ফেলার মতো একটা জায়গা বেছে নিলাম। অন্ধকার বেশ ঘন। আমরা আশপাশ থেকে শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালালাম। লার্কা ঝটপট রান্নায় বসে গেল; আমি আর তিমচিক ওদের তাঁবুটাকে একটা বিরাট ফারগাছের নীচে আর আমারটাকে ওদেরটার প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে খাঁটিয়ে ফেললাম। আমার তাঁবুটা যেখানে লাগালাম, সেখানে ছোটোখাটো ঝোঁপঝাড় রয়েছে।

তাঁবু খাটানো হলে আমার সোয়েটারটা বের করে পরে নিলাম। বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। আগুনের পাশে বসে আরাম হল।

তারাদের ভিড়ে ভিড়াক্কার আকাশটা যেন নীচু হয়ে নাগালের মধ্যে এসে গেছে। নীচে পাথরের উপর দিয়ে তাস-আক্সুর বয়ে চলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল না।

"তাহলে, আমাদের বুদ্ধিমান ভ্রাতাসকল! এই পবিত্র জায়গায় তীর্থযাত্রা শেষ করার আনন্দ আমরা বরং ব্র্যান্ডি দিয়ে উদযাপন করি!" সবসময়ে বিদ্রূপ করাই আন্দ্রোজিনের স্বভাব, এবারও তার অন্যথা হল না। ব্রান্ডির বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে লার্কার দিকে ফিরে বলল, "তোমার ওই এলিয়েনের দল পাহাড়ের গায়ে যে খোঁদল বানিয়েছিল সে তো একেবারে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, কী বলো ডার্লিং? তবে আমার আন্দাজ, খোঁদলের মধ্যে ফেলতে হলে... তা, প্রায় তিনশো মিটার দূরে তো টিপ করতেই হবে।"

"ধরো যদি এখান থেকে একটা কাক ওড়া শুরু করে, তিনবার ডানা ঝাঁপটালেই ওখানে পৌঁছে যাবে। তবে তোমার একটা ভুল হচ্ছে। আমরা আছি নদীর ডানদিকে, আর সে জায়গাটা বাঁদিকে। ঘুমকাতুরে বাবু! ঘুমিয়ে পড়ো! কাল সকালে সূর্যোদয়ের সময় তুলে দেব, তখন নিজের চোখেই মিলিয়ে নিয়ো।" লার্কা হেসে আন্দ্রোজিনের চুলগুলো ঘেঁটে দিল। ওর ধৈর্য দেখে আমার যে হিংসা হচ্ছিল না, তা বললে নেহাতই মিথ্যে কথা বলা হবে।

"হুঁ হুঁ বাবা! সূর্য উঠলে শিশির শুকিয়ে যায়, এই প্রবাদটা শুনেছ তো আগে, আমার ভাষাবিদ দেবী? এরকম বহু প্রবাদ আমার ঝুলিতে আছে। তুমি তো জানোই, নানাধরণের জ্ঞান সংগ্রহ আমার শখ। আর তাছাড়া দু-দাগ 'ফাইভ-স্টার' পেটে পড়লে আমার অতুল জ্ঞান ভুরভুর করে বেরিয়ে আসে। কারো আপত্তি আছে?"

আন্দ্রোজিন এমনভাবে চোখদুটোকে চারদিকে ঘুরিয়ে আনল যেন অসংখ্য শ্রোতার সামনে ও তার জ্ঞান বিতরণ করছে। তারপর আর কোনো উত্তর না পেয়ে নিজেই সিদ্ধান্তে এল, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, সবাই মেনে নিয়েছে। ভালো। খুব ভালো। আজ নেহাত আমি বেজায় ক্লান্ত, এক পা চলারও ক্ষমতা নেই আর, তাই তো গাড়ির মালিক হওয়া দরকার।"

প্রায় ভর্তি গ্লাসটাকে ঠক করে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি খানিকটা মাংস মুখে ফেলে গাউ গাউ করে চিবোতে লাগল, তাও কথায় কোনো ছেদ নেই। যেমন করে মোটর লঞ্চের তলা থেকে ফেনা ছিটকে বেরোয়, তেমনি ওর কথাগুলোও ঝুপো গোঁফের জঙ্গলের তলা দিয়ে বেরোতে লাগল।

আরও আধঘণ্টা পরে আর এক পাত্তর গলায় ঢালার পর তিমচিকের আর জ্ঞান বিতরণের মুরোদ রইল না। আমার চিন্তা হল ওর বুঝি হেঁটে তাঁবু পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতাও হবে না। হয়তো কোনোমতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে তাঁবুতে ঢুকবে আর মাতালের প্রলাপ বকবে।

তার বদলে ও সটান আমাদের দিকে ফিরে খুব কেটে কেটে বলে গেল, “ঘুমোতে চললাম। স্কুলের বন্ধুযুগল, তোমরা গল্প করো, মজা করো, মুখে মুখে খুনসুটি কর, জাহান্নামে যাও, আর... আর যা খুশি করো, কিন্তু পাহাড়ের ধারের দিকে যেও না। তখন তোমাদেরই আবার উদ্ধার করতে হবে।”

তারপর সটান তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল। এর কয়েক সেকেন্ড বাদেই তিমচিকের সুখী সুখী নাসিকা গর্জনে রাতের নির্জনতা ভেঙে গেল।

অনেকক্ষণ দু’ জনেই চুপ করে রইলাম। ধিমি ধিমি আগুনটা জ্বলছিল, আমি আরও কিছু শুকনো ডালপালা ওর মধ্যে ফেললাম।

“ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।” শেষপর্যন্ত লার্কা নৈঃশব্দ্য ভেঙে বলল, “ও কথা বলতে ভালোবাসে, তাছাড়া ও সবসময়ে যে-কোনো আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে চায়। ওর কথায় মাথা ঘামানোর দরকার নেই।”

“হু-ম-ম... ও সবধরনের জিনিসই ভালোবাসে।” আমার কথায় বোধ হয় একটু ঝাঁঝ ফুটে উঠেছিল।

“তবে আমাকে ও পাগলের মতো ভালোবাসে। ওর মতো আর কেউ আমাকে কোনোদিন অত ভালোবাসেনি, কোনোদিনও নয়।” লার্কার কথায় এমন একটা জোর ছিল, যা আমাকে যথেষ্ট খোঁচা দিল।

তাই বললাম, “হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, কোনোদিনও নয়। আর তিমচিক এককথার

মানুষ। কথা দিলে কথা রাখতে জানে, তাই না? এধরনের মানুষজন আমিও খুব পছন্দ করি।”

“এমন অনেক লোক আছে যারা অন্যের থেকে কথা আদায় করে, তারপর একদিন আচমকা কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে স্রেফ অন্ধ সন্দেহের বশে নিজের বাড়িঘর, স্কুল, পুরোনো বন্ধুবান্ধব সবকিছু ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। করুণা হয় তাদের জন্যে আমার। করুণা! কোনো যোগাযোগ নয়, কোনো কথা নয়, হঠাৎ একদিন ফিরে এসে সে যদি ভাবে তার প্রিয় গাছটার সব ডাল আগের মতোই আছে, কী বলার আছে তাকে?” কথা বলতে বলতে লার্কা চোখ বুজল।

“এমন বাজে লোকের জন্য তোমার করুণা হওয়াও উচিত নয়। ধরো, এমনই একজনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। সে তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে হয়তো আচ্ছা মারছে তখন। তা তুমি কী করবে? প্রথমেই টেনে এক চড় কষাবে, চুল টেনে ছিঁড়ে দেবে, মুখে যা আসবে তাই বলে গাল পাড়বে, তারপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে কোনো চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়বে। যেতে যেতে গাড়ির জানালার বাইরে মুখ বের করে তোমার যা মনে হবে, এমন চিৎকার করে সেটা বলবে যেন গোটা গ্রাম শুনতে পায়।” লাকাকে পরামর্শ দিলাম।

“ছাড়ো তালানভ, কী লাভ পুরোনো ঘা খুঁচিয়ে? আমার মাথা কাজ করছে না। তার চেয়ে আরেক চুমুক করে গলায় ঢালা যাক। জানো তো, বছরে দু-বার, বড়োজোর তিনবার আমি মদ খাই।” লার্কা তার কড়ে আঙুলটা দিয়ে ব্র্যান্ডির খোলা বোতলটা দেখাল।

আমি অর্থপূর্ণভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমিও কিন্তু সেই অভ্যাসই বজায় রেখেছি।”

ব্র্যান্ডি ঢেলে আমরা দু’জনে দু’জনের গ্লাসে ছোঁয়ালাম। ঠুং করে একটা মিষ্টি আওয়াজ হল।

লার্কা বলল, “সবকিছুরই একটা লুকোনো মানে থাকে, এমনকি দুঃখেরও। আজ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, এমনও তো হতে পারে আমরা একটা রূপকথার

জগতে আছি যেখানে সব ভালো যার শেষ ভালো! তুমিও তোমার ওই চন্দ্রযোদ্ধাদের দেখোনি, আর আমিও উড়ন্ত জাদু-বাগান দেখতে পাইনি। আফসোস একটাই, কী একটা ফুলের শরবতের কথা বলছিলে না, যেটা তোমাকে চন্দ্রযোদ্ধারা দিয়েছিল, সেই ফ্লাস্কটা বোধ হয় ফেলে এসেছ।"

"গ্রেভেইরসের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেভেইরসের শরবত। তিমচিক সবসময় বলে, প্রমাণ ছাড়া কিছু মেনে নেওয়া যায় না। ও একেবারেই যুক্তিবাদী তো! বড়ো বেশি যুক্তিবাদী, এটাই ওর ক্রটি। ওই শরবতটা তোমার কথার মস্ত প্রমাণ হতে পারত। তাছাড়া ওটা থাকলে আমি খেতাম, তারপর স্বপ্নে তোমার সুন্দরী চাঁদের দেবীকে দেখতে পেতাম।" লার্কা হালকা চালে বলল।

কিছু না বলে আমি আমার তাঁবু থেকে একটা মাটির ফ্লাস্ক এনে ওর হাতে দিলাম।

"এটা আমার চাঁদের দেবীর জন্যে, তোমার কাছেই রাখো। অবশ্য তুমি এই গ্রেভেইরস ছাড়াই খাদের উপর শূন্যে হেঁটেছ।"

ও ফ্লাস্কটা নিয়ে আগুনের কাছে ধরল। অনেকক্ষণ ধরে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে কী দেখল কে জানে। একসময় মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে জিভের উপর ফোঁটা ফোঁটা ঢেলে চেটে নিয়ে মুখটা কোঁচকাল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে গুছিয়ে বসল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সময় বয়ে চলল আপন গতিতে।

অনেক পরে এবারও লার্কাই কথা বলল। অবশ্য আপন মনেই, "হুমম, সেই খাদ... সেটাই।" তারপর গভীর স্বরে বলল, "তালানভ, মনে করো সেই জায়গাটার কথা, যেখানে আটকা পড়ে আমি ওদের দেখেছিলাম, ভাবছিলাম ওরা মহাবিশ্বের অজানা কোনো সুন্দর জায়গা থেকে আসা আগন্তুক, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চিন্তাটাও অসম্ভব। সেদিন অনেকদিন আগে পড়া একটা কথা মনে হয়েছিল, 'তোমাদের আর আমাদের মধ্যে রয়েছে বিশাল খাদ। এতই বিশাল যে কেউ

কোনোদিন তা পেরিয়ে তোমাদের কাছে যেতে পারবে না, অথবা তোমরাও আমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না।' কোন বইতে পড়েছিলাম তা মনে নেই, তবে... যাক সে কথা, আমার লাল নোটবই পড়ে তোমার কী মনে হল বলো। যেভাবে প্রথম থেকে শেষ অবধি সাজিয়েছি, তার মধ্যে অনেক জায়গায়ই ফাঁক আছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর নেই ওখানে। তুমি কী ভাবলে। সেগুলো সম্পর্কে?"

আমি যা ভেবেছি তা যতদূর সম্ভব গুছিয়ে বললাম ওকে। তার মধ্যে পৃথিবীর পরিবেশ তাদের পরিবেশ থেকে একেবারেই আলাদা, তাই আমাদের গ্রহের চেনা নিয়মকানুনগুলো ওদের উপর খাটে না্এই তত্ত্বটা ওর বেশ মনে ধরল।

"আমার বদলে যদি তুমি সেদিন এখানে থাকতে আর সেই অমাবস্যার রাতটাতে আমি ওই চন্দ্রযোদ্ধাদের ওখানে, তাহলে বেশ হত! লার্কা হঠাৎ ঘোষণা করে গ্রেভেইরসের মাটির পাত্রটার ঢাকনা সরিয়ে লম্বা শ্বাস টানল, "আহ!" আগুনের আভায় ওর ঘন বাদামি চুলের গোছা তামার মতো চকচক করছিল। "গন্ধটা ঠিক যেন তায়াকসু হিমবাহের সেই জমাট বরফের মতো।"

সে অনেককাল আগের কথা। প্রথম যখন তায়াক্স হিমবাহে গিয়েছিলাম দম বেরিয়ে গিয়েছিল। ওখানে ভূগর্ভস্থ গবেষণাগারে লার্কা আর আমি কাজ করতাম। বেশ কিছুদিন ছিলাম ওখানে। প্রায় চল্লিশ মিটার লম্বা সরু সরু বরফের থামগুলোকে লক্ষ করতাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাছের কাণ্ডে যেমন গোল গোল দাগ তৈরি হয়, বরফের থামগুলোতেও তেমনটিই ছিল। এই দাগগুলোতে শত শত বলা ভুল, হাজার হাজার বছরের কালানুক্রম লুকিয়ে আছে। ল্যাবের এখানে ওখানে পাতলা পাতলা কাঠের উপর ছোটো ছোটো কাগজ আটকানো। কাগজে ইন্ডিয়ান কালি দিয়ে হাতে লেখা কিছু বাক্য।

'গ্রীকদের সঙ্গে ওলেগের সন্ধি -খাজার কাসানাতের পরাজয় -কুলিকোভোর যুদ্ধ -গোলযোগের সময়্ সুভোরোভের আল্পস অতিক্রম -বোরোদিনো -পুশকিনের মৃত্যু ্সেভাস্তোপোলের প্রতিরক্ষা্ প্রযেভালস্কির অভিযান্ সুসিমার যুদ্ধ্ জর্জি সেদোভের সমুদ্রযাত্রা ্চকালোভের উত্তরমেরুর উদ্দেশ্যে অবিরাম উড়ান -গ্যাগারিনের

মহাকাশযাত্রা ’

ওখানে একজন বয়স্ক মানুষ থাকতেন, শুনেছি ত্রিশ বছর ধরে উনি ওই বরফের রাজত্বে পড়ে রয়েছেন। তিনি জলরঙে আঁকতেন নীল আকাশ, তারা, হিমবাহ আর অ্যাভালাঞ্চের ছবি। ভদ্রলোককে দেখতে ছিল গুনিনের মতো। আমাদের মনে হত ঠিকমতো হাঁটাচলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ওঁর পা ছিল একটা। কিন্তু সেই এক পায়েই ওখানে তিনি দিব্যি স্কি পর্যন্ত করতেন, নিজেকে বলতেন ‘হিমবাহ বিশারদ’। লেখাগুলো ওঁরই।

লার্কা আর আমি, দু’ জনেই খুব চেষ্টা করতাম আমাদের জন্মের বছরের সঙ্গে কোন দাগটা মেলে তা আবিষ্কার করার। এই প্রথম বুঝতে পারলাম, কিছু কিছু জিনিসকে সময় সযত্নে রক্ষা করে ু বরফ গলে যায়, ঝরনা বয়ে চলে, গাছে গাছে ফুল আসে ু বাতাস তার পাপড়িগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়, শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে যায় ু নিরবধি এ খেলা চলতেই থাকে। যা চলে যায়, তা হারায় না, আবার নতুনভাবে সে ফিরে ফিরে আসেুএ যেন এক অনন্তচক্র! তবে সবকিছুর ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব খাটে না। এই যেমন, আমি গাছের আড়াল থেকে একটা বরফের গোলা বানিয়ে তোমার দিকে ছুড়লাম লার্কা। তো সেটা আলো-আঁধারির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আবার বরফের সাম্রাজ্যেই মিলিয়ে গেল, সামান্যতম রেশ না রেখে। সেই পিরামিডের আকৃতির গাছটা যার নীচে আমরা প্রথমবার চুম্বন করেছিলাম, হয়তো তার একটা পাতা তুমি সযত্নে রেখে দিয়েছ তোমার অ্যালবামের পাতার ভাঁজে। সেই যে জুলাই মাসের এক বর্ষার দিনে যখন আকাশজোড়া রামধনু উঠেছে আর তুমি একগোছা ডেইজি ফুল নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে, আজ সেই দিনটা কেউ ফিরিয়ে দিলে তাকে আমি সব, স-অ-ব কিছু দিয়ে দিতে পারি।

আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল লার্কার কথায়, “তোমার জন্যেও একটা জিনিস আছে। দাঁড়াও রুকস্যাক থেকে বের করে নিয়ে আসি।”

ও তাঁবু থেকে জিনিসটা এনে আমার হাতে দিল।

কালো রঙের ডাম্বেল আকৃতির পাকানো জিনিসটা, গোড়ার দিকটা কন্দের

মতো ফোলা, আর একেবারে হালকা, যেন কোনো ওজনই নেই। আমার চেনা কোনো কিছুর সঙ্গে একেবারেই মিল নেই।

"ভালো করে দেখো, এটার চেহারা ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণির মতো, তাই না?" লার্কা বলল, "যেদিন হুড়মুড় করে কাদা-মাটিসুদ্ধ সাদা-পাথুরে মুক্তি পেয়ে বয়ে গেল, তার পরের দিন আমার রুকস্যাকের মধ্যে এটা পেলাম। একে আমি কী নাম দিয়েছি জানো? ঘূর্ণি-ছানা! আমার মনে হয়েছিল, এটা ওই স্পেস-স্যুটরাই আমাকে উপহার হিসাবে দিয়ে গেছে না হলে এমন অদ্ভুত জিনিস আমার স্যাকে এল কোথা থেকে? হয়তো এটা ওদের স্মারক। আমি কখনো কাউকে দেখাইনি। তিমচিককেও নয়, ও এর আগে আমার যথেষ্ট পিছনে লেগেছে। 'রথের নায়ক'! জিনিসটা তোমার কাছেই রাখো।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "গোটা শীতকাল এটা তোমার স্যাকে রেখে দিয়েছ! কাউকে জানতে দাওনি? তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। বুঝতে পারছি কাজটা কত কঠিন।"

লার্কা মিষ্টি হাসল। "ইয়ার্কি মেরো না তালানভ। জিনিসটা অনেক অত্যাচার সয়েছে। ওটা আমি অনেকভাবে নাড়াচাড়া করেছি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছি, প্লায়ার দিয়ে চাপার চেষ্টা করেছি, এমনকি গ্যাস জ্বালিয়ে তার উপরও ধরেছি সামান্য আঁচড়টুকুও পড়েনি। এটা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না..."

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, "হাতুড়ি প্লায়ার দিয়ে কী করতে চেয়েছিলে আমি বোধ হয় কিছুটা অনুমান করতে পারছি।"

"কী বলতে চাইছ তুমি? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গোপন ব্যাপার আছে, এর কোনো অজানা ব্যবহার। কারণ, একটা..." কিছু একটা বলতে লার্কা ইতস্তত করতে লাগল।

লার্কাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "এর ব্যবহার নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছ? সবকিছুর ব্যবহার জানা কি স্বস্তিদায়ক?"

লার্কা বোধ হয় ঠিক ধরতে পারল না আমি কী ভেবে কথাটা বললাম। জিজ্ঞাসু

চোখে তাকাল আমার দিকে।

পরমাণুর অন্দরের গোপন রহস্য আবিষ্কারের ফল হিরোশিমার জনগণ কীভাবে পেল? পরমাণু বোমার কল্যাণে ওখানকার সবকিছু স্রেফ গলে গিয়েছিল। সাহারা মরুভূমিতে থার্মো নিউক্লিয়ার ঘূর্ণির জন্য কত পশুপাখি অন্ধের মতো ছুটে পালাতে চাইছিল, এই আমি তার সাক্ষী। কী ভয়ানক সে অভিজ্ঞতা!"

লার্কা আচমকা দু-হাতে কানদুটো চেপে ধরে অস্ফুটে বলে উঠল, "থামা! থামো তালানভ!"

কিন্তু আমি তখন উত্তেজিত, থামার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। বলতেই থাকলাম, "এমনও কেউ কেউ আছে, যারা ভালোবাসাকেও কাঁটা ছেঁড়া করে তার মধ্যের রহস্য জানতে চায়! চামড়া খুলে তার মাংস বের করে দেখতে চায়! হাতুড়ি ঠুকে, প্লায়ার দিয়ে টেনে, গ্যাস বার্নারের উপর ধরে পরীক্ষা করতে চায় ভালোবাসা ঠিক কী, কোথায় থাকে তা! দান্তে তাঁর 'দ্য ডিভাইন কমেডি'তে বলেছেন, ভালোবাসাই সমস্ত জগৎকে ঘোরাচ্ছে। সূর্য, মহাজাগতিক সংস্থা... সবাই ভালোবাসার অধীন..."

লার্কা হঠাৎ আমার হাঁটুর উপর ওর মাথা গুঁজে নিঃশব্দে ফোঁপাতে শুরু করল।

"এ কী করলে তুমি তালানভ?" ওর নিঃশব্দ কান্না ক্রমে ভাষায় রূপ নিল, "আমার বদলে তুমি ওই প্রাণহীন সিলভার ফক্স' কেই বেছে নিলে! তাদের নিয়ে সারা পৃথিবী অর্থহীন দৌড়ে বেড়ালে! রাস্তার দু-ধারে বুভুক্ষু শিশুদের দিকে তাকালে না, জঙ্গলের পশুপাখির হাড়, জলার কচ্ছপের খোলা, সবকিছু মড়মড়িয়ে তোমাদের গাড়ির চাকা এগিয়ে গেল। তোমাদের জন্যে, শুধুমাত্র তোমাদের জন্যে আমাদের সুন্দর পৃথিবীর মাটি মুখ ঢেকেছে অ্যাসফল্টে। আর কী? কিছুদিন বাদে পোড়ো গির্জার হাতায়, আর মানুষের অগম্য ঢালগুলো বাদ দিয়ে আর কোথাও গাছের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। উন্নয়ন হবে যে! তোমরা রোবট হয়ে গেছ। সমস্ত জীবিত প্রাণ তোমরা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চাও। দিনে দিনে গ্রামগুলো সব মরুভূমি হয়ে যাবে, নদীতে মাছ খেলবে না, দিকে দিকে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেবে।

কিন্তু তোমাদের রথ ছুটে চলবে উদ্দাম গতিতে! সেই গতির সামনে এসব কিছু অদৃশ্য। কিচ্ছু দেখতে চেষ্টাই করবে না তোমরা!"

লার্কা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওকে শান্ত করা দরকার। সেই চেষ্টাতেই ওর কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে বললাম, "শান্ত হও, শান্ত হও লাকা।"

কিন্তু লার্কা থামল না। ও বলতে লাগল, "একটা কথা তুমি বুঝবে না। আমাদের সেই সুন্দর মিষ্টি শহরটার কথা মনে পড়ে? আজ তার আকাশ ঢেকে রয়েছে বিষাক্ত ধোঁয়াশায়। এখন পাহাড় থেকে সেদিকে তাকালে উঁচু টিভি টাওয়ার ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। অথচ সেখানে আমাদের ফলের বাগান থেকে কতদিন আমরা নদীর হলদে বালি দেখতাম! যে নদী ওখান থেকে কম করে সত্তর কিলোমিটার দূরে। সেই টিউলিপের ঝাড় ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে গেছে আরও উপরের দিকে। ফলের গাছগুলোয় যখন ফুল ফুটত, আমার মনে হত অন্য গ্রহ থেকেও তা দেখা যাচ্ছে। সেই বাগানের কী হয়েছে জানো? কেটে ফেলা হয়েছে! মনে পড়ে সেই বাগানের কথা? তালানভ, স্কুলের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র, যে কিনা পুশকিনের 'ইউজিন ওনেজিন' হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল, যে ছিল সাদসিধে, তখনও আমার সঙ্গে কিংবা হয়তো নিজের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। মনে পড়ে? কী করছ তুমি, তালানভ!"

"কিচ্ছু না লাকা, কিছুই না।" আমি অস্ফুটে স্বীকার করলাম।

বসন্তকালে যখন আমাদের ছোটো শহরের ফলের বাগানে ফুল ফুটত, তখন যেন রঙের আগুন জ্বলতে থাকত। সে এমন রঙের বন্যা, তা বোধ হয় অন্য গ্রহ থেকেও নজরে আসত। আমাদের স্কুল ছিল ওখান থেকে মাত্র পনেরো মিনিটের হাঁটা পথ। উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা পড়ার নাম করে হাজির হত ওই বাগানে।

এপ্রিলের শেষে, ঘাস তখন প্রায় কোমর সমান উঁচু। দুপুরবেলায় আপেলগাছের ছায়া যখন গুঁড়ির আড়ালে লুকোত, মৌমাছির দল গরম বাতাসে বোঁ বোঁ করে এমন ঘুরপাক খেত যেন ওখানে গুড়ের ভাণ্ড রয়েছে। তখন সেই ঘন ঘাসের জঙ্গলে পড়ার নামে ছেলেদের আড্ডা বসত। ছেলেরা এমনভাবে থাকত, যেন নিতান্ত

অসাবধানে আন্ডার প্যান্ট বেরিয়ে গেছে, চোখে পড়লে মেয়েরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠত।

সাধারণ পোশাকেও আমরা তখন এক-একজন অসাধারণ হয়ে উঠতাম অতি সহজেই।

বেলা পড়ে এলে এক এক করে সবাই বাড়ির পথ ধরতাম। তবে সকলেই জানতাম নাদিয়া শখোয়ারোস্তোভা বাড়ির পথ ধরল তো মিনিট খানেকের মধ্যেই ভোভকা ইরানভকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরতে দেখা যাবে। যেন হঠাৎ করেই তার মনে পড়ে যেত, বাবা তাকে বাগানে জল দেওয়ার জন্য একটা ড্রাম ভরে রাখতে বলেছে, তাই তার এত তাড়া।

সেদিন একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। দূরের নদীটার বালিতে তখন সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের দিক থেকে রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের এই জায়গাটাকে শহর না বলে শহরতলি বললে বেশি মানায়। আগে এর নাম ছিল স্তানিস্তা। আমাদের সিমেরচান্সক কসাক পূর্বপুরুষরা এখানে এসে বসতি তৈরি করেছিলেন। পাহাড়তলিতে বড়ো বড়ো খোলামেলা ঘর আর নানা রঙে রাঙানো দরজা, এই ছিল তাঁদের কালের বাড়ির বৈশিষ্ট্য।

লার্কা আর আমি ছাড়া বাকি সবাইই ফিরে গিয়েছিল। আমি তাড়াহুড়ো করে বই -পত্তর গুছোচ্ছিলাম, এমন সময় উপর থেকে আর্কার গলা শুনলাম, “ওই পাহাড়গুলোকে দেখ! ঠিক মনে হচ্ছে ওরা যেন সূর্যের পিছনে পিছনে যেতে চাইছে।”

তাকিয়ে দেখি ও একটা ফুলে ছাওয়া আপেলগাছের একদম মগডালে চড়ে বসেছে। আমি ওই গাছের গোড়ায় এসে উপরদিকে তাকালাম। আমার চোখ বুঝি অনধিকার প্রবেশ করে ফেলল।

আমি দেখলাম ওর গোলাপিরঙা লম্বা পা, সরু সরু পায়ের আঙুল... রেনেসাঁ শিল্পীদের আঁকা কোনো চিত্র যেন!

গোড়ালির কাছটায় পায়ের ডিমে আলো পড়ে অ্যাম্বারের মতো ঝকমক

করছিল। ওর সুগঠিত হাঁটু, তারও উপরে সুগোল থাইয়ের ভাঁজে সাদা প্যান্টির আভাস, নির্মেদ পেটের ওঠানামা... অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আরে পড়ে যাবি যে! নেমে আয়!"

ও হাঁটু দিয়ে জামাটা চেপে ধরল, কিছু বলল না। আমার বুকে যেন কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, ডালপালা সরিয়ে আমিও গাছে চড়লাম।

ও বাঁহাতে গাছের কাণ্ড ধরে ডানহাত দিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে দেখাচ্ছিল। ওর কনুইয়ের দিক বরাবর সূর্য তখন সবে অস্ত গেছে। যেদিকে হাত বাড়িয়েছিল, সেদিকে মাউন্ট আবাইয়ের জমাট বরফ তখনও তার লাল আভায় উজ্জ্বল।

আমাকে সেদিকে দেখিয়ে ও বলল, "এই সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া পাথুরে দৈত্যরা সবসময় তারাদের দিকে চেয়ে থাকে দেখবি! ধর, কোনোদিন পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহে পাড়ি জমাল, এ বেচারারা তখনো পড়ে থাকবে চিরস্থায়ী হয়ে। এরা অমর, কিন্তু এই অমরত্বের জন্যে এদের কত বড়ো মূল্য চোকাতে হয়!"

ওর কপাল ঘিরে থাকা বাদামি কোঁকড়া চুলের ঝালরে লেগে থাকা ঘাস সরাতে সরাতে মরিয়া হয়ে ওর নাম ধরে ডাকলাম। তবে তাতে ও খুব একটা পাত্তা দিল না। নিজের ছন্দেই বলতে লাগল, "এরা নড়তে চড়তে পারে না, তাও একরকম, কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে আছে ষোলো আনা। অথচ চলার ক্ষমতা নেই। সে দুর্ভাগ্য মেনে নেওয়া অনেক বেশি কঠিন।"

কথা বলতে বলতে আমার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কি! তোর গলার কাছ থেকে তো রক্ত বেরোচ্ছে! দাঁড়া! আমি ওষুধ দিচ্ছি।"

আমার চোখে পড়ল ওর সাদা দাঁতের ফাঁকে ভিজে গোলাপি জিভের ডগা। আঙুলের ডগায় একফোঁটা থুতু নিয়ে আমার কাটা জায়গায় চেপে ধরল। আমার শরীরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই লার্কা যে ডালটার উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা মড়মড়

করে ভেঙে পড়তে শুরু করল। আমি একহাতে ডাল ধরে আরেক হাতে ওকে জড়িয়ে নিজের দিকে হ্যাঁচকা টান মারলাম। টাল সামলাতে না পেরে ও আমার গায়ের উপর এসে পড়ল। ওর বুকের কাঁপুনি আমি টের পাচ্ছিলাম। সেই প্রথম আমি ওকে চুমু খেলাম। ওর কাঁধে, কানের নীচের তিলে, কোঁকড়া চুলে ঘেরা কপালে, তিরতির করে কাঁপতে থাকা নাকের ডগায়...

সমস্ত ফলের বাগান জুড়ে যেন এক অপার্থিব সঙ্গীত বেজে উঠল। তার মধ্যে আমাদের আপেলগাছটা দু-হাত মেলে দাঁড়িয়েছিল। অমৃতময় আকাশের বুকে সদ্য জন্মানো গ্রহের মতো যেন কাঁপতে কাঁপতে ভাসছিল।

আর বাতাস কেটে আসা চাঁদের আলোর বর্ষা ভাসিয়ে দিচ্ছিল পৃথিবীর বুক।

আর বিশ্বজুড়ে পাগলের মতো দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল।

আর সেই উজ্জ্বলতায় আমার ধাঁধানো দু-চোখ আমি খুলতে পারছিলাম না।

"কী করছ তুমি, তালানভ!"

"কিচ্ছু না, লার্কা কিছুই না।" আমি অস্ফুটে বললাম।

আগুনটা আস্তে আস্তে নিভে গেল।

তিয়েন শান পাহাড়ের বুকের মধ্যে, মধ্যরাতের নির্জনতায় আমি সেই মেয়েটির থেকে মাত্র ত্রিশ কদম দূরে শুয়ে ছিলাম, একদিন আপেল বাগানে যে মেয়েটি আমাকে আলিঙ্গন করেছিল।

তার পতিদেবের নাকের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম হয়তো তার অস্বস্তি হত, কিন্তু এখন আর অসুবিধে হয় না, অভ্যেস হয়ে গেছে। সে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে তার গর্জনশীল স্বামীর পাশে আর ভাবছে অন্য এক পুরুষের কথা।

সেই পুরুষ, যে তার বিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সে কি শুধু তার বিশ্বাসেরই দাম দেয়নি? সেই হারিয়ে যাওয়া আপেল বাগান, সেই যে নদী, যার জলধারা আজ ক্ষীয়মাণ, স্তানিস্তায় ছেড়ে আসা বাড়িটা... যেখানে গরুর হাম্বা, মোরগের কোঁকর-কোঁ... সব আজ স্মৃতির পাতায়। সেই বাড়িটার কাছে যুদ্ধের সময় বানানো নালার

ধারের ছোটো দোকানঘরটা, যেখানে কোনো ক্লান্ত পথিক আর জিরিয়ে নেওয়ার জন্য থামে না, সবার বিশ্বাস সে পায়ে দলে চলে গেছে।

সেই ছোটো দোকানটা আজ আর নেই, সেই নালা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই যারা সেখানে জিরিয়ে নিতে আসত, তারা আজ অনন্ত বিশ্রামে...

সেই ছেলেটা তার মায়ের প্রতিও কি অবিচার করেনি? তার তো ধারণা ছিল যে মা কোনোদিন তাকে ছেড়ে যাবে না, যেতেই পারে না! কিন্তু সেই জুলাই মাসের অন্ধকার দিনে সূর্য জ্বলছিল মাথার উপর... মাকে যখন শেষবারের মতো নিয়ে যাওয়া হল শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে, শুইয়ে দেওয়া হল মাটির বুকে, তখন সে জন্তুর মতো আর্তনাদ করছিল, পাগলের মতো প্রার্থনা করছিল অলৌকিক কোনো পথে যেন সব আবার আগের মতো হয়ে যায়।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না, সে মায়ের স্মৃতির কাছে চিরকালের জন্যে অবিশ্বাসী হয়েই রয়ে গেল। বদলে পেল অস্ট্রেলিয়ান র   ্যালিতে কতগুলো রূপোর পদক, টুপিতে কিছু খ্যাতির পালক জুড়ল নতুন করে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াল খ্যাপার মতো, সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর তার নিজের বলতে যা কিছু ছিল, সবার কাছে, সবকিছুর কাছে রয়ে গেল চির-অবিশ্বাসী। এমনকি প্রত্যেক বছর মায়ের সমাধির কাছে মাথা নোয়াতে যেতেও তার ভুল হয়ে যায়।

বার বার একই ঘটনাস্রোত তাকে বিস্মিত করে। কোথায় সে দৌড়চ্ছে? কার কাছ থেকে সে পালাতে চাইছে? সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কার থেকে? বাড়ির ওম, না পূর্বপুরুষদের সমাধি, অথবা উত্তরের নদীর বাঁকের মুখের সেই উজ্জ্বল সবুজ বনানী, নাকি তাদের সেই প্রাচীন পবিত্র শহর?

যদি নদী ক্রমশ সরু হতে থাকে, যদি বনের প্রাণী ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়, যদি গ্রামের পথে হঠাৎ কোনো মেয়ের হাসির কাঁকন বেজে না ওঠে... এই সবকিছু তোমার জন্যে তালানভ? তুমি তালানভ, একমাত্র তুমিই সবকিছুর জন্যে দায়ী। তোমাকে ছাড়া আকাশ, মাটি সমস্তই মৃত। তুমি যদি এখানেই থাকতে সেই মেয়েটির পাশে, যে একদিন আপেল বাগানে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিল, হয়তো

শহরের নীল আকাশ ধূসর ধোঁয়াশায় ঢেকে যেত না, হয়তো পাহাড়তলিতে তোমার ছোটো শহরের কোল জুড়ে ফুটত টিউলিপ, স্কুলের ছাদে আগের মতোই নাচত ফেজেন্ট, আর বসন্তকালে আপেল বাগানের রঙের আগুন দেখা যেত হয়তো অন্য গ্রহ থেকে।

কিন্তু আর নয়। চন্দ্যোদ্ধাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, পৃথিবীর রক্ষকদেরও। বাঁচাতেই হবে।

তিয়েন শান পাহাড়ের বুকের মধ্যে, মধ্যরাতের নির্জনতায় দেখতে পেলাম আকাশ আর পাহাড়চূড়াগুলো যেখানে এক হয়ে মিলে গেছে, সেখানটা একটু একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চাঁদ উঠেছে। যেখানে একটা ধারা এসে তাস-আক্সুতে মিলেছে, তার থেকে খানিকটা পিছনে পাথরের খাঁজের আড়ালে একটা লিঙ্কস তার বাসা থেকে মুখ বাড়িয়ে ইতিউতি চাইতে লাগল, নদীর তীরে একটা কস্তুরী মৃগ একটা সিলভার ফার গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ বুঝি তার নজর পড়ল লিঙ্কসের মার্বেলের গুলির মতো জ্বলজ্বলে চোখদুটোয়। সে দুটো এইদিকেই চেয়ে আছে যেন! তিরের মতো সে চড়াই বেয়ে উঠে এল যেখানে পাশাপাশি দুটো তাঁবুতে তিনজন মানুষ শুয়ে ছিল। আসলে তাদের মধ্যে একজন এত সরবে ঘুমোচ্ছিল যে লিঙ্কসটা আর ভয়ে এ-পথে পা বাড়ায়নি।

বুড়ো সিলভার ফার তার বিস্মৃতির অন্ধকার সরিয়ে জেগে উঠল। চাঁদের নরম আলো তার শিকড় থেকে ডালপালা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। তার মনে পড়ল, পাঁচশো সাতাত্তর চাঁদ আগে সাদা দাড়িওলা একজন তার নীচে তাঁবু গেড়েছিল। লোকটা প্রায় অর্ধেক চাঁদ সেই তাঁবুতে কাটিয়েও ছিল। দিব্যি মনে পড়ে, দিনের বেলা সে পড়ে পড়ে ঘুমোত, আর যেই রাত হত চাঁদের মায়াবী আলো যখন ছড়িয়ে পড়ত, দাড়িওলাও আলো ফেলত তার গায়ে। আর তা যেন তার গুঁড়িতে, ডালপালায় আদর করে সুড়সুড়ি দিত। চাঁদের ভাইও পাহাড়ের মাথায় উঁকি মারত। চাঁদের মতোই সে গোলগাল, কিন্তু তার থেকে আকারে ছোটো আর রঙটা লাল। তার আলোও বড়ো শান্ত। চোখ জুড়িয়ে যায়। চাঁদের ভাইয়ের ওখানে যেসব পাহাড় আছে, সেখানে যে

সিলভার ফারেরা থাকে, তাদের ঠান্ডা শীর্ষ থেকে তারা সেই আলো পাঠাত।

আর দুরের সেই ছোট্টো শহরটায় অনেকগুলো গম্বুজওয়ালা গির্জা বানিয়েছিলেন মহান স্থপতি জেনকভ, সেখান থেকে চারশো আঠারো মিটার দূরে তাঁর বানানো আরেকটা দোতলা বাড়িতে আরেকজন জেগে ছিলেন। সেখানেও চাঁদ পাহাড়ের মাথায় উঠেছে, আর আন্দ্রেই পাভলোভিচ জেনকভের প্রপৌত্রী, আরেকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের বড়ো ভাইঝির চোখেও ঘুম নেই। এই পণ্ডিত সিলভার ফার থেকে প্রতিফলিত আলো আর অন্য গ্রহের আলোর বর্ণালীর মধ্যে কী পার্থক্য, আজীবন তাই খুঁজে গেল। সেই পণ্ডিতের বড়ো ভাইঝি এখন নিজেও একজন ঠানদিদি। তিনি বিগত আশি বছর ধরে বিন্দু বিন্দু করে যা সঞ্চয় করেছেন, তা তাঁর 'সঙ্গীতে, কিংবদন্তীতে এবং সংস্কারে সমিরেচেঙ্কস কত্সকদের ইতিহাস' বইতে লিপিবদ্ধ করছেন। সে কাজ শেষ না হলে তাঁর তো জীবন থেকে ছুটি নেওয়া চলবে না! তিনি নিজে ইতিহাসের পোকা। তাঁর সেই প্রাক্তন ছাত্র, যে সম্পূর্ণ ইউজিন ওনেজিন' হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল, তার জন্য এখনও তাঁর মনে প্রচ্ছন্ন গর্ব রয়েছে। যদিও তা অনেককাল আগের কথা। সেদিনের সেই ছাত্রের নাম আজ গোটা দুনিয়া জানে, তবুও সে তার ছোটোবেলার ইতিহাসের দিদিমণিকে বিভিন্ন দেশের পোস্ট কার্ড, স্যুভেনির বা বই পাঠাতে ভোলে না। আর এটাও ঘটনা, তাঁর আট ভলমের 'সঙ্গীতে, কিংবদন্তীতে এবং সংস্কারে সমিরেচেঙ্কস কসাকদের ইতিহাস' বইটা, কিংবা তাঁর নিজের হাতে বানানো টীকা সমৃদ্ধ তেত্রিশ হাজার একচল্লিশটা ইনডেক্স কার্ড্ একমাত্র তাঁর সেই প্রিয় ছাত্রের হাতে তুলে দিতে একমুহূর্তও ভাববেন না।

অথচ আজ কত বছর হয়ে গেল, সেই ছাত্রটি তাঁর সামনে গিয়ে সশরীরে দাঁড়ায়নি। হয়তো কখনো, যখন মাউন্ট আবাইয়ের উপর চাঁদ ওঠে আর সমস্ত শহর সেই মায়াবী আলোয় স্নান করে, তখন অর্ধ গোলাকার সেকেলে জানালার সামনে বসে তাঁর মনে হয় কেন তিনি আশাই করতে পারেন না যে সেই প্রিয় ছাত্রটি পরের বিষুদবার হঠাৎ এসে তাঁকে চমকে দেবে। আর সঙ্গে নিয়ে আসবে তাঁর প্রিয় বাদাম

দেওয়া কেক আর সিকোয়া কাঠে তৈরি খাঁচায় দুটো গিনিপিগ। সেদিন হয়তো তিনি যত্ন করে চুলে ডাই করতেন, কেননা তাঁর প্রিয় ছাত্র আসছে বলে কথা!

আর জেনকভের প্রপৌত্রী, বিশিষ্ট পণ্ডিতের বড় ভাইঝি সেই ঠানদিদির পৃথিবী বিখ্যাত প্রিয় ছাত্রটি, তিয়েন শান পর্বতের বুকের মধ্যে, মধ্যরাতের নির্জনতায় তাঁবুতে শুয়ে দেখছিল চাঁদের আলো মাখা চূড়াগুলো কীভাবে আকাশকে ছুঁয়ে রয়েছে! অতীতের ধূসর পাতা থেকে উঠে আসা একটার পর একটা ভাবনা আগস্টের রাতের আকাশের তারা খসার মতো পর পর চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছিল। লিঙ্কস, হরিণ, সিলভার ফার কিম্বা তার দিদিমণি জোয়া ইভনোভনা... কোনো ভাবনাই যে তার মনে খুব ছাপ রেখে যাচ্ছিল তা নয়। মনে মনে সে এক অনন্ত ভুলের সমুদ্রের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, আর সেখান থেকে পরিত্রাণের জন্যই ছবিগুলো পর পর সারিবদ্ধভাবে সামনে দাঁড়াচ্ছে। আগেকার দিন হলে বলত, দিব্যদৃষ্টি। আর এখনকার ভাষায়, শুধুই অসাধারণ ঘটনা।

'অসাধারণ ঘটনা মানেই যে বিস্ময়কর তা মোটেও নয়।' আমি ভাবছিলাম, 'অথবা বলা যায় সেভাবে দেখতে গেলে তো বিশ্বটাই একটা বিস্ময়। আমরা যে বলি মহাবিশ্বের কোনো সীমানা নেই! আসলে বলা উচিত, সম্ভব এবং অসম্ভবের মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। আমাদের দুর্বল মেধা একটা সীমারেখা টানে বটে, কিন্তু সেই লাইনটাকে যদি অনাদিকাল ধরে বাড়াতেই থাকি, একটা সময় আর সেই বিভেদটাই মুছে যায়। আসলে নানারকম শর্তে আবদ্ধ সসীমের সঙ্গে মুক্ত অসীমের কোনো তুলনাই টানা যায় না একথাটা বোঝে খুব কম লোক।'

পাহাড়ের খাঁজ কাটা চূড়াগুলোর উপর গোল চাঁদখানাকে দেখা গেল।

আর আমি আবার ভাবছিলাম... ভাবছিলাম? না দেখতে পেলাম? সঠিক বলতে পারব না...।

...স্ফটিক পাথরের ঘূর্ণির মধ্যে থেকে বেরোনো অ্যানথ্রাসাইট আগন্তুকরা কেবলমাত্র দেখতে এসেছে তা আদৌ নয়। ওরা সাধারণ নক্ষত্র-পথিক, কিংবা রেসিংয়ের প্রতিযোগী। গ্রহে তারায় অনাবশ্যক ছুটে বেড়ানোই ওদের কাজ। লার্কা

ঠিকই বলে, ওরা কোনোরকম যোগাযোগ করতে চায় না। ওদের দরকার নেই। আমাদের জ্ঞান, আমাদের ইতিহাস, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ, আমাদের দায়িত্ব, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পাওয়া সাফল্য, কোনো কিছুতেই ওদের কৌতূহল নেই। বিশ্বজোড়া দৌড়ের মধ্য দিয়ে ওরা ওদের নেতার মঙ্গল করতে চায়, সে হলুদ বা যে রঙের স্পেস-সুটওলাই হোক না কেন, তাকে জয়ী করাই ওদের লক্ষ্য।

দুপুরবেলা সূর্য তখন মাথার উপর গনগন করছিল। একটা ফুলেফেঁপে ওঠা পাহাড়ি নদীর ধারে পাথরের উপর উবু হয়ে বুড়ো মতন একজন বসেছিল। দেখে মনে হয় ক্রেওল জাতের লোক (বিশেষ একটি উপজাতি)। আমাদের দেখে আঙুল দিয়ে নদীর বিপরীত পাড়টা দেখাল। ওইদিকে যেতে চায় তা বুঝলাম।

"ওকে তুলে নেওয়া যাক।" গোলোয়েসেভকে বললাম, "তাড়াহুড়ো চলবে না। একেবারে শামুকের গতিতে নদীখাতে নামতে হবে।"

যাই হোক, সে বুড়োকে গাড়িতে তুলে নীচে নামলাম। আমাদের গাড়ি পেরুন নদীতে নামল। গাড়ির গতি প্রায় নেই বললেই চলে। স্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা পাথর গাড়ির গায়ে এসে লাগছিল, ঘোলা জল জানালার নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সে বুড়ো প্রথমে ভয়ে ফোঁপাতে শুরু করল, তারপর অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্র পড়া শুরু করল। অবশ্য তার একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারলাম না। তবে এটা বুঝলাম কোনো অশুভ আত্মাকে তাড়ানোর জন্যই মন্ত্র পড়া হচ্ছে।

নদী পেরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। বললাম, "যত্তসব কুসংস্কারের ডিপো! কার কাছে প্রার্থনা করলে শুনি? ওই 'সাদা দেবতা'র কাছে? (খ্রিস্টধর্ম রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার আগে স্লাভদের উপাস্য দেবতা, সূর্য ও আলোর দেবতা)। একবারও তো আমাদের ধন্যবাদ জানালে না। যাক গে, চলি এবার।"

লোকটা কী একটা জিনিস হাতে গুঁজে দিল।

"কী এটা? ও, বই দেখছি। কী হে, এটা কি প্যাপিরাসের নাকি! স্মারক? ঠিক আছে বুড়ো খোকা, ধন্যবাদ!"

"চলো চলো তালানভ। দেড় মিনিট তো এখানেই নষ্ট হল!" গোলোয়েসেভ

তাড়া লাগাল।

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তোমার বইয়ের জন্যে। এই দেখো, আমাদের গাড়িটা দেখছ? খুব নাম এ গাড়ির। এর নাম পেরুন। এর মতো দেখতে এই খেলনাটা রাখো। তোমার নাতি-পুতিদের দিয়ো। ওরা খেলবে। না না, এটা ইলেক্ট্রিকে চলে না। এ যে-কোনো সাধারণ খেলনার দোকানেই পাওয়া যায়।

"ও কী! ও দাদু! তুমি অমন হাঁটু গেড়ে বসছ কেন? নাও, এখানে পা রাখো হে! এবার... এবার ওই পেপেরুদাস, ভেসুভিয়াস সব কটাকে দেখাচ্ছি মজা! চল হে সাবধানে। সামনের বাঁকের দিকে খেয়াল রেখো। চাকা না পিছলায়। বাহ! একেবারে ঠিকঠাক পেরোনো গেছে।

"আরে! ওই দেখো! এই ল্যাপে আমরা দু-নম্বরে আছি। হুররে! এখনও সুযোগ আছে।

"আচ্ছা, ওই বুড়ো লোকটা যে বইটা দিয়েছিল সেটা একটু দেখো না কোথায়। কী বললে? চোখে পড়েনি? হারিয়ে গেছে? কোথাও পড়ে গেছে? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি যেন ওটা কালকেই দেখলাম। একটু দোমড়ানো, পাতাগুলো উড়ছিল... ওর মধ্যে চাঁদের কলার মতো কোনো ছবি দেখলাম। আর কী যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপারও নজরে পড়েছিল... কী ছিল সেটা? অভিকর্ষের কোনো গোপন রহস্য? কী বললে? ওই লোকটার ট্রাউজার লামার চামড়া দিয়ে তৈরি? ওরা সেটা শিখল কেমন করে? যাহ! তুমি আমার সঙ্গে মশকরা করছ।

"কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না। ওরা ওই মস্ত বড়ো মসৃণ পাথরটাকে পাহাড়ের মাথায় তুলল কেমন করে? ভাবো একবার। তুমি লগারিদম দিয়ে হিসেবনিকেশ তো করেছিলে! কী বেরিয়েছিল সেখানে? পাথরটার ওজন কম করে পনেরোশো টন তো হবেই!"

এরপরের কয়েকটা দিন রেসের কিছু বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়েই কাটার কথা। তবে আগে এর চাইতেও খারাপ অবস্থা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। আবার পরের বার অসুবিধাগুলোর ব্যাপারে আর একটু ভালো জানব।

হুর-রে! এবারের রেসেও আমরাই জিতলাম। ওহ, বন্ধু! দুর্দান্ত খেল দেখালে! এবার বিশ্রামের পালা। এই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালানো কি চাট্টিখানি কথা!

আর এই অভিকর্ষের গোপন রহস্যের মধ্য দিয়ে যানটাকে ঠিকঠাক চালানো... পা

হাড়ের অজানা এবড়োখেবড়ো পথে আমাদের গাড়ি চালানো আর ওই স্পেস স্যুটদের এই অজানা অভিকর্ষের রহস্যের মধ্য দিয়ে যান চালানো, দুটোই একরকম। ওরা ওদের যান সারিয়ে আবার চোখের নিমেষে ওই চোখ ধাঁধানো নক্ষত্রলোকে রওনা দিয়েছে।

চাঁদ তার সমস্ত প্রভা মেলে দিয়েছে। আর সেই মধ্যরাতের নির্জনতায়, তিয়েনশান পর্বতের বুকের মধ্যে আমি তখন এপাশ ওপাশ করছিলাম, কারণ লার্কার দেওয়া সেই ঘূর্ণি-ছানার শক্ত দেহটা আমার গায়ের সঙ্গে এঁটে ছিল। কোনো একটা ফাঁক দিয়ে সরু একফালি চাঁদের আলো তাঁবুর মধ্যে এসে পড়েছিল। সেই আলোয় ওই জিনিসটা রুপোর মতো চকচক করছিল। আমি ওটাকে দুই আঙুলে তুলে নিলাম। আগেই দেখেছিলাম, জিনিসটা ভীষণ হালকা, কিন্তু এখন অবাক হয়ে দেখলাম, হালকা শুধু নয়, এর সামান্য ওজনও নেই! এটা কী করে সম্ভব? আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

চাঁদের আলোয় ঘূর্ণি-ছানার গায়ে কুয়াশা জড়িয়ে ছিল আর তার মধ্যে থেকে আলোর আভা বেরোচ্ছিল। আর সেই হালকা আলোয় ঘূর্ণির মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম খুব ধীরে ধীরে কতকগুলো সর্পিল ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে, কোথাও দুটো, কোথাও তিনটে তারার জটলা; আর দেখতে পেলাম গ্রহের সারি।

যেন একটা গম্বুজের নীচে এক অদ্ভুত নক্ষত্রজগৎ, আকারে যেটা আপেলগাছের ডগার মতো। আমার মাথার উপরে এক কুয়াশামোড়া গোলকের মধ্যে আরও একইরকম অনেক ঘূর্ণি-ছানা। মনে হল, তারা সবাই মিলে এক অজানা গন্তব্যের পথ দেখাতে চাইছে।

হঠাৎ কী একটা মনে হওয়ায় আমি দু-হাত দিয়ে ঘূর্ণি-ছানাকে ঢেকে দিলাম। গম্বুজের নীচের সেই আশ্চর্য নক্ষত্রজগৎও অদৃশ্য হল! আমি দু-আঙুলে ওটাকে আলতো করে তুলে নিলাম, যেন একটা খেলনা জাহাজকে জলে ভাসাচ্ছি। হাতটা বাড়িয়ে ছেড়ে দিলাম বাতাসে।

কী আশ্চর্য! ওটা বাতাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পড়ে গেল না!

একদম স্থির! একটু কাঁপলও না!

চন্দ্রালোকে অনেকগুলো রহস্যময় পরিবর্তন আমার চোখে ধরা পড়ল। প্রথমে আমার আশেপাশের ঝোঁপঝাড়গুলো, তারপর নদী আর তার লাগোয়া পাহাড়, তারও পরে অনেক দূরের উঁচু উঁচু চূড়াগুলো আর যেন ততটা জমাট লাগছে না। ওরা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে... স্ফটিকের মতো... আমার চোখ ঝলসে গেল, আপনাআপনি দু-চোখ বুজে গেল। আবার যখন চোখ খুললাম তখন পৃথিবীর গোলকটাও স্বচ্ছ লাগল। পৃথিবীর স্বচ্ছ গায়ের ভিতর দিয়ে আমি একদম বিপরীত গোলার্ধের আকাশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দক্ষিণ গোলার্ধের বাকি সব তারাদের পাশ কাটিয়ে আমাদের উত্তর গোলার্ধের ধ্রুবতারার জুড়ি সাদার্ন ক্রসকেও দেখতে পেলাম। আমাদের উত্তর গোলার্ধের রাতের শহরগুলোকে দেখতে লাগছিল জেলিফিশের মতো, যেন তাদের ভিতর থেকে আলো বেরোচ্ছে। আর তার মধ্যে এরোপ্লেন, ট্রেন আর নদীতে নৌকোর আলোগুলো পারদের ফোঁটার মতো চকচক করছিল। কোন একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে সাদা আলোর শিখা আর জ্বলন্ত ম্যাগমার স্রোত গলগল করে বেরিয়ে আসছিল।

সূর্যস্নাত পৃথিবীর পেয়ালা থেকে জলরঙা নীলচে আলো নিঃসৃত হচ্ছিল, ঠিক যেমন মায়াবী আলো আমার অর্ধ-বিস্মৃত শৈশবের স্বপ্নে ঘুরেফিরে আসত। আমি একটা ছোট্টো লার্কের মতোই যেন উড়তে উড়তে উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম সমস্ত খুঁটিনাটি।

গভীর সমুদ্রে তিমির দল আপন ছন্দে ভাসছে, মরুভূমির বালিয়াড়ির মাঝে বুকে হেঁটে যাচ্ছে সাপ।

কারাবায়ো পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আলো-আঁধারির খেলা।

আর ঢেউয়ের মাথায় সারি সারি আলোর ফোঁটা। সাগরের ফেনার চাদরের ওম মেখে অমলিন বুড়ো শহরটা ঘুমোচ্ছে কী নিশ্চিন্তে!

ওই যে গভীর কালো খাদ, তার দু-পাশের পাহাড় বুঝি হাতে হাত রেখে সেতু বেঁধেছে।

যুদ্ধ-ক্লান্ত মাঠ এখন অনাদিকালের সোনালি শস্যের স্বপ্নে বিভোর।

ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকা রকেট-বন্দর পাশের বাঁধের বাঁককে এমন জড়িয়ে রয়েছে যেন একটা মস্ত বীণা, বেজে উঠবে বুঝি এক্ষুনি!

শুষ্ক প্রান্তর টিউলিপের রঙে রঙিন, প্রেমিক যুগলের খুশিই আজ বাগানজুড়ে ফুটেছে! শিশুর দলের কলরব শুনতে পাচ্ছি ওরা কথা বলছে মেঘের সঙ্গে, ধূধূ প্রান্তর জুড়ে বয়ে চলা হাওয়ার সঙ্গে, জলের বুকে ভেসে চলা রাজহাঁসের সঙ্গে, রকেট-বন্দরের সঙ্গে, এমনকি ড্রাগন আর কামানের সঙ্গেও।

ওরা সবাই মানুষুআর আমি, এক ছোট্টো লার্ক-নাচি, গাই, দেখি অনন্ত প্রাণের পরিপূর্ণতা।

কিন্তু চারদিকে কারা ওরা ঘিরে ধরছে? ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে, নীচে? সমুদ্রের গভীর থেকে, গিরিখাত থেকে, মরুভূমির বুক চিরে লকলকে জিভ বের করে কারা এগিয়ে আসছে? সিকোয়া, ফার, লরেল, তাল যাবতীয় গাছের আড়ালে গুঁড়ি মেরে, ডুবোজাহাজের আড়াল থেকে ওরা উঁকি মারছে। এমনকি মরু তুষার, তাকেও ছাড়েনি! সংকেত পেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। জমাট বাঁধা বিষাক্ত তীব্র নীল আলো অপেক্ষা। করছে কার অঙ্গুলিহেলনের? এ আলোর একমাত্র উৎস নক্ষত্রের অন্তঃস্থল!

হঠাৎই সবকিছু চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। একটা অর্ধবৃত্তাকার মেঘ আস্তে আস্তে চাঁদটাকে পুরো ঢেকে দিল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল।

ঘূর্ণি-ছানারও উজ্জ্বলতা আর নেই, একটা ছোটো কালো গুলির মতো ঘাসের উপর টুপ করে খসে পড়ল। ও বাতাসে নিরালম্ব দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়েছে। কুড়িয়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। যত্ন করে রেখে দিলাম রুকস্যাকে।

‘তুমি আর আমি আবারো জ্যোৎস্না তরঙ্গে ভাসব... তুমি আসলে একটা ছোটো ঘূর্ণিযান। তাই না? তোমাকে ওই নক্ষত্র-অভিযাত্রীরা উপহার হিসাবে দিয়ে গেছে, নাকি ঘটনাচক্রে তুমি লার্কার হাতে পড়েছ?’

আমার ভাবনাগুলো নিয়ে নিজের সঙ্গে নাড়াচাড়া করছিলাম। চোখটা আপনিই চলে গেল পাহড়ের গায়ে, যেখানে ওদের যান স্বল্প সময়ের জন্য নেমেছিল। হয়তো পথ ভুল করে, কিংবা লার্কার যেমন মনে হয়েছিল, ওদের জীবন্ত উজ্জ্বল রঙের ইঞ্জিনটা খারাপ হওয়ায় নামতে ওরা বাধ্য হয়েছিল, তারপর তা সারিয়ে আবার ওরা চলে গিয়েছিল নিজের পথে।

মেঘ সরে গেছে, জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বরফমোড়া পাহাড়চূড়ায়। কয়েক কদম দূরে তিমচিকের নাকের গর্জন যেন একটু কম।

সত্যি সত্যিই নদীখাতের ওই পাড়ের পাহাড়ের গায়ে একটা মস্ত কালো খোঁদল। লার্কার ডায়েরিতে যেমন বর্ণনা ছিল।

একটা হালকা গোলাপি আলোর সরণি নদীর এপাড় ও-পাড় জুড়ে বিছিয়ে রয়েছে। খুব হালকা রঙের, কিন্তু দিব্যি বোঝা যাচ্ছে, কেউ যেন টর্চের আলো ফেলছে। একটু কাঁপা কাঁপা আলোটা। আমার মনে পড়ে গেল, লার্কা এরকম একটা আলোর পথের কথা বলেছিল, যে পথ পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। স্পেসে ঘনত্ব কি সত্যিই এত বেশি হতে পারে?

কে বলতে পারে, আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে তা হয়তো আদৌ অসম্ভব নয়!

এই বিংশ শতকের শুরুর দিকে প্যারিসে যখন প্রথমবার ওয়ার্ল্ড ফেয়ার হয়েছিল তখন জনতা একটা বিশাল বেলুনকে বাতাসে কোনো অবলম্বন ছাড়া ঝুলে থাকতে দেখে অবাক হয়েছিল। আসলে ওটা ছিল একটা শক্তিশালী চুম্বকের কামাল, আর কোনো রহস্য ওতে ছিল না।

খাদের প্রান্তে ওই আলোর সরণি বরাবর একটা রাতচরা পাখি উড়ছে। গোলাপি। আলোটা এখন আর খুব একটা কাঁপছে না। আলোর স্রোতে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। উড়ন্ত দেহটা। এ কী! কী দেখছি আমি! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে

পারছি না।

পাখি নয়। আলোর পথ বেয়ে আসছে লার্কা!

লার্কা! অবিশ্বাস্য! চোখ কচলে তাকালাম।

লার্কা হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে নদীখাতের উপরের আলোর সেতু ধরে আমার থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, দু-হাত মেলে দিয়েছে পাখির মতো, মুখ তুলে রয়েছে চাঁদের দিকে। চাঁদকেই দেখছে বুঝি। চাঁদের আলো খেলা করছে ঝরনার মতো নেমে আসা ওর তামাটে চুলের রাশিতে।

মুগ্ধ আমি দু-চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। না, ওর দৃষ্টি চাঁদের গায়ে আটকে নেই, চাঁদ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে, আকাশগঙ্গা ছায়াপথের দিকে। ওই যেখানে প্রাচীনের মধ্য থেকে জেগে উঠছে নতুন বিশ্ব।

চাঁদের দেবী, নাকি চন্দ্রকন্যা লাকার ছায়া ছুঁয়েছে সদ্য জন্মানো বিশ্বের দোরগোড়া! ওর দু-হাত ছড়িয়ে গেছে দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে।

ধোঁয়াশা মাখা সর্পিল আলোর ঘূর্ণি, দুটো কিংবা তিনটে তারার জটলা, আর গ্রহের সারি।

প্রসববেদনা আর মৃত্যুযন্ত্রণার দোলাচল। দুই যন্ত্রণার মাঝে বিস্তর ফারাক, অথবা একই অঙ্গে দুই রূপ।

অনন্ত বাগানে ফলভারনত বৃক্ষশাখায়, পাতায় মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তারায় তারায় রথ প্রস্তুত হচ্ছে নতুন অভিযানের জন্য। তার মধ্যে যে সর্বোৎকৃষ্ট, সে তার পথ করে নেবে।

সময়ের সীমা ছেড়ে
অসীমের খোঁজে
তারার প্রান্তরে বোনা
অনন্ত বসন্তদিন।

এতদিনকার অর্থহীন দৌড় আর অকেজো পুরস্কারের স্তূপ আমাকে লজ্জা দিচ্ছিল। এই অসীমের মাঝে কত ক্ষুদ্র সেগুলো!

তিয়েন শান পাহাড়ের নির্জনতায় পৃথিবীর আত্মজা... অজানা বিশ্ব তার অপেক্ষায়। আর্কিমিডিস সাইরাকিউসে তাঁর শেষ শয্যায় শুয়ে তাকে পাঠিয়েছেন আগামীর আশীর্বাদু বৃত্তটাকে ধ্বংস কোরো না। নেড্ডা যেমন ডন নদীর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, লার্কাও তেমনই কোন বিশালত্বের শরিক। রাতের গোলকধাঁধায় পথ হারানো কুকুরটা যেখানে তার ধনুর্ধর প্রভুকে খুঁজছে, সিলভার ফার যেদিকে তার নাক্ষত্রিক জুড়িদের টানে হাত বাড়িয়েছে... সেই সবকিছু ছাড়িয়ে ওর পথ চলা।

আমারও পথচলা এবার শুরু হবে। সাইবেরিয়ার ইয়েলতলোভস্কা শহরে যে শিশু একদিন পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিল, তাকে তার দায় মেটাতে হবে। ‘সঙ্গীতে, কিংবদন্তীতে এবং সংস্কারে সমিরেচেঙ্কস কসাকদের ইতিহাস’ শেষ করার দায়িত্ব তো এখন তারই উপর।

গরিবের কুঁড়ে, রক্তচোষা বণিকের প্রাসাদ, আকাশছোঁয়া বহুতল, রকেট-বন্দর, পরমাণু কেন্দ্র, এমনকি বিশ্বের মহান স্থাপত্য... সবাই এখন একই স্তরে।

কারাবায়ের কোলে সেই গ্রাম, যেখানে আমাদের দেওয়া ছোটো পেরুন চন্দ্রযোদ্ধাদের বুড়ো মোড়লের কাছে যত্নে আছে। কিন্তু মোড়লের একমাত্র নাতি আর নেই। চাঁদের দেবী তাকে নিয়ে গেছে খাদের ধার থেকে।

সেই চাঁদের দেবী
অথবা আপেল বাগানের সেই মেয়েটি
সেই মেয়েটি যে আমাকে প্রথম চুম্বন করেছিল
আমি তাকে নাম ধরে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু
কিন্তু ও চলে যাচ্ছে দূর থেকে আরও দূরে
আমার নাগাল ছাড়িয়ে...
ওর পথে আমাকেও যেতে হবে... আমাকেও...

সব গাছে পাখি ডাকে

নতুন গ্রহটার বুকে এসে নেমেছিল ওদের রকেট-শিপ। অধৈর্যভাবে পাইলটের হাতের কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিল লেইটার। রকেটের ধাতব দেহ এবং নিচের জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া জমি তখনও পুরোপুরি ঠান্ডা হয়নি।

"তারপর, কী বুঝছ?" জানতে চাইল লেইটার।

অনেকগুলো টেস্টের রিপোর্ট ছাপা কাগজের ফিতেটা মুড়িয়ে রেখে কাঁধ ঝাঁকাল পাইলট ওয়েগ।

"নতুন কিছু নয়। গ্রহটার পরিবেশ অনেকটা আমাদের পৃথিবীরই মতো।"

"তুমি আগেও এখানে এসেছ, তাই না?"

"হ্যাঁ, নতুন গ্রহের খোঁজে বেরোনো কয়েকজন অভিযাত্রীর সঙ্গে এসেছিলাম," জবাব দিল ওয়েগ, "কিন্তু নামিনি।"

বোতাম টিপে পোর্টহোলের শাটারগুলো খুলে দিল ও, তারপর আবার বলতে লাগল, "অনেকটা পৃথিবীরই মতো, কিন্তু যেহেতু এখানকার উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, তাই আপনাকে অনুরোধ করব..."

"বুঝেছি।" মুখ বেঁকিয়ে পকেট থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করল লেইটার। সূচের ঢাকনা খুলে প্লাঞ্জারে চাপ দিতেই কয়েক ফোঁটা তরল চলকে বাইরে পড়ল। বাকি ওষুধটুকু বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে ইঞ্জেক্ট করে ও সিরিঞ্জটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

"চলো, এবার বেরোনো যাক।"

রকেট-শিপের হ্যাঁচ খুলে মসৃণ ধাতুর তক্তা নামিয়ে দিল ওয়েগ। মালপত্র বোঝাই রোভার আনত-তল বেয়ে গ্রহের মাটি ছুঁল। তারপর নামল লেইটার, হাতের বন্দুক উঁচানো, চোখের দৃষ্টি সজাগ। গ্রহটাকে দেখে ওর পৃথিবীর কথাই মনে পড়ে

যাচ্ছিল। ওরা যেখানে নেমেছিল সেই অঞ্চলটা চারপাশে ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। অদূরে একটা ছোটো ঝিল, তার জলের ওপর সাদা ফুল ভাসছে। পাপড়ি মেলা ফুলগুলো যেন আগন্তুকদেরই লক্ষ করছিল। আর্দ্র বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল যা পোড়া ঘাসমাটির দুর্গন্ধ অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছিল। ঝিলের ওপারে অস্পষ্টভাবে নজরে আসছিল কতগুলো ঢালু পাহাড়।

হঠাৎ ঝিলের জলের উপরিতলে ঘূর্ণি দেখা গেল। সেখান থেকে উঠে এল ছোটোমতো এক রাক্ষুসে প্রাণীঃ শরীরটা ড্রাগনের মতো, পিঠের দু-পাশে তিরের ফলার মতো ডানা। সেই ডানা ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে শূন্যে ভেসে উঠল প্রাণীটা, পাড়ের কাছে এসে কমলা রঙের চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। সেভাবে নিশানা না লাগিয়েই বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিল লেইটার।

"এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করিনি দেখছি। দারুণ কিছু শিকার পাওয়া যাবে।"

"যা আপনার ভালো মনে হয়।" জবাব দিল ওয়েগ।

জলের ওপরের ফুলগুলো ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। রাক্ষুসে প্রাণীটা ঝিলের ধারে লুটিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। খাবি খাওয়ার ভঙ্গিমায় বার বার খোলা-বন্ধ হচ্ছিল ওটার দাঁতহীন মুখটা। সেদিকে ক্যামেরা তাক করে বেশ কয়েকবার শাটার টিপল লেইটার।

"ঠিক বলেছ। আমার যা মনে হয় আমি তাই করব।" বিড়বিড় করে বলে উঠল ও। "আমার টাকা, আমি যা চাইব সেটাই হবে।"

ছুরি দিয়ে প্রথমে প্রাণীটার মাথা কেটে ফেলল লেইটার, তারপর দক্ষ হাতে ওটার ছাল ছাড়াল। মাথা আর ছাল ব্যাগে ভরে সংরক্ষণকারী পাউডার ছড়িয়ে ছুঁড়ে দিল রোভারের পেছনের সিটে। ঠিক সেই সময় ঝিলের জলতল ভেদ করে মাথা তুলল একটা ফুলের কুঁড়ি। দেখতে না দেখতেই পাপড়ি মেলল সেটা। পরমুহূর্তে জেগে উঠল একটা ঢেউ, বাড়তে বাড়তে ছোটোখাটো টিলার আকার নিয়ে নিল। প্রচণ্ড গতিতে পাড়ের দিকে ধেয়ে এল ঢেউটা, যেখানে প্রাণীটার দেহাবশেষ পড়ে

ছিল। সবটুকু গিলে নিয়ে ফের মিলিয়ে গেল ঝিলের বুকে।

ঝিল-পাড় ধরে কিছুক্ষণ সামনের দিকে হাঁটল ওরা, তারপর জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল। নরম সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলে হাঁটছিল ওরা, রোভারটা ওদের পেছন পেছন আসছিল। যাত্রাপথে অনেকগুলো জন্তু ওদের দেখে ভয়ে এদিক ওদিক ছিটকে গেল, কিন্তু আকারে ছোটো হওয়ায় লেইটার ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। গ্রহের বিবর্ণ আকাশজুড়ে তখন শোনা যাচ্ছিল অদৃশ্য পাখিদের কিচিরমিচির। হঠাৎ গর্জে উঠল শিকারির বন্দুক। গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ডোরাকাটা একটা সাপ বের করে আনল লেইটারুসরু, লম্বা দেহকে ভাঁজ করে রেখে দিল গাড়িতে।

"সরীসৃপ আমার সেরকম পছন্দ নয়। কিন্তু... ওই তো একটা ভালো জানোয়ার পাওয়া গেছে..."

সামনের পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছয় পাওয়ালা একটা জন্তু যেন ওদেরই দেখছিল। গাভর্তি ধবধবে সাদা লোম, লম্বা গলার ওপর ছোটোমতো মাথা। আকৃতির দিক দিয়ে অদ্ভুত হলেও জন্তুটার অবয়বে কীরকম যেন একটা সামঞ্জস্য ছিল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেল ওয়েগ্র, যাতে জন্তুটা ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়। সামনের একটা পা নাকি হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে একটা ফুল তুলে নিয়েছিল জন্তুটা, কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। তখনই রাইফেল চালাল লেইটার। হাই ক্যালিবার গুলি ওটার মুখ ভেদ করে ঢোকামাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল জন্তুটা।

"দেখলে কেমন নিশানা লাগালাম!" আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল লেইটার। "তোমাকে আমার হয়ে সাক্ষী দিতে হবে কিন্তু, না হলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না।"

একছুটে মরা জন্তুটার কাছে ছুটে গেল ও; উবু হয়ে বসে নরম লোমের ওপর হাত বোলাতে লাগল।

"এমন জন্তু আগে কোনোদিনও দেখিনি। মনে হয় না পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখেছে বলে।"

জন্তুটার ছাল ছাড়াতে লেইটারের অনেকক্ষণ সময় লাগল। ওকে খুব সন্তর্পণে কাজ করতে হচ্ছিল, পাছে ছুরির আঘাতে চামড়ার কোনোরকম ক্ষতি হয়ে যায়। যখন ওর ছাল ছাড়ানো শেষ হল, ততক্ষণে গ্রহের আকাশের স্বচ্ছ নীল সূর্য গাছপালার আড়ালে অস্ত যেতে বসেছে।

"তুমি তো আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো।" হালকা চালেই পাইলটের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল লেইটার।

ওয়ের্গ অবশ্য কোনো উত্তর দিল না, চুপচাপ বসে রইল গোলমতো একটা বোল্ডারের ওপর। লেইটার যখন রোভারে চেপে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল, তখনই একমাত্র উঠে দাঁড়াল ও। পাহাড়ের ওপর থেকে রুপোলী ফিতের মতো নদী -বেষ্টিত একটা উপত্যকা ওর নজরে এল, আর নজরে এল দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলা কতগুলো পর্বতের চুড়ো। স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন হাওয়া বইছিল ওদের ঘিরে। পাহাড়ের অন্য পারে ঘন ঝোঁপঝাড়ের মাঝবরাবর ছোটো একটা পুকুর দেখা যাচ্ছিল।

পুকুরটার ধারেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল লেইটার। পুকুরটা শেষ হয়েছিল গাছপালাভর্তি জঙ্গলের সীমানায় এসে। সেই জঙ্গলেরই একটা গাছ থেকে ভেসে আসছিল পাখির ডাক। আশ্চর্য সুরে গাইছিল পাখিটা, কিছুক্ষণ পর পর পালটে যাচ্ছিল সুরের ধরন। হাওয়ার দমকে গাছের পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপছিল। গোধূলির আলো আঁধারিতে টেলিস্কোপে চোখ রেখে গাছের ডালপালাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল লেইটার। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা আওয়াজ হল, সুরেলা পাখিটার রক্তমাংস ছিটিয়ে গেল চারদিকে। নিস্তব্ধতা নেমে এল গাছটার ওপর।

"দুচ্ছাই!" গজগজ করতে করতে বন্দুক নামিয়ে রাখল লেইটার। "বেশি বড়ো ক্যালিবারের বুলেট ব্যবহার করে ফেলেছি।"

অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এল। একটা গাছ কেটে তার কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাল লেইটার। রাতের খাবার বের করল ওয়ের্গ। আগুনের পাশে বসে ডিনার সারল ওরা, তারপর রোভারের ফোর্স ফিল্ড চালু করে, জন্তুদের ছালচামড়া একপাশে সরিয়ে রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সিটের ওপর। জঙ্গল থেকে শব্দ ভেসে আসা বন্ধ হয়ে

গেল, রাতের নীরবতার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য রয়ে গেল কেবল পুকুরের জলের ছলাৎ ছল আওয়াজ।

"তোমার এরকম চুপ মেরে থাকার কারণ কী, ওয়ের্গ? সারাদিনে তুমি মোট দশটা শব্দও উচ্চারণ করেছ কি না সন্দেহ। সব খেলার সেরা খেলা এই শিকার তোমার ভালো লাগে না?"

"না, আমার ভালো লাগে না।"

"কিন্তু তুমি তো আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নও। জানো, এরকম একটা ছ' পাওয়ালা জন্তুর ছাল বেচে যা টাকা পাবে, তাতে একটা গোটা বছর তোমার হেসেখেলে চলে যাবে?"

"আমি একজন পাইলট।" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ওয়ের্গ।

ও যে এই প্রথমবার কোনো গ্রহে অভিযাত্রী নিয়ে এসেছিল এমনটা নয়। নতুন গ্রহে অভিযান, ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় অংশগ্রহণ এসব নেহাত সস্তা ছিল না। কিন্তু লেইটারের মতো মানুষদের কাছে সেই টাকা কিছুই নয়। ওরা নিজেদের শখ মেটাতে কর্পোরেশনকে মোটা টাকা দিত, বিনিময়ে কর্পোরেশন ওদের বিভিন্ন গ্রহে অভিযানে যাওয়ার সুযোগ করে দিত। এজন্য ওয়ের্গের মতো পাইলটদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছিল, ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের ক্ষেত্রে বোনাসও দেওয়া হত। ওর কাজ ছিল একজন অভিযাত্রীকে একটা কোনো গ্রহে নিয়ে যাওয়া, আবার সেখান থেকে আবার তাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। যে গ্রহে যাওয়া হচ্ছে সেটাকে আগেই ভালোভাবে জরিপ করে নেওয়া হত, ফলে বিপদের সম্ভাবনা থাকত না। এর আগে এই ধরনের অভিযানে ওর কোনো অসুবিধে হয়নি, কিন্তু এইবারের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল লেইটার আসল বন্দুক নিয়ে এসেছিল।

জঙ্গলের আড়াল থেকে এক এক করে তিনটে চাঁদ আকাশে উঠল। গাছেদের ঘন। ছায়ায় ঢাকা পড়ল রোভার। কখন যে আবছা, অবয়বহীন একটা অস্তিত্ব বেরিয়ে এল ঝোঁপের ভেতর থেকে, কখন যে জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল, পাইলট এবং শিকারি বুঝতেও পারল না। আলতো করে বইতে লাগল ধুলোর ঝড়,

কাঁচের চুড়ির মতো ঝনঝন শব্দে নড়ে উঠল সারি সারি ঘাস...।

সকালবেলা পাইলটকে ডেকে তুলল লেইটার।

"এগুলো আবার কোথা থেকে এল?" জিজ্ঞেস করল ও।

রোভারের সিটে উঠে বসল ওয়েগ। রাতে ওরা যেখানটায় আগুন জ্বালিয়েছিল তার চারপাশে ঘাসের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি মরে পড়ে ছিল। বড়ো, ছোটো, ডানা ছড়ানো, রঙবেরঙের পালকে ঢাকা পাখি। ওয়েগ হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, মরা পাখিগুলো ছড়িয়ে বরফের মতো জমাটবাঁধা ঘাসের ওপর। সকালের আলোতে ঘাসগুলো চকচক করছিল। অথচ ফোর্স ফিল্ডের ভেতরের ঘাসগুলো আগের মতোই সবুজ ছিল। ফিল্ডের সুইচ বন্ধ করে রোভার থেকে নেমে পড়ল লেইটার, মরা পাখিগুলোকে ব্যাগে ভরতে শুরু করল। ওর পায়ের চাপে ঘাসের ডগাগুলো ভেঙে এদিক ওদিক ছড়িয়ে যেতে লাগল।

"এ তো দেখছি পুরো কাঁচ।" বিড়বিড় করে উঠল লেইটার। "তুমি এর মানে কিছু বুঝতে পারছ পাইলট? এই পাখিগুলো কোথা থেকে এল? মরলই বা কেন? আচ্ছা, তখন থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি দেখছটা কী? এখানে এসে হাত লাগাও, এগুলো রোভারে তুলতে হবে তো।"

লেইটারের কোনো কথারই উত্তর দিল না ওয়েগ, বরং একসময় ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমাদের এখনই ফিরে যাওয়া উচিত। ওই দেখুন!"

যে ঢালু পাহাড়টা আগেরদিন ওরা সহজেই পেরিয়ে এসেছিল, রাতের অন্ধকারে। সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল সেটার আকৃতি। ওপরের মাটির আস্তরণ সরে বেরিয়ে এসেছিল নীচের শক্ত পাথর। যেন পাহাড়টা হঠাৎ করেই পাথুরে দেওয়ালে পরিণত হয়েছিল, এমন খাড়াই একটা দেওয়াল যা ওদের রোভার কোনোভাবেই পেরোতে পারবে না।

আশেপাশে তাকাল লেইটার। সবক'টা গাছই সবুজে ঢাকা, শুধু পুকুরের ধার ঘেঁষা একটা মাত্র গাছ একেবারে ন্যাড়া, পাতাবিহীন ডালপালাগুলো আকাশের দিয়ে ছড়ানো। মুচকি হাসল লেইটার, ওর চোখের পাশ থেকে থুতনি অবধি চামড়া কুঁচকে

গেল।

"এসব সামলে নেওয়া যাবে খন পাইলট। শিকারের খেলা তো সবে শুরু হয়েছে। আর আমরা কখন ফিরব না ফিরব সেটা আমিই ঠিক করব, চুক্তিপত্রে সেরকমই লেখা রয়েছে। তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই?"

ওয়েগর্গ কোনো জবাব দিল না, মরা পাখিগুলো রোভারে তুলতে লাগল। লেইটার ঘাসপাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ওর ব্লাস্টারের প্লাজমার তাপে জ্বলে ওঠার বদলে সেগুলো বার বার গলে যেতে লাগল। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে পাশের পুকুর থেকে বাটি করে জল নিয়ে এল ও, তারপর ব্লাস্টারের তেজ কমিয়ে প্লাজমা-রশ্মি তাক করল সেই বাটির ওপর। সেকেন্ডের মধ্যে জল ফুটতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা দুর্গন্ধে ভরে গেল চারদিক।

কোনোরকমে বমি চেপে রোভারের দিকে দৌড় লাগাল লেইটার। ওয়েগর্গ আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল রোভার কাঁচের গুঁড়ো মেশানো ধুলোর মেঘ পেছনে ফেলে।

বেশ কিছুক্ষণ অটোম্যাটিক মোডে চলার পর রোভারের স্টিয়ারিং নিজের হাতে নিল লেইটার। উঁচুমতো একটা পাথুরে ঢিপি কাটিয়ে বেরোনোর পর থেকেই কাঁচের ঘাস আর ওর চোখে পড়ছিল না। জোরে একবার নিঃশ্বাস টানল ও, তারপরই হাসিতে ফেটে পড়ল।

"গ্রহটা আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে, তাই না?"

"অথবা হয়তো আমাদের সাবধান করছে..."

"ফালতু কথা! এই গ্রহের ভূপ্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে কতটা পরিচিত আমরা? এর ভূপৃষ্ঠে কখন কী ধরনের পরিবর্তন হয়, তা কি তুমি জানো? গতকালের পাহাড়ের কথাটাই ধরো। আজ আর নেই, খাড়াই পাথর হয়ে গেছে। হয়তো এখানকার এটাই নিয়ম, আমাদের পৃথিবীতে বৃষ্টি নামার মতো। আর মনে আছে, তুমি এই গ্রহের উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের কথা বলেছিলে? হয়তো পুকুরের জলের ওই বিশ্রী দুর্গন্ধের জন্য কোনো আণুবীক্ষণিক প্রাণী বা উদ্ভিদই দায়ী।"

“ঘাসের কাঁচে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?”

প্যাসেঞ্জার সিটে বসা পাইলটের দিকে এক ঝলক তাকাল লেইটার। একপাশে হেলান দিয়ে বসে ছিল ওয়ের্গ, একটা হাত জ্যাকেটের কলারের ভেতরে ঢোকানো।

“তোমার কী মনে হয়?” ওকে জিজ্ঞেস করল লেইটার।

“দয়া করে আর কোনো প্রাণী শিকার করবেন না।” অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল ওয়ের্গ।

“এই শিকার অভিযানের জন্য আমি যত টাকা ঢেলেছি, তুমি জীবনে তত কামাবে কি সন্দেহ।”

“আর এখন শিকার করে সেই টাকা উশুল করতে চান?”

“উশুল?” চোখ সরু করে পাইলটের দিকে তাকাল লেইটার। “আমি শিকার করে আনন্দ পাই। যদিও তোমার পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। যখনই কোনো জন্তু আমার চোখে পড়ে, আমি ট্রিগার টানি। একটা প্রাণীর অস্তিত্ব আমার তর্জনীর সামান্য চাপের ওপর নির্ভর করে আছে এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে। তুমি হয়তো জানো, আজকের পৃথিবীতে শিকার করা নিষিদ্ধ। পরিবেশপ্রেমের নমুনা! পৃথিবীর আইনে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না, কিন্তু এখানে...”

ওয়ের্গই প্রথম দেখল জন্তুটাকে। নিরেট আংটির মতো চেহারা নিয়ে শুকিয়ে যাওয়া নদীখাত বরাবর এগিয়ে চলেছে, মাটি ঘষটে চলার দাগ পেছনে ফেলে। দেহের বাইরেটা যেন একটা বলয়, আর ভেতরটা নীল কাঁচের লেন্সের মতো। জলভর্তি একটা ডোবার সামনে দাঁড়াল জন্তুটা। ওটার ছায়া জলের ওপর পড়ল, বলয়ের ভেতরকার লেন্সের আকার বদলাল। কয়েক সেকেন্ড, তারপরই ধোঁয়া আর বাষ্প ঢেকে গেল সবকিছু। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ডোবার ভেতর জলকাদা আর অবশিষ্ট নেই। শুকনো গর্তে নেমে পড়ল জন্তুটা, লেন্সকে কেন্দ্রে রেখে ঘুরতে শুরু করল বলয়। বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে যাওয়া শ্যাওলা এবং ছত্রাক শুষে নিতে লাগল ধীরগতিতে।

“এর আগে এরকম কোনো প্রাণীর কথা শুনিনি।” নীচু গলায় বলে উঠল

লেইটার। জন্তুটা সূর্যের আলোকে উত্তাপে পরিণত করতে পারে।"

বলয়টা আরও জোরে ঘুরতে শুরু করল। ভেতরের লেন্সটাও যোগ দিল সেই ঘূর্ণনে। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জন্তুটা, বলয়ের অভিমুখ ঘুরে গেল রোভারের দিকে। বন্দুক তুলে ধরল লেইটার। নড়ে উঠল জন্তুটা, ওটার ছায়া এসে পড়ল রোভারের গায়ে।

"দোহাই আপনার, গুলি চালাবেন না!" মিনতি করল ওয়ের্গ।

"তুমি এতে নাক গলিও না পাইলট। আমি শুধু এটা বুঝতে পারছি না যে নিশানা কোথায় লাগাব। বলয়টা ওটার ভেতরকার লেন্সকে সুরক্ষিত রাখছে। আমার বিশ্বাস, লেন্সটাই হল জন্তুটার প্রাণকেন্দ্র।"

রোভারটা সামান্য পিছিয়ে আনল লেইটার। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটাও এগিয়ে এল। আবারও ওটার ছায়া এসে ঢেকে দিল ওদের গাড়িকে।

"আজব তো!" ম্যাগাজিনের বুলেট বদলাতে বদলাতে গর্জে উঠল লেইটার। "এবার দেখছি কী করে..."

বলয়ের ওপরের অংশ উপড়ে গেল বুলেটের আঘাতে, ঘুরন্ত অবস্থাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জন্তুটা। বলয়ের ঘূর্ণন থেমে গেলে জন্তুটার গোটা শরীরটা ওদের সামনে। স্পষ্ট হল। মনে হচ্ছিল একটা আংটির মাথার কাছটা ভেঙে দিয়েছে কেউ। জোড়া লাগার অক্ষম চেষ্টায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল জন্তুটার ক্ষতস্থান, স্বচ্ছ তরলের স্রোত বইছিল। আচমকাই ওটার গোলাকার লেন্সের আয়তন ছোটো হয়ে এল এবং প্রচণ্ড উত্তাপের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল রোভারের ওপর।

জ্ঞান ফেরার পর সবার আগে নিজের গোঙানিই শুনতে পেল ওয়ের্গ। অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখল, ওর মাথার ওপর নীল আকাশ। ঘাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল ওর, মুখের একপাশে ব্যথা করছিল, গায়ের চামড়া নানা জায়গায় পুড়ে গিয়েছিল। রোভারের প্যাসেঞ্জার সিটে গা এলিয়ে পড়ে ছিল ও। শ্বাস নিলেই অদ্ভুত একটা গন্ধ ওর নাকে যাচ্ছিল। সেটা চিনতে পারল ওয়ের্গ। মিউরাডল। অর্থাৎ রোভার তার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। বিপদ বুঝে আপনা-আপনিই অন হয়ে গিয়েছিল ফোর্স

ফিল্ড, জীবনদায়ী এরোসল ছড়িয়ে যাচ্ছিল ওর ফুসফুসে। কিন্তু রোভারটা চলছিল না। তার মানে লেইটার রোভারের বাইরে কোথাও ছিল। যদি সেও ভেতরে থাকত, তাহলে এতক্ষণে ওদের দুজনকে নিয়ে রকেট-শিপের দিকে ছুটে চলত গাড়ি।

মাথা ঘোরানোর চেষ্টা করল ওয়েগ। পোড়া চামড়ায় টান পড়ার যন্ত্রণা ছড়িয়ে গেল সারা ঘাড়ে। কোনোমতে ফার্স্ট এইড বক্সের দিকে হাত বাড়াল ও। তারপর যা করার সব রোবট ডাক্তারই করল। প্রথমে পরীক্ষানিরীক্ষা, তারপর চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেওয়া, সবশেষে আহত শরীরে পেইন কিলার এবং অন্যান্য বিভিন্ন ওষুধ ইঞ্জেক্ট করা।

মিনিট দু-এক চুপচাপ শুয়ে রইল ও, তারপর ফোর্স ফিল্ড অফ করে রোভার থেকে নেমে দাঁড়াল। কন্ট্রোল প্যানেলের বেশ কিছুটা জায়গায় ধাতু গলে দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। কাছেই উপুড় হয়ে পড়ে ছিল লেইটার। গুলি খাওয়া জন্তুটার শরীরে তখনও প্রাণ অবশিষ্ট ছিল, বাষ্পের কুণ্ডলীর ভেতর সামান্য নড়াচড়া করছিল ওটার বলয়। আহত শিকারিকে চিত করে দিল ওয়েগ, গা থেকে জ্বলে যাওয়া স্পেস স্যুটের ছাই ঝেড়ে তুলে আনল রোভারে। আরও একবার ফার্স্ট এইড বক্সের ভেতর থেকে রোবট ডাক্তারকে বের করে বসিয়ে দিল লেইটারের বুকের ওপর।

ছোটোখাটো অক্টোপাসের মতো চেহারার রোবট ডাক্তার তার গুঁড়গুলো ছড়িয়ে দিল। বারকয়েক সবুজ ফেনার মতো জিনিস বেরিয়ে এল ওটার দেহ থেকে। হঠাৎ একটা শুড় এগিয়ে গিয়ে শিকারির নীচের চোয়াল নামিয়ে ধরল, আরেকটা গঁড় ঢুকে গেল ওর মুখের ভেতর। তার ঠিক পরপরই দুটো সূচ ঢুকে গেল লেইটারের দু-হাতের শিরায়। মুহূর্তের মধ্যেই লাল হয়ে উঠল রোবট ডাক্তারের গোটা দেহ। প্লাস্টিকের ডগুলো নির্দিষ্ট ছন্দে সংকুচিত প্রসারিত হতে লাগল, কয়েক মিনিট বাদে বাদে উগড়ে দিতে লাগল বর্জ্য পদার্থ।

রোবট ডাক্তারের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল ওয়েগ। রোবটটাও তার একটা গঁড় দিয়ে ওর হাত আলগা করে পেঁচিয়ে ধরল। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রোভারের সিটে শুয়ে ছিল লেইটার, পোড়া চামড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরে এঁটে বসা

স্পেস স্যুটের পোড়া টুকরোগুলোকেও ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিল ডাক্তার। অন্যান্য পাইলটদের মতো ওয়ের্গও রোবটের এই আশ্চর্য দক্ষতার কথা শুনেছিল, কিন্তু এত কাছ থেকে তার সেবাশুশ্রষা দেখার অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। অবাক হয়ে ওয়ের্গ দেখল, লেইটারের পেটের ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাচ্ছে, পোড়া চামড়ার জায়গায় নতুন গোলাপি চামড়া গজিয়ে উঠছে।

একসময় লেইটারের মুখের ভেতর থেকে গুড় বের করে নিল রোবট ডাক্তার, হাত থেকে খুলে নিল সূচ। জোরে একবার শ্বাস নিয়ে তারপর চোখ মেলে তাকাল শিকারি। ওর মুখের চামড়ায় এতটুকু পোড়া দাগও দেখা যাচ্ছিল না। সিট থেকে না উঠেই একবার হাত-পা নাড়িয়ে দেখে নিল ও, তারপর চোখ টিপে হাসল।

"তোমার গায়ের রঙটা আরও খোলতাই হয়েছে দেখছি, পাইলট।" বলল লেইটার। ওর চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে পরিষ্কার। একটু আগে কী ঘটে গিয়েছে সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল ও, কোনোরকম ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। "এই জঘন্য জিনিসটা আমার বুকের ওপর কী করছে? হড়হড়ে, দুর্গন্ধে ভরপুর... সরাও এটাকে..."

লেইটারের বুকের ওপর থেকে সাবধানে রোবট ডাক্তারকে তুলে নিল ওয়ের্গ, প্যানেলের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। ওটার ওষুধের গেজের কাঁটা শূন্যের ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। ড্রাইভারের সিটে ফিরে এল ওয়ের্গ, লাল বোতামে আঙুল ছোঁয়াল। সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ ধরে সোজা রকেটের কাছে গিয়ে পৌঁছনোর নির্দেশ পেয়ে জেগে উঠল রোভারের ইঞ্জিন।

"রোভার থামাও পাইলট। শিকারটাকে গাড়িতে তুলতে হবে।"

একবারের জন্য পেছনও ফিরল না ওয়ের্গ। লেইটারের প্রতি ওর মনে ঘেন্না ছাড়া আর কিছুই জাগছিল না। আর এক মুহূর্তের জন্যও এই অভিযান সহ্য করতে পারছিল না ও।

"তুমি পস্তাবে। আমি কর্পোরেশনকে জানাব তোমার এই আচরণ সম্বন্ধে। তুমি বোধ হয় আমাদের চুক্তির শর্তগুলো ভুলে গেছ- যতক্ষণ আমরা এই গ্রহের মাটিতে

রয়েছি ততক্ষণ আমিই তোমার মালিক। একই কথা বারবার বলতে আমার ভালো লাগে না।”

যতক্ষণ ওরা এই গ্রহের মাটিতে রয়েছে... যদি সত্যিই এমনটা হত, মনে মনে ভাবল ওয়ের্গ, যদি সত্যিই এরকম পাণ্ডববর্জিত গ্রহেই এধরনের লোকের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, লেইটারের মতো মানুষই দুনিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সর্বত্র প্রভুত্বের আসনের দাবিদার।

“বেশ, আমারই ভুল হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলে উঠল লেইটার, “আমার উচিত ছিল তোমার প্রাপ্য দ্বিগুণ করে দেওয়া। এক অর্থে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞও, যদিও আমি জানি তুমি নিজের স্বার্থেই আমাকে বাঁচিয়েছ। কিন্তু এখন তুমি যেটা করছ সেটা একেবারেই অযৌক্তিক। দেখলে তো, শেষ অবধি আমাদের কোনো ক্ষতিই হয়নি।”

“আপনার চিকিৎসা করতে গিয়ে রোবট ডাক্তার তার প্রায় সব ওষুধই ব্যবহার করে ফেলেছে। হামের টিকা দেওয়া ছাড়া ওটার আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আপনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন? যদি কিছু ঘটে যায়, আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।”

“যতসব আজেবাজে কথা! কী এমন হতে পারে আমাদের সঙ্গে?”

“অনেক কিছুই হতে পারে।” বলে উঠল ওয়ের্গ। নিজের অজান্তেই ওর গলায় আকুতির সুর ফুটে উঠেছিল। লেইটারের দিকে ফিরল ও। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত একবারও ও শিকারির চোখের দিকে তাকায়নি। শুরু থেকেই ওর লোকটাকে ভালো লাগেনি, সেই স্পেস স্টেশন থেকেই। নিজের এই স্বভাবের সঙ্গে ওয়ের্গ পরিচিত ছিল, যাকে ও পছন্দ করত না তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারত না। কিন্তু এবার সেই স্বভাবগত অনীহা দূরে সরিয়ে রাখল ও, তাই লেইটারও পাইলট ওয়ের্গের চোখদুটো ভালো করে দেখতে পেল। ভুরু এবং চোখের পাতা প্রায় নেই বললেই চলে, চোখদুটো নেশার ট্যাবলেটের প্রভাবে লালচে। রোদে পোড়া তামাটে চামড়ার মুখ, আর অনুভূতিশূন্য, ফ্যাকাসে দুটো চোখ। ওয়ের্গের ঠোঁটজোড়া পুরু,

থুতনির ঠিক মাঝখানে বাচ্চাদের মতো হালকা টোল। আপনমনেই হেসে উঠল লেইটার। এরকম একজন সাদামাটা চেহারার মানুষের সঙ্গে শিকার নিয়ে কথা বলাটাই হাস্যকর। লোকে ঠিকই বলে, ওয়ের্গ সেই পাইলট যে সর্বদা বেঁচে ফেরে। কারণ ও কখনো ঝুঁকি নেয় না। কোনোরকম ঝুঁকির কাজ ওর পক্ষে আদতেই অসম্ভব।

"অনেক কিছুই হতে পারে, আবার বলল ওয়ের্গ, "এবং আমার মনে হয় আপনিও সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন। এখানে সব গাছে পাখি ডাকে। পাখি মরলে গাছ শুকিয়ে যায়; গাছ কেটে ফেললে পাখিরা বাঁচে না। এই মিথোজীবিতা, এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আপনার চোখে ধরা পড়ছে না? আমার কাছে তো এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। গ্রহটা বুঝতে পারেনি আমরা খুনি, তাই আমাদের রকেট-শিপকে নামতে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল হয়তো আমরা দুর্ঘটনাবশত এখানকার প্রাণীদের মেরে ফেলছি, তাই আমাদের সাবধান করার চেষ্টা করেছিল। ঘাসকে ওইভাবে কাঁচ করে দেওয়া নিঃসন্দেহে একপ্রকার সাবধানবাণী। আপনিও নিশ্চয়ই সেটা বুঝেছেন। আর এখন গ্রহটা আত্মরক্ষা করছে। দেখতেই তো পাচ্ছেন তার পরিণাম। এর পরেও যদি আমরা শিকার করি, এই গ্রহ আমাদের শেষ করে দেবে।"

"আকাশের বুক চিরে নেমে আসবে আগুন, পাপীদের মাথায় বজ্রপাত হবে! যতসব ঢপের কথা! আমাদের ফোর্স ফিল্ড ভেদ করার ক্ষমতা কার আছে, পাইলট? একমাত্র একইধরনের কিন্তু বিপরীত মেরুর একটা ফিল্ড আমাদের শক্তিক্ষেত্রকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। তুমি কি চলতে চাও এই গ্রহ সেরকম একটা ফিল্ডও তৈরি করে নেবে?"

লেইটারকে বুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা ছেড়ে দিল ওয়ের্গ। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে সোজা এগিয়ে চলেছিল রোভার, দু-পাশের গাছপালা, ঘন ঝোঁপঝাড় পেছনে ফেলে। দুপুরের উজ্জ্বল আলোয় রকেটের চুড়ো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পথে যদি আর কোনো জন্তুর পাল্লায় না পড়ে ওরা, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল

ওয়েৰ্গ, যদি কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই রকেট অবধি পৌঁছে যায়, তাহলে আর কখনো শিকার অভিযানে আসবে ও। এই শেষ।

"পরিবেশ নিয়ে এইসব কুসংস্কারের কোনো মানে হয় না। 'গ্রহ ভাবছে', 'গ্রহ সাবধান করতে চাইছে...' এই গ্রহে মানুষের কোনো অস্তিত্বই নেই। তাহলে কাদের প্রাণ রক্ষার কথা বলছি আমরা? পৃথিবীতে সবাই প্রকৃতির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বুলি কপচায়। শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে। আমি এত খরচা করে অভিযানে আসি। শিকার করতে, জীবজন্তুদের দুমড়ে মুচড়ে ওদের প্রাণ ছিনিয়ে নিতে। তাই তুমি এই বিষয়ে কী ভাববো না ভাবো তাতে আমার কিছুই যায় আসে না ওয়েৰ্গ।" শব্দ করে হেসে উঠল লেইটার। "আচ্ছা, তুমি তোমার জ্যাকেটটা আমাকে দিচ্ছ না কেন? এই যে তুমি বেশ জামাকাপড় পরে আছ, আর আমি উলঙ্গ হয়ে ঘুরছিএটা কি ঠিক? তবে তাই বলে

আমার কাছ থেকে আবার ধন্যবাদ আশা কোরো না। আচ্ছা, এবার রোভার দাঁড় করাও। আমি একটু চারদিকটা ঘুরে দেখি।"

বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল ওয়েৰ্গ, লেইটারের অপমানজনক কথাবার্তা ধর্তব্যেও আনল না। কোনো একটা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে আলাদা করে নিতে পারত ও, আর যা কিছু অপ্রয়োজনীয় সেসবের প্রতি মনোযোগই দিত না। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাই সম্মান অথবা অপমানের অস্তিত্বই ছিল না ওয়েৰ্গের কাছে। ওর সামনে বিপদের সবচেয়ে বড়ো উৎস ছিল লেইটার। কিন্তু শিকারিকে নিষ্ক্রিয় করা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ একজন পাইলট হিসেবে ওকে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে থাকতে হত। ওয়েৰ্গের শরীরের আড়ষ্ট মাংসপেশী শিথিল হয়ে এলুআসন্ন বিপদের প্রতিক্রিয়ায়।

ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আংটির মতো দেখতে আরেকটা জন্তু। আগেরটার চেয়ে ছোটো, ব্যাস এক মিটারও হবে কি না সন্দেহ। সূর্যের উলটোদিকে থাকায় আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই ছিল না জন্তুটার কাছে। লেন্সের কেন্দ্র লক্ষ্য করে গুলি চালাল লেইটার, রোভার থেকে না নেমেই। বিস্ফোরণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল

নীলচে লেন্স, ঘুরতে ঘুরতে একসময় নিথর হয়ে গেল বলয়। ঠিক তখনই লেইটারের কনুই ঠেলে সরিয়ে প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ওয়েগ্, 'রিভার্স' বোতামে চাপ দিল।

ঝটকা খেয়ে থেমে গেল রোভার, তারপর পেছন দিকে কয়েক হাত গড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যানেল থেকে হাত সরানোরও সময় পেল না ওয়েগ্, রোভারের ঠিক সামনের মাটি ফুলে ফেঁপে স্তূপের মতো ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এইধরনের কোনো একটা পরিবর্তন যে হতে পারে সেটা অবচেতনে উপলব্ধি করতে পেরেছিল পাইলট, তাই অনির্বচনীয় এক যুক্তি মেনে রোভারটাকে পিছিয়ে এনেছিল ও, লেইটারকে খুদে বলয়াকৃতির জন্তুটার দিকে গুলি চালাতে দেখে।

ভয়ানক এক ধূসর দানব উঠে এল ভূগর্ভ থেকে। ওটার গা থেকে ঝরে পড়ছিল আলগা মাটি-কাঁকর। আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলল এক বীভৎস হুঙ্কার। পরক্ষণেই ওদের দিকে ঝাঁপাল দানবটা।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া লেইটার লক্ষ করল কীভাবে মাঝপথে আকার বদলে ফেলল দানবটা, কীভাবে ওটার সমস্ত মাংসপেশি এসে জড়ো হল দেহের সামনের অংশে, কীভাবে মুখের দু-পাশে বসানো কালো দাঁতগুলো আরও লম্বা, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। চোখ ধাঁধানো উচ্চতা থেকে ওদের রোভারের ওপর নেমে এল মাটির দানব। শক্তিক্ষেত্রের বাধা পেয়ে শূন্যে ঝুলে রইল কয়েক সেকেন্ড, কয়লার মতো কালো একটা চোখ মুহূর্তের জন্য তাকাল রোভারের সওয়ারিদের দিকে, তারপর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

"দেখলেন তো৷এটাই এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইছিলাম আপনাকে। গ্রহটা এবার প্রতিশোধ নিচ্ছে।"

দাঁত খিঁচিয়ে উঠল লেইটার। চোখ কুঁচকে দূরে ছিটকে পড়া দানবটার গতিবিধি নজরে রাখতে রাখতে রাইফেলের চার্জ রেগুলেটরের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

"তুমি আমার সিটে চলে এসো পাইলট।" বলল শিকারি। দ্বিতীয়বার রোভারের

ওপর ঝাঁপাল দানবটা, কিন্তু এবার লেইটার কোনোরকম প্রতিক্রিয়াই দেখাল না। শক্তিক্ষেত্র আবারও সফলভাবে আক্রমণ প্রতিহত করল। "এর পরেরবার যখন ওটা ফিল্ডের সঙ্গে ধাক্কা খাবে, তুমি এক সেকেন্ডের জন্য ফিল্ডের সুইচ অফ করে দিও। আমি গুলি চালানোর সময় পেয়ে যাব।"

দানবটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, লাফিয়ে এল রোভারের দিকে। ওটার বিশাল দেহের সঙ্গে শক্তিক্ষেত্রের সংঘাতের কাঁপুনি যেন নিজের শরীরে অনুভব করতে পারল ওয়েৰ্গ। ফিল্ডের সুইচ অফ করে দিল ও। দানবটা তখনও শূন্যে ঝুলে ছিল। দ্রুত কয়েকবার গুলি চালাল লেইটার, এত তাড়াতাড়ি ট্রিগার টানল যেন মনে হল একবারই গুলি চলেছে। বাজ পড়ার মতো কান ফাটানো বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল, একেকটা বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র যে গ্রানাইটের বোল্ডার উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে হারিয়ে গেল দানবটা, শুধু বিশাল একটা গর্ত আর তার চারদিকে ছড়ানো পাথরের টুকরো পড়ে রইল।

জমতে থাকা নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠল লেইটার। "তুমি গাড়ি মন্দ চালাও না। পাইলট।" সামান্য খসখসে শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। "তোমার রিফ্লেক্স অসাধারণ। তবে দেখলে তো, এটাও প্রমাণ হয়ে গেল যে আমাদের ফোর্স ফিল্ড দুর্ভেদ্য? কী হল, তুমি কোনো কথা বলছ না কেন?"

"দেখুন," ফোর্স ফিল্ড পরিমাপক প্যানেলের দিকে ইঙ্গিত করল ওয়েৰ্গ, "যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয়েছে তা থেকে আন্দাজ করা যায় দানবটার ওজন দশ হাজার কেজিরও বেশি। কিন্তু আয়তনের দিক দিয়ে ওটা অতটাও বড়ো নয়। অতএব..."

"না!" চেঁচিয়ে উঠল লেইটার, "একই গ্রহে জৈব এবং অজৈব দু-ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বিশ্বসংসারের এটাই নিয়ম, তুমিও সেটা জানো।"

"আসল কথাটা হল," নীচু গলায় বলে উঠল ওয়েৰ্গ, "আমরা একমাত্র জৈব প্রাণীদেরই শিকার করি।"

"তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ?"

"আমি বলতে চাইছি যে এই গ্রহ নিজস্ব কৌশলে আমাদের আক্রমণ করছে।

অজৈব একটা প্রাণীএকটা মাটির দানব বানিয়েছে আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে।"

অবিশ্বাসের চোখে পাইলটের দিকে তাকিয়ে রইল লেইটার।

"তোমার এই কথাবার্তা আর নেওয়া যাচ্ছে না! তুমি অলৌকিকতার যুগে ফিরে গেছ বলে মনে হচ্ছে পাইলট। অথবা ভয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছ।"

"না, লেইটার। আমার যুক্তি-বুদ্ধি সব নিজের জায়গাতেই রয়েছে।"

প্রচণ্ড একটা গর্জন পাইলটের বাকি কথাগুলো মুছে দিল। বিস্ফোরণে বিন্দুমাত্র আঘাত না পাওয়া দানবটা দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে এসে গর্তের সীমানা পেরোচ্ছিল। ওটার পেটের নীচ থেকে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল না, চওড়া, চ্যাপ্টামতো একটা লেজে ভর দিয়ে মাটি সরিয়ে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ লাফ দিল দানবটা, ফের রোভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রায় নিঃস্পৃহভাবে দানবটাকে, ওটার দেহের দু-পাশে আর পেটের ওপরের কুৎসিত ফোলা অংশগুলোকে লক্ষ করতে লাগল ওয়ের্গ। দানবটা যখন লাফিয়ে ওদের আক্রমণ করছিল তখন ফোলাগুলো আয়তনে বেড়ে উঠছিল, আর যখন ফোর্স ফিল্ডের ধাক্কায় ছিটকে পড়ছিল তখন সেগুলো শুকিয়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবার শক্তিক্ষেত্রের ওপর লাফিয়ে এসে পড়ছিল প্রাণীটা, পরমুহূর্তেই মাটি কাঁপানো শব্দে দূরে ছিটকে যাচ্ছিল। ওয়ের্গ বুঝতে পারল, জন্তুটা বার বার এভাবে সরাসরি আক্রমণ হেনে রোভারের ফোর্স ফিল্ড নিঃশেষ করে দিতে চাইছে।

নিঃস্পন্দ চোখে শক্তিক্ষেত্রের এনার্জি ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল লেইটার। যন্ত্রের কাঁটা একটু একটু করে শূন্যের দিকে এগোচ্ছিল।

"আপনি ঠিকই ধরেছিলেন।" দানবটার আক্রমণের মধ্যেই বলে উঠল ওয়ের্গ। "গ্রহটার পক্ষে আমাদের ফোর্স ফিল্ডের বিপরীতমুখী ফিল্ড সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাই সে অন্য উপায় বেছে নিয়েছে। দানবটা একটু একটু করে আমাদের শক্তিক্ষেত্র নিঃশেষ করে দিচ্ছে। বিকল্প সমাধান খুঁজে নিয়েছে গ্রহটা।"

"তুমি কিছু করছ না কেন?" উঁচু গলায় চিৎকার করে উঠল লেইটার। "তুমি না সেই পাইলট যে সবসময় বেঁচে ফেরে?"

“বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমার একমাত্র সুযোগ আমি কাজে লাগাতে পারিনি। আমার উচিত ছিল আপনাকে বেঁধে ফেলে রাখা, যাতে আপনি আমাদের আর কোনো সমস্যায় না ফেলতে পারেন। কিন্তু...”

...পথ যেন আর শেষই হচ্ছিল না। উপত্যকার পাথুরে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল ওয়ের্গ, হোঁচট খাচ্ছিল বারবার। যখন তখন ওর চোখের সামনে নেমে আসছিল লাল পর্দা। তখন দাঁড়িয়ে পড়ছিল ও, জিরিয়ে নিচ্ছিল কিছুক্ষণ। লেইটারকেও পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল ওকে। ওয়ের্গের পা ফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অচেতন শিকারির মাথা এদিক ওদিক দুলছিল। শুরুতে ওয়ের্গ চেষ্টা করেছিল ওকে কাঁধে করে নিয়ে পথ চলার, কিন্তু মৃগীরোগীর মতো ছটফট করছিল লেইটার, বার বার বমিও করছিল। তাই শেষ অবধি পাঁজাকোলা।

ওয়ের্গের স্মৃতি ঠিকমতো কাজ করছিল না। ওর শুধু এটুকু মনে পড়ছিল ফোর্স ফিল্ড নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জোরে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল। তখনই ওরা দু’জন রোভারের বাইরে ছিটকে পড়েছিল। জ্বলন্ত ঘাস, পোড়া মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার সময় নিজের শরীরটাকে যতদূর সম্ভব গুটিয়ে নিয়েছিল পাইলট। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল যখন, দেখেছিল রোভারের ওপর উপুড় হয়ে আছে দানবটা। প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছিল ওটার বিশালাকায় মাটির শরীর। পিষে যাওয়া গাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল, ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। একপাশে একটা গর্তের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল লেইটার। কোনোরকমে তাপের হাত থেকে নিজেকে আড়াল করে ওর কাছে পৌঁছেছিল ওয়ের্গ, কলার ধরে টেনে সরিয়ে এনেছিল ধোঁয়া এবং আগুন থেকে।

চলতে চলতে পায়ের তলায় ভেজা ভেজা অনুভব হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়ের্গ। সরু একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছেছিল ও। অগভীর নদীটার বুকে ছোটো ছোটো নুড়িপাথর বিছানো। হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে শিকারিকে শুইয়ে দিল ও, তারপর ওর পাশে বসে আঁজলা করে জল নিয়ে মুখে ছেটাল। ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে হল ওর। আচমকা গুঙিয়ে উঠল লেইটার। উঠে দাঁড়াল পাইলট, তখনই

রকেট-শিপটা ওর নজরে এল। ওরা যেখানে ছিল, সেখান থেকে খুব বেশি হলে এক কিলোমিটার দূরে। শিকারির দিকে আরেকবার তাকাল ওয়ের্গ। শরীরের কোথাও হাড় ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছিল না, সবই কাটাছেঁড়া নয়তো কালশিটের দাগ। তবে নাড়ি ক্ষীণ। নির্ঘাত বিস্ফোরণের সময় শক পেয়েই অজ্ঞান হয়েছিল ও।

শিকারিকে নদীর পার অবধি টেনে আনল ওয়ের্গ, আঁজলা করে জল তুলে ওর মুখে ঢেলে দিল। কাশির দমকে ছটফট করে উঠল লেইটার। পিঠজুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল ওয়ের্গ।

একসময় লেইটারের কাশি থামল। কোনোরকমে উঠে বসল সে, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। ওর গালের একটা ক্ষত থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছিল।

"আপনি হাঁটতে পারবেন তো?" লেইটারকে জিজ্ঞেস করল পাইলট। "আমাদের রকেট-শিপ এখান থেকে বেশি দূরে নয়।" ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা কেউ শুনলে হয়তো অনুকম্পা বলে ভুল করত। ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল লেইটার।

দুর্বলতা সরিয়ে রেখে পাইলটের পেছন পেছন চলতে শুরু করল শিকারি। তবে একটানা বেশিক্ষণ হাঁটতে পারছিল না ও, একটু পরপরই মাটিতে বসে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল ওকে। সেই সময়গুলোতে ওয়ের্গ নিপে ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

"কিন্তু একটু আগেও তো তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে চলেছিলে।" একসময় বলল লেইটার। ওর গা গোলাচ্ছিল, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। "তুমি তো আমাকে বইছিলে।"

"হ্যাঁ, আমি আপনাকে বইছিলাম। কারণ আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।"

"মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে আমি আবার অজ্ঞান হয়ে যাব।" হাঁপ ধরা গলায় উঠল। লেইটার। একটানা কথা বলতে পারছিল না ও, শব্দগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করছিল। "আমি ছাড়া কিন্তু তুমি রকেটের ভেতরে ঢুকতে পারবে না।"

ঘেন্নায় একদলা থুতু ফেলল ওয়ের্গ, একবারের জন্যও পেছন না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলল। ওর ভেঁড়াখোঁড়া স্পেস স্যুটের জায়গায় জায়গায় খয়েরি ছোপ লেগে

ছিল, শুকনো রক্তের দাগ। লেইটার চুপচাপ পাইলটের চলে যাওয়া দেখল। ওর গায়ের ব্যথা কমে আসছিল, মাথার ভেতরটা একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছিল। ক্রোধ সবসময়ই ওকে উত্তেজনা যুগিয়ে এসেছে, ওর মন ভালো রেখেছে। এখন যদি ওর হাতে ব্লাস্টার থাকত, পাইলটের পিঠের দিকে তাক করে নির্ঘাত চালিয়ে দিত। তারপর রসিয়ে রসিয়ে লোকটার আর্ত চিৎকার উপভোগ করত। ওয়ের্গের প্রতিটা কথায় যে তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত ছিল তা লেইটারের বুকে নিষ্ফল ক্ষোভের আগুন জাগিয়ে তুলেছিল।

রকেট-শিপের কাছে পৌঁছে লেইটার দেখল, আনত ধাতব তক্তাটার ওপর চুপ করে বসে রয়েছে ওয়ের্গ। ওর দৃষ্টি ঝিলের দিকে। সেখানে স্বচ্ছ জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা লিলি ফুল। মন শান্ত করে দেওয়া এক দৃশ্য।

অনেকগুলো ছোটো ছোটো জলজ জন্তু জল ভেঙে মাথা তুলছিল, আবার ডুব দিচ্ছিল গভীরে। দেখা দিয়েই নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছিল অসংখ্য ঘূর্ণি। ঝিলটারও যেন নিজস্ব প্রাণ ছিল। ওয়ের্গ দেখল, ওদের রকেট ল্যান্ডিংয়ের সময়ে পুড়ে যাওয়া ঘাস বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে গজাতে শুরু করে দিয়েছে। তারপরই শিকারের লোভে আসা শয়তানটাকে রকেটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। এখুনি নিজের রক্তমাখা হাতদুটো দিয়ে রকেটের হ্যাঁচ খুলবে লোকটা। ওকেও তখন ভেতরে যেতে হবে, কারণ ও পাইলট। এই গ্রহ ছেড়ে উড়ে যাবে ওদের রকেট, যাওয়ার সময় আরও একবার পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে এখানকার ঘাস-মাটি-ফুল।

তক্তা বেয়ে উঠে এল লেইটার, পাইলটের দিকে একবার তাকালও না। হ্যাঁচের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ও। রকেটের মসৃণ ধাতুর গায়ে ওর প্রতিফলন পড়ছিল। ফুলে যাওয়া রক্তে ভেজা মুখ, বুজে আসা চোখ নিজেকে যেন চিনতেই পারছিল না ও। পেছন ঘুরল শিকারি। দূরে আগুন মরে এলেও রোভারটা থেকে তখনও কালো ধোঁয়া উঠছিল। ওর শিকার করা পশুর চামড়াগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব জ্বলে গিয়েছে, মনে

মনে ভাবল লেইটার। ওই আগুনে, যেখান থেকে নিজের প্রাণ বাঁচানোর

তাগিদে ওয়ের্গ ওকে উদ্ধার করে এনেছে।

জোরে হেসে উঠল শিকারি। ওর দু-চোখ থেকে উন্মাদ আক্রোশ ঝরে পড়ছিল।

“আমি আবার এখানে ফিরব ওয়ের্গ। তবে এবার আর আমি একা আসব না। দলবল নিয়ে আসব, আর এই গ্রহকে শেষ করে দেব। নিঃস্ব, বাঁজা গ্রহটা সেদিন আমার পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। সৃষ্টির প্রথমদিনের মতো। চিন্তা নেই, আমি তোমাকেও আনানোর ব্যবস্থা করব, সেই দিনটা দেখার জন্য।”

“পায়ের তলায় পড়ে থাকবে...” নির্জীব স্বরে লেইটারের বলা কথাগুলোই একবার আওড়াল পাইলট। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল ও, পিঠের যন্ত্রণার তোয়াক্কা না করে দু-হাতে জাপটে লেইটারকে তুলে ফেলল মাথার ওপর। ওর হাতের চাপে শিকারির পাজরের হাড় গুঁড়িয়ে গেল।

জানোয়ারটাকে তারপর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওয়ের্গ।

(সমাপ্ত)